রুশ হানাদারদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী আফগান গেরিলাদের বিস্ময়কর উপাখ্যান

জীবন্ত পাহাড়ের সন্তান

তারেক ইসমাঈল

জীবন্ত পাহাড়ের সন্তান

মূল ঃ তারেক ইসমাঈল

ভাষান্তর ঃ শেখ নাঈম রেজওয়ান

আল-খালেদ প্রকাশন

দুটি কথা

এই পুস্তকে যে কাহিনীর সূচনা, বিস্তৃতি ও পরিসমাপ্তি ঘটেছে, আর কাহিনীর নানা শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হয়েছে, এর মেয়াদকাল সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগান দখল-আমল। প্রায় ২ লাখ ৫২ হাজার বর্গমাইল আয়তনের দেশটির প্রত্যেক জনপদ, পাহাড়ে-পর্বতে-প্রান্তরে, হাটে বাজারে ও শহরে দখল-বেদখলের লড়াই তখন চলছিল। মৃত্যুর হাতছানি ছিল এতই নিবিড়, যেমন কায়ার ছায়া কায়ার সংগে ছিল অবিচ্ছেদ্য।

এক দশকে সেদেশে মৃত্যুর যেন মড়ক লেগেছিল। স্বাভাবিক মৃত্যুর চেয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু ছিল সহস্র গুণ বেশী নিশ্চিত। মানবরূপী কমিউনিস্ট হায়নারা আর তাদের সেবাদাসরা রাতদিন বিভিন্ন জনপদে ঘুরে বেড়াতো আফগানদের শিকারের উদ্দেশ্যে। কে কত জনকে বধ করতে পারলো, এই প্রতিযোগিতা চলতো শিকারীদের মধ্যে।

আফগান শার্দুলেরা শুরুতেই শহিদী শপথ নিয়ে নর পশুদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে। প্রত্যক্ষ ভাবে মুকাবিলা করতে অস্ত্র হাতে নিয়ে ময়দানে নামে। শুরু হয় জেহাদ। এ জেহাদে শরীক হয় সমাজের নানা বয়সের মানুষ, কিশোর থেকে বৃদ্ধ। অনেকের মতবদল, পথবদল ও চিন্তার অদল বদল ঘটে এই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সময়ে। আফগান পরিস্থিতির এই অগ্নি গর্ভ থেকে জন্ম নেয় এই পুস্তকে বিবৃত কাহিনী।

মূল বইটির নাম হচ্ছে “কুহছারু কী আগ”। প্রখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক জনাব তারেক ইসমাঈল বইটি লিখেছেন।

এ বই ১৯৮৭ সনে প্রথম বাজারে আসে। তখন বেশ সাড়া জাগায়। কয়েক দিনের ভিতর প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়।

বইটির পাঠক প্রিয়তার একটা কারণ ছিল, তখনও রুশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার সেবা দাস আফগান কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী মুজাহিদ গেরিলাদের জেহাদ চলছিল। আফগানিস্তানের পাহাড়ি সন্তানদের সাথে টক্কর লেগে রুশ শ্বেত ভল্লুক তখন ক্ষত-বিক্ষত। শেষ পর্যন্ত সেই মৃত প্রায় শ্বেত ভল্লুক লেজ গুটিয়ে পালায়। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, যারাই আফগান মুসলমানদের সঙ্গে টক্কর মেরেছে, তাদের কিছুটা বিলম্ব হলেও পরাজয় বরণ করে নিতে হয়েছে। পরাজিত সোভিয়েত ইউনিয়নের চীফ অব কমান্ড প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ বলেছিলেনঃ আফগানিস্তানের উপর আক্রমন রাশিয়ার পক্ষে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে মারাত্মক ভুল। তাই আমরা দেখতে পাই যে, আফগান জেহাদের বদৌলতে বিশাল সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এমন কি মূল রুশ ফেড়ারেশনও ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। এ কথা অবশ্যই সত্য যে, রুশ-আফগান যুদ্ধ বিংশ শতাব্দীর একটা আলৌকিক ঘটনা যে, কিভাবে নিরস্ত্র, দরিদ্র, সরলপ্রাণ আফগানীরা বিশাল অস্ত্র ভান্ডারের মালিক পরাশক্তিকে একমাত্র ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে পরাজিত করতে সক্ষম হন।

রুশ হানাদার বাহিনী পারমানবিক বোমা ছাড়া সবধরনের মারণাস্ত্র, এমনকি যে সব অস্ত্র জাতি সংঘের আইন অনুযায়ী ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ছিল, সে সব কিছুই তারা ব্যবহার করেছে এই মজলুম আফগান মুসলমানদের

বিরুদ্ধে। তবে রাশিয়ানদের হটাতে তাদের অনেক কুরবানী দিতে হয়েছে। এ যুদ্ধে ১৬ লাখ মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। আফগানিস্তানের এমন কোন পরিবার পাওয়া যাবেনা, যার কোন না কোন সদস্য এ যুদ্ধে প্রাণ হারাননি। পরিশেষে মজলুম মুসলমানরা বিজয় ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হন। আফগানীদের বিজয়ের পিছনে যেই চেতনাটি কাজ করেছে তাহল তাদের ঈমানী চেতনা। তারা বিশ্বের ভীত সন্ত্রস্ত মুসলামানদের একটি পয়গাম দিয়েছে যে, "হে মুসলমান ভাইয়েরা! তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। তোমরা আল্লাহ উপর অটল বিশ্বাস রেখে যে কোন হানাদার ও আগ্রাসান কারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে পারো। তোমাদের কেউ পরাজিত করতে পারবেনা, যেমন রুশ পরাশক্তি আমাদেরকে পরাজিত করতে পারেনি। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করেছিলেন। কারণ আমরা তার ওপর ভরসা করে লড়াইতে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। আল্লাহ এমনভাবেই মোমেনদের সাহায্য করেন।"

আফগানরা হচ্ছে স্বাধীনচেতা,বীরযোদ্ধা জাতি। তারা পরাধীনতার গ্লানীকে কোন সময়ই মেনে নেয়নি। তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ যদি কিছু থাকে, তাহলো এই, তারা কুরআন ও তার অনুশাসনকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। কিন্তু শয়তান ও শয়তানের সেবাদাস কুফরি শক্তিবর্গ এটা মোটেও মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। এজন্যই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাহানা বানিয়ে তারা মুসলিম আফগানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তাদের ক্ষত-বিক্ষত করছে। কুনআনুল কারীম আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ আসমানী গ্রন্থ। এই গ্রন্থ শুধূ মুসলমানদের জন্য নয়,বরং হিন্দু-বৌদ্ধ, ইহুদী-খৃষ্টান, পারসী, কনফিউসেস সহ সকল আসমানী

মানবগোষ্ঠীর জন্য আল্লাহ পাক অবতীর্ন করেছেন। এখন যদি কোন ভাল মানুষসৃষ্টিকর্তার আইনগ্রন্থ আল কুরআনকে সামগ্রীকভাবে পালন করতে চায়, তাহলে এ ব্যাপারে কারোর আপত্তি করা, সেই ভাল মানুষের সাথে শত্রুতা পোষন করা, তাকে কোনঠাসা ও একঘরে করে রাখা এবং তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারনকরা মোটেই যুক্তি সঙ্গত ও বিবেক সম্পন্ন কাজ নয়। যারা এই বিবেক বর্জিত কাজ করছেন, আল্লাহ তাদের বুঝার তৌফিক দান করেন,যেন তারা অহেতুক,মিথ্যা আত্নগরিমা, অহংকার, দম্ভ, ও বিদ্বেষ পরিহার করে সত্য ও ন্যায় বুঝার ও গ্রহন করার তৌফিক দান করেন। আমীন।

যাহোক, আমি আফগান ভাইদের মুক্তি সংগ্রাম এবং তাদের ত্যাগ ও কুরবানীকে শ্রদ্ধা জানাতে ও বাংলা ভাষী মুসলমান ভাইদের কাছে তাদের বিস্ময়কর গেরিলা যুদ্ধের ঘটনাবলী জানাতে এই বইটির অনুবাদে হস্ত প্রসারিত করলাম। বইটির বাংলা নাম "জীবন্ত পাহাড়ের সন্তান" রাখা হল। পাঠক ভাইদের সুবিধার্থে বইটি দুই খন্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রখ্যাত সাংবাদিক,কলামিস্ট ও লেখক জহুরী সাহেবের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে অনেক ভাবে সহযোগিতা করেছেন। তার সার্বিক কল্যান কামনা করি। স্নেহের মাহমুদা, জীবনসঙ্গীনী উম্মে খালেদ ও ফেরদৌসী আপা সহ অনেকের কাছেই আমি ঋনী। তাদের সহযোগিতার কারণেই বইটি প্রকাশ করতে পারলাম।

শেখ নাঈম রেজওয়ান

১০ ই এপ্রিল, ২০০২ ইং সন।

সূচীপত্র

জীবন্ত পাহাড়ের সন্তান

মূল ঃ তারেক ইসমাঈল

ভাষান্তর ঃ শেখ নাঈম রেজওয়ান

ফয়জান উগলু

'খাদ' হচ্ছে আফগান কমিউনিস্ট সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ। এই 'খাদ'-এর হেড কোয়ার্টার একটি প্রাচীন বিশাল ভগ্ন প্রায় দালান। দূর থেকে মনে হয় একটি পরিত্যক্ত বাড়ী। এ বিশাল দালানে খাদ-এর অনেক কর্মচারী আর কর্মকর্তা ছিল কর্মরত। গোটা দালান এত লোকের কর্ম-কোলাহলে সরগম থাকার কথা, কিন্তু নিঃস্তব্ধতাই বিরাজ করতো। কর্মরত প্রত্যেকে নিজ নিজ কণ্ঠ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। এর ফলে নিঃস্তব্ধতাই হয়ে যায় দালানটির বৈশিষ্ট্য। কখনো কখনো নিস্তব্ধতার পরিবেশ এতটুকু থাকতো যে, পিন-পতনের শব্দ পর্যন্ত শোনা যেত। শুধু নিঃস্তব্ধতাই নয়, শিহরণমূলক থমথমে অবস্থাও বিরাজ করতো সর্বক্ষণ। ঝড়ের আগে প্রকৃতি যেমন শান্ত থাকে, দালানের থমথমে নীরবতা সে ধরনেরই ছিল। গোয়েন্দাদের প্রতিটি চাহনীতে ছিল শিকার ধরার লোলুপতা। চেহারায় ফুটে উঠতো নির্মমতার ছায়া। পাষাণ দালানে কর্মরত গোয়েন্দাদের মনটিও পাষাণ হয়ে যায়। এজেন্টদের দিকে তাকালে মনটা আতংকিত হয়ে উঠতো।

পাথরের মজবুত পাঁচিলের বাইরে বিভিন্ন ব্লকে সারি সারি যে সব কক্ষ, সে সব কক্ষের আফগান ও রাশিয়ান অফিসাররা এমনভাবে চলাফেরা করতেন, যেন তাদের একজনের পায়ের আওয়াজ অন্য জন শুনতে না পায়। কখনো কখনো কোন এক ব্লকের এক কোন কক্ষ থেকে কোন নিরাপরাধ মুসলমান কয়েদীর বিকট চিৎকার ধ্বনি আচমকা শুনা যেত, যাকে রাশিয়ান ও আফগান গুপ্তচররা ধরে এনে মুজাহিদদের সম্পর্কে তথ্য

নেয়ার জন্য নানা ধরনের পাশবিক নির্যাতন চালাতো। তখন এমন মনে হত যেন, এই ইমারতটিতে দানবদের তান্ডব চলছে। সাধারণতঃ এক ব্লক থেকে যে চিৎকার ধ্বনি বেরিয়ে আসতো, সে ধ্বনিটি অন্য ব্লক পর্যন্ত পৌঁছার আগেই হাওয়ায় মিশে যেত। কারণ, এক ব্লক থেকে অন্য ব্লকের ফারাক ছিল যথেষ্ট। মজলুম মানুষের চিৎকার ও আহাজারি এখানে যেন একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়ায়। প্রতি রাতে কার্ফু ছিলো অবধারিত। সন্ধ্যার সাথে সাথে শহর জন মানব শূন্য হয়ে পড়তো। তখন এই বিশাল ইমারতটিতে যেন একটি নতুন শহর জেগে ওঠতো। মেহমানদের আগমন ও প্রস্থানের ধুম পড়ে যেত। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য হেলে পড়ার কিছুক্ষণ পরই এই দালানটির উদর ভেদ করে রাশিয়ায় তৈরী বিভিন্ন সামরিক যান বের হতো। এসব গাড়ীতে আফগান সামরিক বাহিনীর সদস্য এবং তাদের অফিসাররা থাকতো। গাড়ীগুলো যখন রওয়ানা হতো, তখন খুবই সন্তর্পণে গোপনীয়তা রক্ষা করে তাদের মিশনে বেরিয়ে পড়তো। কিন্তু যখন এগুলো তাদের কাজ সেরে ফিরে আসতো, তখন অবশ্যই কোন না কোন হাঙ্গামা ও দুর্ঘটনা বয়ে নিয়ে আসতো।

এসব গাড়ী তাদের মিশন থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় দেখা যেত গাড়ী গুলোর ভিতরে কিছু.লোকজন, যাদের হাত লোহার কড়া দিয়ে থাকতো বাঁধা। তাদের শরীর ও চেহারায় প্রতিভাত হতো রুশ ও আফগান সৈনিকদের পৈশাচিক আচরণ ও নির্যাতনের তরতাজা প্রমাণ। তাদের শরীর ও চেহারা থেকে বেরিয়ে পড়তো টাটকা খুনের ধারা।

রাতের মধ্য প্রহরে কার্ফুর কারণে রাজধানী কাবুলের জনমানবশূণ্য সড়কটি যখন খাঁ খাঁ করতো, তখন সবদিক দিয়ে বন্ধ রাশিয়ান "গাস" জীপগুলোকে প্রচণ্ড বেগে দৌড়তে দেখা যেত। এ সব গাড়ী সাধারণত কাবুল নদী অভিমুখে চলতে থাকতো।

নদীতীরের নিরাপদ স্থানে রাশিয়ান কমান্ডোরা পাথরের মজবুত ব্যাংকার বানিয়ে পজিশন নিয়ে সতর্ক ভাবে পাহারা দিত। সেখানে এসে

গাড়ী থামতো। তখন তড়িৎগতিতে রুশ ও আফগান সৈনিকরা জীপ থেকে হতভাগা মুসলমান নর-নারীর মৃত দেহকে নদীর বুকে ছুঁড়ে মারতো। এই লাশ গুলো তাদেরই, যারা 'খাদ'-এর হেড কোয়ার্টারের কোন ব্লকে কমিউনিষ্ট বাহিনীর নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। নদীর খরস্রোত এসব মৃত দেহকে মুহূর্তের মধ্যেই দৃশ্য থেকে উধাও করে দিতো।

দিনের বেলায় সাধারণত এখানে মোতায়েনকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রায় তন্দ্রাচ্ছন্ন দেখা যেত। কাউকে দেখা যেত সামনে ফাইল খুলে ঝুকে তার ওপর মাথা ঘামাচ্ছে, বুদ্ধি খাটাচ্ছে।

তবে এদের মধ্যে এমন একটি গ্রুপও ছিল, যারা দিন-রাত বিরামহীন কাজ করতো। তারা হচ্ছে ঐ সব মানব-হায়েনা, যারা নির্যাতন চালানোর বিভিন্ন অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি দিয়ে হাত-পা বাঁধা নিরীহ, নিরপরাধ আফগান নর নারীকে তিলে তিলে কষ্ট দিতে থাকতো। নির্যাতন চালানোর এসব হাতিয়ার তাদের বন্ধু দেশ রাশিয়া থেকে নিয়ে এসেছে মুসলমানদের নির্যাতন ও হত্যার জন্য।

গত দু-তিন মাস ধরে এখানে একটি বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। আফগান অফিসারদের একটি বড় অংশকে অন্য জায়গায় বদলী করা হয় পর্যায়ক্রমে। তাদের স্থান দখল করে নেন রুশ উপদেষ্টারা। তবে আফগান অফিসাররা এই অন্যায় হস্তক্ষেপে বিগড়ে না যায়, সেজন্য উচ্চপদস্থ কমিউনিস্ট নেতারা গভীর চিন্তাভাবনা করে গুরুত্বপূর্ণ পদে আফগানদেরই বহাল রাখে। তবে বাস্তবক্ষেত্রে তাদের কোন প্রভাব ছিল না। নির্দেশ চলতো একমাত্র রশিয়ানদের। তাদেরই ফরমান কার্যকর হত। বিশেষ করে কর্নেল শোলোখোভের সামনে আফগান অফিসারদের সামান্য মর্যাদাও ছিল না। তাদের কোন প্রভাব প্রতিপত্তি তার সামনে চলতো না।

।।২।।

বিশাল দেহ। লাল ও সাদার মিশ্রণের চেহারা। টাক মাথার অধিকারী কর্নেল শোলোখোভ অনর্গল ফারসী ও পশতু বলতে পারতেন 'খাদ'-এর এ দেশীয় সকল অফিসারই অবাক হতো তিনি পাঠানদের মত পাগড়ী বেঁধে এবং লম্বা ঘেরওয়ালা কাবুলী স্যুট পরিধান করে যখন কাবুলের সড়ক দিয়ে মোটর টহলে বের হতেন তখন কেউই তাকে চিনতে পারতো না যে, কর্নেল শোলোখেভ রাশিয়ান, না আফগানী!

প্রথম প্রথম যখন তিনি সহাস্য মুখে 'খাদ'-এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাছে নিজের পরিচয় দেন, তখন তাকে কেউই রাশিয়ান মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। কারণ, কেউ তাকে আজ পর্যন্ত রাশিয়ান ভাষায় কথা বলতে শুনেনি। তিনি সব সময়ই একটা আকর্ষণীয় ঈষৎ হাসি স্বীয় ওষ্ঠদ্বয়ের সাথে লাগিয়ে রাখতেন। কিন্তু কখনো কখনো হঠাৎ যখন তার এই মৃদু হাসি গায়েব হয়ে যেত, তখন তার চেহারার সৌন্দর্য অন্যরূপ ধারন করতো। তখন তাকে সুন্দর হাস্য-রসিক দীর্ঘ দেহী যুবকের পরিবর্তে মধ্য বয়সের এক হিংস্র মানুষ-খেকো জানোয়ার মনে হত। তার উপরের পাটির চমৎকার দাঁতগুলো দেখলে ভয়ানক রক্ত পিপাসু মনে হতো। গালের হাড়গুলো ছিল খুবই শক্ত চোখের দিকে তাকালে মনে হতো, সব রক্ত যেন তার দুটি চোখের মধ্যে এসে জমা হয়েছে।

বাহ্যিক রূপে কর্নেল শোলোখোভ 'খাদ'-এর ডাইরেক্টর ইসফান্দিয়ার খান-এর অধীন ছিলেন। কিন্তু ইস্‌ফান্দিয়ার খান নিজেই শোলোখোভের ভয়ে ছিলেন আতংককিত। কারণ, শোলোখোভের রিপোর্টকে ভিত্তি করে তার অধীনস্ত তিন চারজন দেশীয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদের সঙ্গে যে নির্দয় ও বর্বর আচরণ করা হয়, তাদের সেই পরিণাম দেখে তিনি সত্যিই হয়ে পড়েছিলেন ভীত-সন্ত্রস্ত।

এই বিশাল দালানটির প্রতিটি ব্লকে এক একজন আফগান মেজর ইনচার্জ হিসেবে কাজ করতেন। তারা ডেপুটেশনে এখানে আসতেন এবং

কার্য- মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে এখান থেকে অন্যত্র ট্রান্সফার হয়ে যেতেন। খাদের নেতৃত্বে যে সব অপারেশন চালানো হত, সেগুলো এসব ইনচার্জ মেজরদের নেতৃত্বেই সম্পন্ন করা হতো।

রুশ বাহিনীর অনুপ্রবেশের পর সব জায়গাতেই পরিবর্তনের একটা হাওয়া বয়ে যায়। এখন সব অপারেশন কর্নেল শোলোখোভের অধীনে সম্পন্ন হতে থাকে। শুরুতে আফগান অফিসাররা তাদের পাঠানী প্রকৃতির জন্য এই পদক্ষেপে যথেষ্ট বিব্রত বোধ করেছিলেন। তারা এটাকে আপত্তিজনক বলে মনে করতেন। কিন্তু মাত্র তিন মাসের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে শোলোখোভ তাদের পাঠানী মেজাজটাকে ঠিক করে করে নেন।

তিনি হাসতে হাসতে হঠাৎ মানব-রক্ত-খেকো ড্রেকোলার রূপ ধারন করতেন এবং নিজের সামনে দাঁড়ানো অফিসারের উপর প্রবল শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। আর এটা এতই আচমকা ঘটতো যে, সেই অফিসার ভাববারও সুযোগ পেতেন না। তিনি কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে আত্মরক্ষার সাহস টুকু হারিয়ে ফেলতেন। তবে কেউ যদি রাগে কিংবা আত্মমর্যাদা হানি মনে করে পাল্টা আঘাত হানতেন, তাহলে সাধারণত তিনি নিজেই মারাত্মক আঘাত খেয়ে লুটিয়ে পড়তেন। অতঃপর তার বিশাল রুমের বাইরে অপেক্ষমান উর্দিপরা সৈনিক যখন ঘন্টার সংকেত ধ্বনি শুনে দৌড়ে ভিতরে আসতো, তখন শোলোখোভ ফার্সি কিংবা পশতু ভাষায় হেসে হেসে গার্ডটিকে এই অর্ধচৈতন্য অফিসারের দিকে ইংগিত করে নির্দেশ দিতেন, "এই সাহেবটি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাকে বাইরের মুক্ত বাতাস খাওয়াতে নিয়ে যাও।"

গার্ডটি অত্যন্ত নম্রতার সাথে বিশ্বস্ত ক্রীতদাসের মত শোলোখোভের নির্দেশ পালন করে সেই আহত অফিসারকে আঘাত করতে করতে বাইরে নিয়ে আসতো। তারপর অফিসারের আর খোঁজ পাওয়া যেতো না। তাদের গুম করে ফেলা হতো।

আল্লাহই ভাল জানেন, কর্নেল শোলোখোভের মধ্যে কি এমন রহস্যময় শক্তি রয়েছে যে, চোখের পলকে তিনি বড় বড় শক্তিমান পুরুষকে ভূমিতে ফেলতে পারতেন। তার শক্তির গোপন রহস্য সম্পর্কে আফগান গোয়েন্দা সংস্থার মাত্র একজনই জানতেন, তিনি গোয়েন্দা বিভাগের ডাইরেক্টর ইস্‌ফান্দিয়ার খান।

।। ৩ ।।

তিনি জানতেন যে, এখানে আসার পূর্বে কর্নেল শোলোখোভ মস্কোতে কেজিবি'র হেড কোয়ার্টারে মার্শাল আর্টের সবচেয়ে বড় ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন।

দু-তিন মাস থেকেই তার কাছে ট্রেনিং নেওয়ার সময় কারো না কারো হাঁড় ভাঙ্গার ঘটনা শুনতে পাওয়া যেত। তাকে ইউক্রেনের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মেজাজ ঠান্ডা করার জন্য বিশেষ পাওয়ার দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। তখন শোলোখোভের নামটি ইউক্রেনের স্বাধীনতাকামীদের কাছে একটি 'মহাআতংক' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

সে দিনটিতেও এ ধরনেরই কোন ঘটনা ঘটে গেল। জুনিয়র অফিসাররা বুঝতেই পারেননি যে, আসল ব্যাপার কি? এসব বেচারারা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় নিজ নিজ কক্ষে বসা ছিলেন। দুপুরের পরেই তারা সংবাদ পান যে, আজ কর্নেল সাহেবের মেজাজটা ঠিক নয়। প্রতিটি ব্যক্তিই তার মুখোমুখি হতে খুব ভয় পাচ্ছিল। বিশেষ করে প্রত্যেক ব্লকের ইনচার্জদের তো অন্তরাত্মা শুকিয়ে গিয়েছিল, না জানি কর্নেলের কোন্ আযাব তার ওপর আপতিত হয়।

হঠাৎ মেজর উর খানের কক্ষে ইন্টারকমের রিসিভার বেজে ওঠল। কর্নেল তাকে নির্দেশ দিলেন এক্ষণি তার কাছে হাজির হতে। এ নির্দেশ শুনে মেজর উরখানের হাত-পা যেন অবশ হতে থাকে। কাঠের যে কুরসীতে তিনি বসা ছিলেন, তার মনে হল যেন সেই কুরসীতে চুম্বকের একটি প্রচন্ড

ঝাকুনী লাগলো। তিনি সাহস করে ওঠে দাঁড়ালেন। তিনি দেয়ালের আয়নাতে নিজের ভীত-বিহবল মুখখানা পরিষ্কার করে নিলেন। মনোবল ফিরে আনার জন্য ওখানেই এক কোণে রাখা জগ থেকে এক গ্লাস পানি ভরে মুখে ঢেলে দিলেন। প্রচন্ড ঠান্ডা পানির দু-এক ঢোক ভিতরে নেওয়ার পর মনে হল যেন তার শীরায় প্রবহমান রক্ত একদম জমে গেছে। কিন্তু না জানি কি হল যে, আধা গ্লাস পানি পান করার পর পরই তার চেতনা সম্পূর্ণ রূপে স্বাভাবিক হয়ে গেল।

মেজর উরখান তার আর্মি ক্যাপটা ঠিক-ঠাক করে নিলেন। হোলিস্টারে রাখা রিভলবারটা দেখলেন, ঠিক মত আছে কিনা! অতঃপর অতি সন্তর্পণে নিজ কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। ধীরে ধীরে তার মনোবল চাঙ্গা হয়ে এলো। যখন তিনি শেষ ব্লকের এক কোণে তৈরী কর্নেল শোলোখোভের হল সদৃশ কক্ষ পর্যন্ত পৌঁছলেন, তৎক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে কন্ট্রোল করে নিতে সক্ষম হলেন। তার মধ্যে এখন পেরেশানির বিন্দুমাত্র ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। তিনি নিজেকে এখন নির্ভীক মনে করছিলেন।

দরজার বাইরে প্রহরারত দুজন গার্ড তাকে তার হোলিস্টার থেকে পিস্তল খানা তাদের হাতে দিতে আবেদন জানালো। পিস্তলটি তাদের হাতে দিয়ে দিলেন এবং নিজে তড়িৎ গতিতে ভিতরে প্রবেশ করলেন। ওই কক্ষের পিছন দেওয়ালে একটি বড় ম্যাপ টাঙ্গানো ছিল, যাতে কাবুল শহরের প্রতিটি অলিগলির বিস্তারিত নকশা রয়েছে। কর্নেল সেই বিশাল মানচিত্রের নীচে দাঁড়িয়ে ঠোঁটের কোণে একটি মৃদু হাসি চেপে উরখানের অপেক্ষা করছিলেন।

উরখান দু-পায়ের গোঁড়ালী বাজিয়ে কর্নেলকে সেল্যুট করলেন। "খোশ আমদেদ মেজর উরখান!" কর্নেল মুচকি হেসে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। এর ফলে উরখান অনেকটা মনোবল ফিরে পেলেন।

শোলোখোভ সামনের একটি চেয়ারে তাকে বসার জন্য ইংগিত

করলেন এবং তিনি নিজেও সামনে রাখা লম্বা টেবিলটার এক কোণে বসে কিছুটা ঝুকে তার চোখে চোখ রেখে বললেন ঃ

"মেজর উরখান! আমার মতে, ফয়জান উগ্‌লু কোন জিন-ভূত নয়, একজন মানুষেরই নাম। সে এই দেশে বরং এই শহরেই অবস্থান করছে।"

"স্যার! আমরা তন্ন তন্ন করে তার খোঁজ করে যাচ্ছি। আমাদের চর্‌রা নগরীর সর্বস্থানে সজাগ দৃষ্টি রাখছে। রাজধানী কাবুল থেকে যে সব সড়ক ও জনপথ অন্যান্য অঞ্চলের দিকে গেছে, সবকটির প্রতিই আমরা কড়া নজরদারী করে যাচ্ছি।" মেজর উরখান দৃঢ়তার সাথে বললেন।

"উরখান! তোমরা কবে থেকে তাকে খুঁজছো?" কর্নেল শোলোখোভ ব্যঙ্গ সুরে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। একটা পাষাণ হাসি তার ঠোটের কোণে রীতিমত খেলা করছিল।

"স্যার! পরশু সকাল হতে, যখন আমরা আপনার নির্দেশ পেয়েছি।" উরখান ঢোক গিলে করে উত্তর দিলেন।

তার কথা শেষ হতেই কর্নেল শোলোখোভ সটান হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তার ওষ্ঠদ্বয় হতে সেই ঈষৎ হাসি একদম উধাও হয়ে গেল। এখন সেখানে দেখা যাচ্ছিল হিংস্রতা ও কঠোরতা, যার কল্পনা করে 'খাদ'-এর প্রতিটি অফিসারই ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতেন।

"উরখান!" তিনি গর্জন করে বললেন, "তোমরা গত পরশু থেকে ফয়জানকে ধরার জন্য হাক ডাক ছাড়ছো। তোমরা কি জানো যে, সে কোথায় অবস্থান করছে?"

"না, স্যার ... !" দ্বিধাহীন চিত্তে বলে ওঠলেন মেজর উরখান। তার আওয়াজ কাঁপছিল।

"আরে গর্দভ" কর্নেল শোলোখোভ রাগে দাঁত কড়মড় করে টেবিলের উপর রাখা একটি ছোট্ট ছড়ি উঠিয়ে প্রচন্ড জোরে টেবিলটির এক কোণে

আঘাত করলেন। অতঃপর নিজ স্থান থেকে সরে সেই মানচিত্রের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন যেটা তার পিছনের দেওয়ালে টাঙ্গানো ছিল।

"এদিকে এসো" কর্নেল কর্কশ সুরে গর্জন করে নির্দেশ দিলেন। উরখান চেয়ার থেকে ওঠে তার পর্যন্ত আসতে আসতে মনে হল যেন কেউ তার আত্মাটা ধীরে ধীরে বের করে ফেলছে। কিন্তু, তবুও তিনি কোন না কোন ভাবে কর্নেল থেকে দু-তিন ফুট দুরত্বে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। কর্নেল নিজের ছড়ির আগাটা ম্যাপের এক স্থানে চেপে ধরলেন.। অতঃপর হুংকার ছেড়ে বললেনঃ "তুমি এ স্থানটি অবশ্যই দেখতে পাচ্ছো, এখানেই রয়েছে আমাদের প্রিয় আসামীটি। এই সন্ত্রাসীকে যে ভাবে হোক একঘন্টার ভিতর হাজির করা চাই, বুঝলে তো।" অতঃপর তিনি উরখানের দিকে ঘুরে বললেন ঃ "নাও গেট আউট।"

উরখান ভারী পদে বেরিয়ে এলেন। বেইজ্জতী ও আত্মসম্ভ্রমহানীর একটা গভীর অনুভূতি তার ভিতর কে যেন আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল। রাগে তার শরীর কাঁপছিল। গোশ্বায় তার মাথায় খুন টগবগ করছিল। তার মনে চাচ্ছিল যে, বাইরে প্রহরারত সান্ত্রী যখন তাকে হোলিস্টার ফেরত দেবে, তখন তিনি সেখান থেকে পিস্তলটা বের করে বিদ্যুৎ বেগে ভিতরে ঢুকে পিস্তলের সমস্ত গুলি এই শ্বেত ভল্লুক কর্নেলের উপর খরচ করে দেবেন। কিন্ত দেশীয় অন্যান্য অফিসারের ন্যায় তিনিও একথাটি শুধু কল্পনা করতে পারতেন। সেটা বাস্তবায়িত করা ছিল তাদের সাধ্যের বাইরে।

।। ৪ ।।

প্লাজা হোটেল হচ্ছে রাজধানী কাবুলের সবচেয়ে অভিজাত ও দামী হোটেল। এ হোটেলটিকে "লাঞ্চ ঘর"ও বলা হয়। এই হোটেলটিতে প্রতিদিন অবশ্যই কোন না কোন বিবাহ অনুষ্ঠান থাকতো। হোটেল প্লাজা এধরনের অনুষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট সুখ্যাতি কুড়িয়েছিল। রুশ বাহিনীর অনুপ্রবেশের পর কাবুল শহরে কেমন জানি একটা অজানা আতংক সবদিকেই ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই হোটেলটির উৎসবমুখর পরিবেশ দেখলে মনে হত যেন বাইরের কোন কোলাহল ও আতংকভাব এখনো

এখানে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি। তবে পূর্বের অবস্থা থেকে শুধু এতটুকু ব্যতিক্রম হয়েছে যে, এখন রাত এগারটা হওয়ার পূর্বেই এধরনের ফাংশন সমাপ্ত হয়ে যায়। কারণ, রাত এগারটার পর থেকে নিয়ে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ থাকে। রাত এগারটার পর হতে সমস্ত নগরীতে বোমা বিস্ফোরণের কান ফাটা আওয়াজ ভেসে আসতো। শহরের কোন না কোন প্রান্ত থেকে শোনা যেত প্রচণ্ড গুলী বর্ষণের শব্দ। ফলে, এই হোটেলটিতে অধিক রাত পর্যন্ত আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠান চালিয়ে যাওয়া দুরহ ব্যাপার ছিল।

হোটেল প্লাজার দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষে ফয়জান উগ্‌লু অধীর আগ্রহে একটি "বর যাত্রীর" অপেক্ষা করছিলেন। তিনি নির্ভরযোগ্য সূত্রে যে খবর পেয়েছিলেন, সে অনুযায়ী সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই 'বর যাত্রী' সেখানে পৌছে যাওয়ার কথা। তবে এখন ঘড়ির কাটায় বাজছে সাড়ে ছয়টা। এখনো পর্যন্ত বর যাত্রীর লোকদের আগমনের কোন আভাস পাওয়া যাচ্ছিল না। এরই মধ্যে তিনি দুবার নীচে গিয়ে সেই হল রুমটি ভাল করে দেখে এসেছেন, যেখানে বর যাত্রীরা এসে অবস্থান নেবে।

হোটেল কর্মচারীরা খুব মনোরম ও চমৎকার ভাবে হোটেলটিকে আলোকসজ্জা দিয়ে সাজিয়ে রেখেছিল। একদিকে টেবিলে সাদা ধবধবে চাদরের উপর খাওয়ার প্লেট-বরতন সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। হলের সাথেই সংযুক্ত কিচেন রুম, সেখানে বর যাত্রী অতিথিদের জন্য বিভিন্ন রকমের খানা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল। সেখান থেকে সমগ্র হলটিতে ছড়িয়ে পড়ছিল সুস্বাদু খাদ্যের খুশবু।

কয়েক মিনিট পূর্বে গাড়ীর একটি বহর সহ এখানে পৌছে গিয়েছিল কনে পক্ষরা। কনে হচ্ছে "পরচম পার্টির" একজন উচ্চপদস্থ নেতার মেয়ে।

এই কনেটির বিবাহ যে বরের সাথে হতে যাচ্ছে, সেও "পরচম পার্টির" অন্য একজন লীডারের ছেলে।

কনের সাথে যারা এসেছে তাদের মধ্যে একজন বিশেষ ব্যক্তিও এসেছেন। তিনি হচ্ছেন স্থানীয় পুলিশ অফিসার আখন্দজাদা। ফয়জান উগ্‌লু ও তার মুজাহিদ সাথীরা তার সাথে পূর্বের কয়েকটি হিসাব নিকাস চুকিয়ে নিতে চাচ্ছিলেন।

মোল্লা মীরদাদ খান স্থানীয় একটি মুজাহিদ গ্রুপের নেতা। সেখানকার একজন আধ্যাত্মিক বুযুর্গের সাহেবযাদা। তিনি এই অভিযানের জন্য বিশেষ ভাবে ফয়জান উগ্‌লুকে নির্বাচিত করেছিলেন। মোল্লা মীর দাদখান "ঝাওয়ার" কেন্দ্র থেকে কাবুল পর্যন্ত কয়েকটি গেরিলা অভিযানে ফয়জানকে ভাল ভাবে যাচাই-বাছাই করে নিয়েছিলেন। তিনি ফয়জান উগ্‌লুকে বিদায় দেওয়ার আগে তার কাঁধে স্নেহ ভরে হাত রেখে বলেছিলেন, "বন্ধু আমার! আমি জানি রুশতাবেদার আফগান চররা তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। তুমি মস্কো ইউনিভার্সিটি থেকে শিক্ষা অর্জন করেছো। তুমি রাশিয়ান ভাষাও বুঝো এবং বলতে পারো। এছাড়া এই অভিযানে তোমার সঙ্গে যারা যাচ্ছে তাদের মধ্য হতে তুমিই একমাত্র এমন, যে অভিজাত সোসাইটির আধুনিক রীতিনীতি ও অভ্যাস সম্পর্কে অবগত রয়েছে। তুমি এ ধরনের হোটেল ও ক্লাবের পরিবেশ সম্পর্কেও ভাল জানো। আমার মন সায় দিচ্ছে যে, আখন্দজাদাকে জাহান্নামে পৌছানোর সৌভাগ্য একমাত্র তুমিই অর্জন করতে পারবে।"

"হে আমাদের আমীর! আপনি আমাদের যে নির্দেশই প্রদান করুন না কেন, আমরা জানের বাজি লাগিয়ে তা পালন করবো ইনশাআল্লাহ।" ফয়জান দৃপ্ত শপথ ব্যক্ত করে মোল্লা মীর দাদ খান কে লক্ষ্য করে বললেন।

ফয়জান উগ্‌লু সকাল এগারটার মধ্যেই প্লাজা হোটেলে পৌছে যান। তিনি একটি ছদ্মনামে হোটেলের একটি রুম বুক করেন। তিনি হোটেলের কাউন্টারে নিজেকে গজনীর একজন ব্যবসায়ীর ছেলে বলে পরিচয় দেন এবং তার আসার উদ্দেশ্য হল, কাছেই যে ফ্রুট্‌স মার্কেট রয়েছে, সেখানে তার কিছু লেন-দেন রয়েছে। সেই হিসাব নিকাস চুকানোর জন্যই তিনি এখানে এসেছেন।

কর্নেল শোলোখোভ সম্পর্কে ফয়জান উগ্‌লু ও তার গেরিলা সাথীরা কোন ধরনের অমনোযোগী ও অসতর্ক ছিলেন না। তারা তার ব্যাপারে ছিলেন যথেষ্ট হুশিয়ার ও সজাগ। তারা একথাটি ভাল করেই জানতেন যে, কর্নেল চার্জ গ্রহণ করার সাথে সাথে খুবই দ্রুত গতিতে তাদের দিকেই ধেয়ে আসার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

ফয়জানের অধীর চিত্তটা তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো যখন তার কানে বিবাহের বিশেষ বাদ্যের আওয়াজ ভেসে এলো।

এ বাদ্যযন্ত্র বুঝিয়ে দিল যে, "বর যাত্রী" এসে গেছে। ফয়জান উগ্‌লু ওভারকোটের পকেটে রাখা রিভালবারটিতে তার হাতের স্পর্শ লাগালেন। হঠাৎ কি ভেবে তিনি বিদ্যুৎগতিতে বাথরুমে ঢুকলেন এবং রিভালবারটি ভাল করে চেক করে নিলেন। রিভালবার থেকে গুলিগুলো বের করে গারারীটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যাচাই করলেন। গুলিগুলোও উল্টিয়ে পাল্টিয়ে পরখ করে নিলেন। অতঃপর খুবই দ্রুত গতিতে রিভলবার লোড করে পকেটে ভরে বাথ রুম থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

ফয়জান হোটেলের দরজার দিকে অগ্রসর হলেন। যখন তিনি মেইন গেটে পৌঁছলেন তখন কানফাটা বাদ্য যন্ত্রের শব্দের সাথে সাথে বাদকদেরও দেখা যাচ্ছিল। হোটেলের দরজার কাছে কনে পক্ষের পুরুষ ও মহিলারা বর যাত্রীদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়েছিল।

তাদের মধ্যে রয়েছে শহরের মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ। ফয়জান ইচ্ছে করলে এখানে উপস্থিত সরকারী পার্টির বেশ কয়েকজন নাস্তিক মুরতাদকে অতি সহজে গুলির শিকার করতে পারতেন।

তার ওভারকোটের অন্য একটি পকেটে রয়েছে হ্যাণ্ড গ্রেনেড, কোন মারাত্মক পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য। কিন্তু মুজাহিদ নেতা মোল্লা মীর দাদ খানের কড়া নির্দেশ ছিল একমাত্র আখন্দ জাদাকে টার্গেট করতে, আর কাউকে নয়।

বর যাত্রী এখন হোটেলের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতে শুরু করছিল। তখন আপ্‌সে ফয়জানের ডান হাতখানা কোটের পকেটে চলে গেল। ফয়জান একটা লম্বা শেভারলেট কার হতে আখন্দজাদার টাক মাথাটা বেরিয়ে আসতে দেখলেন। আখন্দজাদা তার সঙ্গীদের ভীড়ের মধ্য দিয়ে হেটে দরজার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কারগুলো হোটেলের বাইরে পার্কিং এরিয়াতে লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছিল।

।। ৫ ।।

মেজর উরখান হাজার আক্রোশ সত্বেও এ বাস্তবতাকে ভুলে যাননি যে, যদি আজ ফয়জান উগ্‌লু তার হাত ছাড়া হয়ে যায়, তাহলে এটা কোন অসম্ভব ব্যাপার নয় যে, কর্নেল শোলোখোভ ক্রোধে ও উত্তেজনার বশবর্তী

হয়ে তাকে গুলি মেরে হত্যা করতেও দ্বিধা সংকোচ করবে না। এ কারণেই তিনি ফয়জানকে কাবু করার ব্যাপারে সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি হোটেলের চতুর্দিকে অতি গোপনীয়তা রক্ষা করে খুবই দ্রুত গতিতে ঘেরাও করে ফেললেন। অতঃপর পুরো হোটেলটিতে আফগান গোয়েন্দা "খাদ"-এর এজেন্টরা ছড়িয়ে পড়ল। তারা হোটেলের কক্ষগুলোর সম্মুখ ভাগ এবং যেখানে বিবাহ অনুষ্ঠান হচ্ছে সেই হল রুমটির দিকে গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছিল।

খাদের ভিতর মুজাহিদীনের কোন সমর্থক ফয়জান কিংবা মুজাহিদীনের কাউকে তাদের অপারেশন সম্পর্কে কোন তথ্য ফাঁস করে দেয় কিনা এ আশংকায় মেজর উরখান ফয়জান সম্পর্কে কাউকে কিছুই বলেননি। তিনি শুধু তাদের ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন, "এ ব্যক্তিটি আমাদের টার্গেট, তাকে যেভাবে হোক পাকড়াও করতেই হবে।"

সাধারণতঃ কোন অপারেশন হলে সাধারণ সৈনিকরা মোটেও বুঝতে পারতো না যে, তারা কাকে গ্রেফতার করতে যাচ্ছে।

কারণ, এ আশংকা ছিল যে, তারা মুসলিম চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নাস্তিক রাশিয়ার দালালী ছেড়ে দিয়ে নিজেদের জাতি ভাইদের অপারেশন সম্পর্কে তথ্য ফাঁস করে দিতে পারে। এর ফলে তাদের পুরো মিশনটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য হবে। সে কারণেই কমান্ডাররা সাধারণ সৈনিকদের অপারেশনের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কিছু বলতেন না।

মেজর উরখান যখন নিজের দলবল নিয়ে সিভিল পোশাকে হোটেলে পৌঁছলেন, তখন কে কোথায় অবস্থান নেবে সে অনুযায়ী তিনি তাদের এটেনশন করে রাখলেন।

বর যাত্রী দরজার কাছে এসে থেমে গিয়েছিল। কনে পক্ষরা আফগান রীতি অনুযায়ী মেহমানদের গলায় শুষ্ক ফলের মালা পরিয়ে দিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল।

উরখানের মনে হল যেন এই ভীড়ের মধ্যে অবশ্যই কর্নেল শোলোখোভ উপস্থিত রয়েছেন, তার ওপর কড়া নজরদারী করে যাচ্ছেন। যদি তিনি

সামান্যতম অবহেলা বা গাফলতির পরিচয় দেন তাহলে কর্নেল ঘটনাস্থলেই তাকে গুলি করে হত্যা করবেন।

এই হোটেলে ফয়জানের উপস্থিতির কথা জোরালো কণ্ঠে ব্যক্ত করে কর্নেল যে চমক সৃষ্টি করেছিলেন, উরখান তাতে বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে পারেননি। তিনি বুঝে কুলিয়ে ওঠতে পারছিলেন না যে, কর্নেল শোলোখোভ কি উপায়ে জানতে পারলেন যে, ফয়জান এখানে রয়েছে? কে তাকে এ তথ্য প্রদান করেছে? তার কি সংবাদ সংগ্রহ করার বিশেষ কোন শক্তিশালী নেটওয়ার্ক রয়েছে, যে সম্পর্কে আমরা কেউই অবগত নই?

অথচ আমরা 'খাদ'-এর সদস্য, রাশিয়ার বিশেষ ট্রেনিং প্রাপ্ত, শিকারী কুকুরের মত ফয়জানকে গ্রেফতার করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি!

মেজর উরখান এখনো পর্যন্ত এই ভীড়ের ভিতর ফয়জানকে দেখতে পাননি। তবে যখনই তার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ফয়জানের ওপর না পড়ে আগত অতিথিদের উপর পড়তো, তখন তিনি বুঝে নিতে পেরেছিলেন যে, এখানে আগত ব্যক্তিবর্গ কত গুরুত্বপূর্ণ এবং তিনি একথাটিও বুঝতে সক্ষম হলেন যে, অবশেষে এই হোটেলে কেন ফয়জানের উপস্থিতি থাকতে পারে।

উরখান ভীড়ের একটি সাইড দিয়ে হোটেলের ভিতর প্রবেশ করছিলেন। হঠাৎ একটি ফায়ারের শব্দে তিনি হতচকিত হয়ে পড়লেন।

শব্দ হওয়ার সাথে সাথে তিনি পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, তার থেকে মাত্র কয়েকগজ দূরে আখন্দ জাদা হাত দিয়ে তার বুক চেপে ধরে মাটির দিকে ঢলে পড়ছেন এবং তার থেকে আট-দশ গজ দূরে ফয়জান উগ্‌লু রিভালভার তাক করে আখন্দ জাদার উপর গুলি ছুঁড়ে যাচ্ছেন। আখন্দ জাদার বুক বিদীর্ণ করে টাট্‌কা রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল।

সেখানে উপস্থিত বর যাত্রীদের ভিতর একটা হুলস্থুল পড়ে গেল। তারা হুড়োহুড়ি করে প্রাণ ভয়ে পালাতে লাগল। কিন্তু উরখান ছিলেন সম্পূর্ণ সজাগ। তার মধ্যে বিন্দুমাত্র ভয়ের লেশ নেই। তার হাতে রয়েছে উন্মুক্ত রিভালবার। তিনি ফয়জানের গুলি শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছিলেন। তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, আখন্দ জাদার বাঁচার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবে তিনি যদি এখন ফয়জানকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েন, তা হলে ফয়জানের

গায় গুলী লাগার পূর্বে অনেক নিরপরাধ লোক অবশ্যই মারা পড়বে। তিনি গভীর দৃষ্টিতে অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিলেন।

ফয়জানের রিভালবারটা যেই খালি হয়ে গেল, তিনি দৌড়ে একদিকে পালাতে উদ্যত হলেন, যাতে পুনরায় রিভালভারটা লুড করা যায়। কিন্তু সেই সুযোগ তিনি পেলেন না। উরখান তার একেবারে শিয়রে পৌঁছে গেল। তার ডজন খানিক কমান্ডো সঙ্গীরা ভীড়ের মধ্য দিয়ে পথ বানিয়ে নিজ নিজ পিস্তল তাক করে ফয়জানের দিকে ধাবিত হল।

ফয়জানের বাম হাত খানা ওভার কোটের পকেটে ছিল। যখন তিনি মেজর উরখানকে বজ্রকণ্ঠে "হ্যান্ডস আপ" বলতে শুনলেন, ফয়জানের নিকট এটা কোন ব্যাপরই ছিল না যে, তিনি গ্রেনেড বের করে উরখানের দিকে ছুঁড়ে মারবেন। যদি তিনি গ্রেনেডের পিন বের করতে দু-একটি গুলিও খেয়ে ফেলেন তবুও তিনি এই কাজটি করেই ফেলতেন। কিন্তু তখন তার চারপাশে ভয়ে বিহবল লোকদের চলছিল দৌড়াদৌড়ি হুড়োহুড়ি। গ্রেনেড নিক্ষেপ করলে তাদের অনেকেই হয়ত মারা পড়বে। একজন নিরপরাধ লোকও কোন মুজাহিদের হাতে মারা পড়বে এটা মুজাহিদীনদের আদর্শ নয়। সে জন্যই ফয়জানের মন সায় দিল না গ্রেনেড নিক্ষেপ করতে। তিনি রিভালবার নীচে রেখে তার হাত দুটো উপর উঠালেন আত্মসমর্পণ করার জন্য।

।। ৬ ।।

সঙ্গে সঙ্গে মেজর উরখানের ইশারায় তার দুজন সহযোগী তড়িৎ গতিতে ফয়জানের জামা তল্লাশী নিল। সেখান থেকে তারা একটি গ্রেনেড ও কয়েক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করলো। উরখান ফয়জানের কান বরাবর পিস্তল তাক করে রেখেছিলেন। জামা তল্লাশী শেষ হলে তার হাত দুটো পীঠের পিছনে নিয়ে বেঁধে দেওয়া হল। 'খাদ'-এর জোয়ানরা তাকে ধাক্কা মারতে মারতে হোটেলের বাইরে দাঁড়ানো একটি জীপের দিকে নিয়ে গেল। তার চোখ দুটোও বেঁধে দেওয়া হল। ফয়জান তার চোখ বন্ধ হওয়ার পূর্বে যেই শেষ দৃশ্যটি দেখলেন তা হলো ঃ অনেক লোক আখন্দ জাদার মৃত দেহের চার পাশে জড়ো হচ্ছে। আশে পাশের জমিন তার রক্তে রাঙা হয়ে উঠছে। তিনি

মনে মনে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন যে, তার মিশন সফল হয়েছে। তিনি রুশ শ্বেত ভল্লুকের একজন এজেন্টকে, যার দ্বারা চিরস্বাধীন জাতি আফগানীদের ধর্ম ও ইজ্জত আবরু ভূলুণ্ঠিত হচ্ছিল, খতম করতে পেরে মনে মনে অনেক প্রশান্তি বোধ করছিলেন।

উরখান পিছনের একটি আসনে ফয়জান উগ্‌লুর পীঠে পিস্তল ঠেকিয়ে তার সঙ্গে মিলে বসেছিলেন। উরখান এখানের কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। সাধারণ অবস্থাতে তিনি কখনো এত সতর্কতা অবলম্বন করতেন না।

কিন্তু যেহেতু ব্যাপারটি ছিল কর্নেল শোলোখোভের। দেড় ঘন্টা পূর্বের সেই ভয়ানক মূর্তিধারনকারী শোলোখোভকে এত তাড়াতাড়ি তিনি ভুলে যাননি।

কর্নেল শোলোখোভের কাছে প্রতিটি মুহূর্তে সংবাদ পৌছে যাচ্ছিল। যখন তিনি স্বীয় কক্ষের খিড়কী দিয়ে ফয়জান উগ্‌লুকে ধরার জন্য বিশেষ অপারেশনের জীপটিকে ভিতরে ঢুকতে দেখলেন, তখন একটি পাষাণ স্ফীত হাসি তার ওষ্ঠদ্বয়ের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তার নির্দেশ অনুসারে বন্দীকে সরাসরি তার কামরার দিকে আনা হয়। জীপটি থামতেই মেজর উরখান ফয়জান উগ্‌লুর বাহুকে শক্তভাবে ধারন করলেন এবং তাকে জীপ থেকে অবতরণ করার নির্দেশ দিলেন।

“যখন তোমরা আমাকে গ্রেপ্তার করে এনেই ফেলেছো, তাহলে কমপক্ষে আমার চোখের বাঁধনটা তো খুলে দাও। এত কড়া পাহারার মধ্যে আমি তো আর কোথাও পালিয়ে যাচ্ছি না।” ফয়জান উগ্‌লু উরখানকে লক্ষ্য করে বললেন।

উরখান বিশেষ ভাবে একথাটি নোট করলেন যে, তার সম্বোধনে আবদার কিংবা অনুকম্পা প্রার্থনার লেশমাত্র নেই। তারমধ্যে ভয়-ভীতিরও কোন চিহ্ন মাত্র নেই। গ্রেপ্তারী থেকে নিয়ে ‘খাদ’-এর হেড কোয়ার্টারে পৌছা পর্যন্ত ফয়জান তার সাথে একটি শব্দ পর্যন্ত বলেননি। যদিও তিনি রাস্তায় কয়েকবার ফয়জান উগ্‌লুর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন।

তিনি অনিচ্ছা সত্বেও ফয়জান উগ্‌লুর জন্য নিজের মধ্যে কিছুটা হামদর্দী ও সহানুভুতি অনুভব করছিলেন।

তার ছবি দেখে কিংবা তার মুখোমুখী হওয়ার পূর্বে তিনি ভেবেছিলেন যে, ফয়জান উগ্‌লু কোন ‘হাইজ্যাকার’ ধরনের আন্তর্জাতিক গুন্ডা কিংবা মাফিয়া

হবেন। কিন্তু তার সঙ্গে কথোপকথন ছাড়াই এই সংক্ষিপ্ত সময়ের সফরে তাকে একজন বিজয়ী এবং নিজেকে তার সামনে পরাজিত মনে হচ্ছিল। ফয়জানের ব্যক্তিত্ব কেমন যেন তার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে চলছিল। দু'বছর পূর্বে যে ফয়জানকে তিনি কুখ্যাত "পুল চারখী" জেলে দেখেছিলেন, এ যেন এক ভিন্ন ফয়জান। কিন্তু উরখান স্বীয় কণ্ঠে কোন ধরনের কোমলতা প্রকাশ করলেন না। তিনি ছিলেন যথেষ্ট সজাগ। তিনি জানতেন যে, তার সঙ্গীদের মধ্যে অবশ্যই কেউনা কেউ শোলোখোভের বিশেষ গুপ্তচর রয়েছে, যদি সামন্যতম আঁচ করতে পারে যে, কয়েদীর সাথে তার ব্যবহারে কোন ধরনের কোমলতা ও ভদ্রতা রয়েছে তাহলে তারা সঙ্গে সঙ্গে কর্নেলকে রিপোর্ট করে দেবে। অতঃপর তার সঙ্গে যে আচরণ করা হবে তার ভয়াবহতা চিন্তা করে উৎকণ্ঠিত হওয়া ছাড়া তার কোন উপায় ছিল না।

তিনি গত তিন-চার মাস ধরে একথাটি গভীর ভাবে অত্যন্ত নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিলেন যে, 'খাদ'-এর হেড কোয়ার্টারে সরকারী লোকদের মধ্যে মুজাহিদীনের অনেক চর রয়েছে, যারা রুশ ও তার তল্পীবাহক সরকারের গোপন প্লান মুজাহিদীনের কাছে চুপে চুপে পাচার করে দেয়। এধরনের লোক যখন ধরা পড়তো, তাদের মারাত্মক শাস্তি প্রদান করা হত। তাদের পরিণতি হত অত্যন্ত ভয়াবহ। আজ পর্যন্ত তাদের আপনজনেরা জানতে পায়নি যে, কত নির্মমতা ও জুলুম নির্যাতন ভোগ করে তারা মৃত্যুকে বরণ করেছে!

"তোমার বাজে কথা বন্ধ করবে নাকি!" ফয়জানকে মেজর উরখান সামনের দিকে ধাক্কা দিয়ে কর্কশ সুরে বললেন।

ফয়জান কিছুই বললেন না। ভদ্র মানুষের মত তিনি চুপচাপ সামনে অগ্রসর হলেন। 'খাদ'-এর বিশাল অট্টালিকাটির বিভিন্ন কক্ষ অতিক্রম করে অবশেষে তারা তাকে "অপারেশন ব্লকে" নিয়ে আসল।

উরখান রীতিমত ফয়জান উগ্‌লুর একটি বাহুকে শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন। কর্নেল শোলোখোভের কক্ষের বাইরে তাকে থামতে বলা হল।

বাইরে প্রহরারত গার্ডরা পুনরায় তার জামা তল্লাশী নিল। উরখানকে তারা চলে যেতে বলল এবং ফয়জানের বাহুদ্বয়কে শক্ত ভাবে ধারন করে তারা তাকে ধাক্কা মারতে মারতে ভিতরে নিয়ে গেল। কক্ষের ঠিক মধ্যখানে

গিয়ে তারা ফয়জান উগ্‌লুকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলল এবং তার চোখের বাঁধন খুলে দিল। যখন সে তার চোখ দিয়ে দেখার উপযোগী হল, তখন প্রথমে ফয়জান উগ্‌লুর দৃষ্টি কর্নেল শোলোখোভের চেহারার ওপর পড়ল। কর্নেল শোলোখোভ খানিক দুরে দাঁড়িয়ে মৃদু হাসছিলেন। ফয়জান কক্ষের বিভিন্ন সাইডগুলো ভালভাবে পরখ করে নিলেন। কামরার চতুর্দিকে স্টেনগানে সুসজ্জিত কমান্ডোরা পজিশন নিয়ে আছে।

"খোশ আমদেদ মিস্টার ফয়জান উগ্‌লু!' শোলোখোভ অট্টহাসি দিলেন।

ফয়জান চুপচাপ তার চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়েছিলেন। কর্নেল শোলোখোভ ফয়জানদের মাতৃভাষা ফার্সী দিয়েই তাকে সম্বোধন করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু, ফয়জান প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, কর্নেল আফগানী নয়, তিনি হচ্ছে খাঁটি রাশিয়ান। যদিও তিনি অনর্গল ফার্সী ভাষায় কথা বলে যাচ্ছিলেন।

"তুমি গ্রেপ্তার হয়েছো বলে তোমাকে নিয়ম অনুযায়ী আফসোস করা উচিৎ নয়। কারণ, তুমি যেই মিশনে বেরিয়েছিলে সেটা সফল হয়েছে। আখন্দজাদা মারা গেছে।" শোলোখোভ রীতিমত হেসে হেসে বলে যাচ্ছিলেন।

"আমার নিকট আমার গ্রেপ্তার হওয়া, আহত হওয়া, কিংবা নিহত হওয়া মোটেই গুরুত্ব রাখে না।" প্রথমবার ফয়জান উগ্‌লু মুখ খুললেন।

"খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, মস্কো ইউনিভার্সিটির একজন গ্রাজুয়েট ও এধরনের কথা বলতে পারে।" কর্নেল খুবই তাচ্ছিল্য সুরে তার দিকে তাকিয়ে বললেন।

"এখন থেকে তোমাকে অনেক আশ্চর্য বস্তুর মুখোমুখী হতে হবে। তুমি শুধু দেখতে থাকো।" ফয়জান রীতিমত নির্ভীক ভাবে জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন।

"কমপক্ষে এজন্য হলেও আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো যে, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই তোমাদের মত গোয়ার, নিরেট মূর্খ লোকদের কথা বলার ঢং শিখিয়েছে।" কর্নেল কিছুটা দম্ভ সুরে বললেন। কর্নেল বুঝতে পেরেছিলেন যে, ফয়জান তার আসল পরিচয় জেনে ফেলেছেন।

"তোমাদের এই আত্মপ্রবঞ্চনা অতিসত্বর দূর হয়ে যাবে।" ফয়জান উগ্‌লু বললেন।

"কথাতো দেখি অনেক বলো।" কর্নেলের ঈষৎ হাসি হঠাৎ গায়েব হয়ে গেল।

"আমরা কাজও অনেক করি।" ফয়জান গর্জে উঠল।

যখন কর্নেল শোলোখোভ ফয়জানের জীবনী ফাইল পড়ছিলেন, তখন তার সম্পর্কে সর্ব প্রথম যে ধারনাটি তার জন্মাল তা হল এই যে, অবশ্যই এই যুবকটিকে মোল্লারা বিপথগামী করেছে। কারণ, মস্কো ইউনিভার্সিটির বিদেশী স্টুডেন্ট গ্রুপের মধ্যে তার নাম সে সব ছাত্রদের তালিকাভুক্ত ছিল, যারা চরমপন্থী কমিউনিস্ট চিন্তাধারা রাখতো। আর কর্নেল শোলোখোভ তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে পেরেছিলেন যে, যে সব লোক চরমপন্থী চিন্তাধারা রাখে তাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে যে, তারা চরম বিপরীত চিন্তাধারাও সহজে গ্রহণ করে ফেলে।

তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি ফয়জান উগ্‌লুকে পুনরায় কম্যুনিজম আদর্শে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন।

ফয়জান উগ্‌লুকে প্রগতিশীল চিন্তাধারায় ফিরিয়ে আনা একান্ত জরুরী ছিল এবং তাদের পক্ষে ছিল মহা লাভজনকও। তিনি মুজাহিদীনের এত গভীরে যেতে পেরেছেন যে, কিজিবি এ ব্যাপারটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি যদি তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হন, তাহলে এটা হবে তাদের জন্য অনেক বড় বিজয়। তাদের অনেক বড় মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে এবং রাজধানী কাবুলে মোল্লাদের সন্ত্রাসী তৎপরতার কোমরও ভেঙ্গে দেওয়া যাবে।

শোলোখোভের সফলতার মেইন রহস্য এটাই ছিল যে, তিনি হচ্ছেন ঠাণ্ডা মস্তিস্কের একজন উগ্র প্রকৃতির মানুষ। তার মধ্যে রয়েছে ধৈর্য ও সহনশীলতার ব্যাপক উপাদান। তার ভিতর সবর শক্তি এত বেশী ছিল যে, অনেক সময় কোন ব্যাপারে দেখা যেত যে, পুরো হেড কোয়ার্টার কনফিউজড ও হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে মুহূর্তেও কর্নেলের দৃঢ়তা ও অবিচলিত সিদ্ধান্তের ফলে সেই জটিল সমস্যার সহজ সমাধান বেরিয়ে আসতো। আজ পর্যন্ত তিনি মনে মনে যা সংকল্প করেছেন, বাস্তবেও তা করতে সক্ষম হয়েছেন। সে কারণেই উচ্চপর্যায়ে তার রয়েছে যথেষ্ট সুখ্যাতি ও মর্যাদা।

"আমার মনে হয় তুমি অনেক ক্লান্ত। তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। প্রথমে তুমি বিশ্রাম নাও। অতঃপর বন্ধুত্ব পরিবেশে তোমার সঙ্গে আলাপ করবো।"

শোলোখোভ কৃত্রিম স্নেহ পরশ দিয়ে ফয়জানের কাঁধে মৃদু চাপড় মারলেন। তার ইশারা পেয়ে একজন রক্ষী ফয়জানকে বাইরে নিয়ে গেল। তিনি কোন উচ্চবাচ্য না করে সান্ত্রীর পদাঙ্কনুসরণ করলেন। বাইরে দন্ডায়মান দুজনসশস্ত্র প্রহরী ফয়জানকে নিজেদের নিয়ন্ত্রনে নিয়ে অন্য একটি ব্লকের দিকে অগ্রসর হল।

ফয়জান কর্নেল শোলোখোভের কক্ষ থেকে বের হতেই তিনি স্বীয় টেবিলে রাখা ইন্টারকমের দিকে হাত বাড়ালেন। একটি বিশেষ নম্বর ডায়েল করতেই তার যোগাযোগ 'টর্চার সেল'-এর ইনচার্জ মেজর বুনাকোফের সঙ্গে হয়ে গেল। তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে বুনাকোফকে কিছু নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি নিজের কুরসীতে হাত-পা ছড়িয়ে ধপাস করে বসে পড়লেন। কুরসীতে পিঠ লাগিয়ে একটি স্বস্তির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বিড়বিড় করে বললেন "পরিকল্পনার প্রথম ধাপতো সম্পূর্ণ হল।"

টর্চার সেল

রাত বারোটায় তার ডিউটি শেষ হয়েছিল। আজ তিনদিন পর সে ঘরে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছে । এখন তাদের কাছে সাপ্তাহিক ছুটি বলতে কোন কিছু নেই। পুরো মাসে খুবই কষ্টে একদিন, কিংবা ভাগ্যের জোরে দুদিন ছুটি নসীব হচ্ছিল তাদের।

ইমারতের কামরাগুলো বিদীর্ণ করে জানালা দিয়ে কোথাও কোথাও মিটি মিটি আলো উঁকি মারছিল। নতুবা সবদিকেই গভীর অন্ধকার ও অতিশয় ঠাণ্ডা হাওয়ার রাজত্ব ছিল। স্বীয় কক্ষ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে আহমাদকে যেন এই অন্ধকারেরই একটি অংশ মনে হচ্ছিল।

নিজ ব্লক থেকে মোটর সাইকেল পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে তাকে তিন জায়গায় নিজ পরিচয় প্রদান করতে হল। মেইন গেট পর্যন্ত সে মোটর সাইকেলকে স্টার্ট ছাড়াই ঠেলে ঠেলে নিয়ে এলো। অতঃপর তার জন্য মেইন গেটটি খুলে গেল। জুনিয়র লেফটেন্যান্ট আহমাদ তুরসুন মোটর সাইকেলটি বাইরে ঠেলে নিয়ে এলো। সে বিশেষ কারফিউ কার্ড নিজের ওভারকোটের বাইরে লাগিয়ে রেখেছিল, যাতে রাস্তায় কেউ তাকে থামালে তার কোন অসুবিধা না হয়। বাইরে এসে সে রুশ মডেলের মোটর সাইকেলটি স্টার্ট দিল। মোটর সাইকেলটির প্রচন্ড শব্দে যেন সমস্ত পরিবেশ প্রকম্পিত হয়ে ওঠল। তার সফর ছিল কাবুল-জালালাবাদ রোড অভিমুখে। ওই রোডেরই এক প্রান্তে অবস্থিত একটি মহল্লায় তাদের বাড়ী। সেখানে আহমাদ তুরসুনের মা এবং বোন তার জন্য অধীর আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করছিল। তার বাবা গজনী শহরে ফলের ব্যবসা করে। সে মাসে এক-দুবার ঘরে আসে। রাস্তায় তিনজায়গায় সড়কে টহলদান রত আর্মিদের জীপ তার গতিরোধ করে 'কারফিউকার্ড' চেক করে।

জীবন্ত পাহাড়ের সন্তান

এখন সে কিছুটা অনাবাদী এলাকায় এসে পড়েছিল। এই সড়কটি পার্বত্য অঞ্চলের ভিতর দিয়ে চলে গেছে। একটি বিশেষ স্থানে পৌঁছে সে মোটর সাইকেলের স্পীড কমিয়ে দিল। অবশেষে মোটর সাইকেলের ইঞ্জিন বন্ধকরে দিল।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল, হয়ত কোন যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে মোটরটি বন্ধ হয়ে গেছে। সড়কের এক পার্শ্বে সে মোটর সাইকেলটি দাঁড় করিয়ে রাখল।

রাজধানী কাবুলের ঠাণ্ডা যখন শিরার ভিতর গিয়ে ঢুকতো তখন মনে হতো যেন শিরার ভিতর চলাচলকারী রক্ত জমাট করে দিয়েছে। কিন্তু আহমাদ তুরসুনের কাছে এই মুহূর্তে ঠাণ্ডা-গরমের অনুভূতি যেন একেবারেই শেষ হয়ে গেছে। এখানে তার আসাটা একটা রুটিন অনুযায়ী ছিল। সে মোটর সাইকেলের টুল বক্স খুলে চেক করলো যে, কোন যান্ত্রিক গোলযোগ আছে কিনা! তবে এটা তার একটি বাহানাও হতে পারে। ইতোমধ্যে গাঢ় আঁধারের মধ্য দিয়ে পর্বতমালার এক কোন্ থেকে একটি আবছা আবছা ছায়া তার দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। সেই ছায়াটি বেশ কাছে এসে একটি পেন্সিল টর্চ অন্ অফ্ করে বিশেষ ধরনের ইশারা করল। আহমাদ তুরসুনের মস্তিস্ক সজাগ হয়ে ওঠল। লম্বা কোর্টের ভিতরে রাখা পিস্তলটি সে বের করে নিল। অপরিচিত ছায়াটি যতই কাছে আসতে লাগলো, তার পিস্তলটি হয়ে ওঠল ততই চঞ্চল। আগন্তুকটি তার একেবারে কাছাকাছি এসে স্বীয় হাত দুটো উপর উঠিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কারণ, সে নিজের দিকে পিস্তল তাক করা দেখেছিল।

"তবে কি স্বীয় লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হলাম ?" আহমাদ তুরসুন সেই আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে অস্পষ্ট শব্দে বিড়বিড় করল।

আগন্তুকটির মুখ থেকেও পশ্‌তু ভাষার একটি বিশেষ শব্দ বের হয়ে এলো। এতে করে আহমাদ তুরসুন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এবং পিস্তলখানা নামিয়ে নিল।

সে আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য আগন্তুকের সাথে কয়েকটি "গোপন কোড শব্দ" বিনিময় করল।

সে পুরোপুরি আশ্বস্ত হওয়ার পর নিজের পায়ে পরিধেয় একটি বুট থেকে একখানা কাগজ বের করল এবং সেটা আগন্তুকের হাতে সোপর্দ করল।

আগন্তুকটি "ফী আমানিল্লাহ" বলে যে দিক থেকে এসেছিল ঠিক সেদিক অদৃশ্য হয়ে গেল।

"আল্লাহ হাফেজ" আহমাদ তুরসুনও ক্ষীণ সুরে বিড়বিড় করল। যখন সে বাড়ীর দিকে যাচ্ছিল তখন তার আনন্দের সীমা ছিল না। সে তার দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছে। সে ফয়জান উগ্‌লুর আফগান গোয়েন্দা বিভাগ 'খাদ'-এর হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার কথা মুজাহিদীন পর্যন্ত পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে।

।। ২ ।।

মোল্লা মীরদাদ খান -এর চোখ দুটো গভীর চিন্তায় ছিল নিমজ্জিত। তার আশে পাশে পাঁচ জন মুজাহিদীনও চুপচাপ বসে আছে। তারা সবাই নিজেদের মাননীয় নেতার চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। একজন অপরজনের দিকে তাকাতেও তাদের চরম লজ্জা বোধ হচ্ছিল। এমন মনে হচ্ছিল যেন তারা পাঁচজনই এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী।

মোল্লা মীরদাদখানকে মাত্র একটা চিন্তাই ভাবিয়ে তুলছিল যে, তাদের ভিতর অবশ্যই সরকারী কোন চর রয়েছে। তা না হলে আফগান সিক্রেট সার্ভিসের পক্ষে ফয়জান উগ্‌লু পর্যন্ত পৌঁছতে পারা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

আর কেমন জানি এখানে উপস্থিত তার বিশ্বস্ত সঙ্গীদের কাছেও তার এই আশংকাটি ব্যক্ত করতে দ্বিধাবোধ হচ্ছিল।

"আমার মতে আমাদের বর্তমান ঠিকানা পরিবর্তন করা উচিৎ।" হঠাৎ অসহ্য নীরবতাকে খান খান করে পাঁচজনের মধ্য হতে একজন আমীর মোল্লা মীরদাদখানকে লক্ষ্য করে বলে ওঠলো। মোল্লা মীরদাদখানের সামনে রাখা কাহ্‌ওয়ার পেয়ালাটি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল। অথচ তিনি সব সময় গরম গরম কাহ্‌ওয়া পানে ছিলেন অভ্যস্ত। তিনি এক লহমার জন্য সম্বোধনকারীর দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে দেখলেন।

"আমাদের মুহতারাম আমীর সাহেব! আমার ধারনা যে, ভাই কাসেম ঠিকই বলছে।" অপর একজন কাসেমের কথা সমর্থন করে বলে উঠল।

"তোমাদের কি মতামত ?" মীরদাদখান অবশিষ্ট তিনজনকে লক্ষ করে বললেন। তারা তিনজনই চুপ রইল। কোন কথা যেন তাদের মুখের সামনে এসে আটকে গিয়েছিল। অবশেষে তাদের মধ্য হতে একজন গলা পরিষ্কার করে বলল, "এই ঠিকানাটি আমাদের অনেক কষ্টের বিনিময়ে হাতে এসেছে। এখানে বসে আমরা পুরো শহরটির উপর নজরদারী করতে পারি। আমার ধারণা, এটা হচ্ছে একমাত্র এমন জায়গা যেটা আমাদের শত্রুদের গোয়েন্দা হেলিকপ্টারের বিদ্যুত চোখ থেকে আড়ালে রয়েছে। যদি এ ঠিকানাটি আমাদের হাত ছাড়া হয়ে যায় তা হলে হয়ত জীবনেও এমন শানদার আশ্রয়স্থল পাবো কিনা সন্দেহ রয়েছে।

"কিন্তু, ফয়জানও তো রক্ত মাংসের মানুষ। সেও কোন সময় মানবীয় দুর্বল অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে। তখন সে হয়ত বাধ্য হয়ে আমাদের বর্তমান আস্তানার কথা ফাঁস করে দিতে পারে।" কাসেম তার যুক্তি সবল করলো।

"প্রথম প্রথম ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন। কিন্তু রাশিয়ানদের অনুপ্রবেশের পর এখন সরকারের হাতে তদন্ত করার জন্য বিদ্যুত চালিত যন্ত্রনাদায়ক অত্যাধুনিক যন্ত্র রয়েছে, যার মাধ্যমে শক্ত জানওয়ালা লোকদের মুখ খোলা তাদের পক্ষে কোনই ব্যাপার নয়।" আরেকজন কাসেমকে সমর্থন করে বলল। সকলের দৃষ্টি ছিল তাদের দলপতি মোল্লামীরদাদ খানের ওপর, তার সিদ্ধান্তই হচ্ছে চূড়ান্ত।

"আমার প্রিয় বন্ধুগণ!" অবশেষে মুজাহিদ লীডার বলে উঠলেন। "তোমরা যদি এখান থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য শুধু একারণে চিন্তা ভাবনা করে থাকো যে, ফয়জান উগ্‌লু কর্নেল শোলোখোভের সামনে নতি স্বীকার করবে, আত্মসমর্পণ করবে, তা হলে আমি তোমাদের একথার নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারি যে, এটা কোন ভাবেই সম্ভব হবে না। দুনিয়াতে এমন কিছু লোকও রয়েছে যাদের বেলায় চূড়ান্ত কথা বলা যায়। আমরা ফয়জান উগ্‌লুর ওপর চোখ বুজে আস্থা রাখতে পারি। যদিও মানুষ হিসেবে তাঁর দুর্বল দিকও থাকতে পারে এবং নিয়ম অনুযায়ী তার ব্যাপারে অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করাও ঠিক নয়। তবুও আমাকে বলতে হচ্ছে যে, ফয়জানের

উপর আমরা পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারি। ফয়জানকে আমি ভাল করেই চিনি। সে মরণকে বরণ করতে পারে, কিন্তু আমরা যেরূপ আস্থা নিয়ে এ পবিত্র জিহাদ করে যাচ্ছি, ঠিক তেমন আস্থা রয়েছে আমার ফয়জানের ওপর।"

"মুহতারাম আমীর সাহেব! আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা অন্যত্র চলে যাওয়ার যে মতামত ব্যক্ত করেছি, সেটা মোটেও এ কারণে নয় যে, আমাদের ফয়জান উগ্‌লুর উপর আস্থা নেই। তার উপর অবশ্যই আমাদের বিশ্বাস রয়েছে। তবে শুধু সতর্কতামূলক হিসেবে আমরা এ মত ব্যক্ত করেছিলাম। যদি কাবুলে আমাদের দু-তিনজন উচ্চপদস্থ লোক ধরা পড়ে যায়, তা হলে কাবুল সরকারের ভিতর আমাদের যে সব হিতাকাঙ্খী লোক রয়েছে, যাদের মাধ্যমে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে থাকি, তারা আমাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে এবং তাদের জীবন হয়ে পড়বে বিপন্ন। এরপরও আপনি যে ধরনের সিদ্ধান্তই নেন না কেন, আমরা অবশ্যই তা মাথা পেতে মেনে নেব।" কাসেম খান বলল।

"কাসেম খান!" এবার মোল্লা মীরদাদখান বজ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন। "প্রথমতঃ এমন মুহূর্ত কখনই আসবে না। যদি এরূপ কিছু ঘটেও যায়, তবুও দখলদার রুশ শ্বেত ভল্লুক আমাদের ধারে কাছেও ঘেষতে পারবে না, ইনশা আল্লাহ। বিকল্প পথের ওপর আমার সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। আমাদের সঙ্গীগণ প্রতিটি মুহূর্তের খবরাখবর রাখছে।"

"আপনার নির্দেশ শিরোধার্য হে আমাদের আমীর!" কাসেম খান স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল।

মোল্লা মীরদাদ খান এক চুমুক দিয়ে কাহ্‌ওয়ার পেয়ালাটা খালি করে ফেললেন। অতঃপর স্বীয় সঙ্গীদের দিকে ঘুরে বললেন ঃ "ছাজাওয়াল খানের কাছে আমার বার্তা পাঠিয়ে দাও যে, আমরা অতিসত্বর তার দিকে আসছি। ভারী অস্ত্র বাহিনীর সাথীদের বলে দাও, তারা যেন বিলম্ব না করে সেদিকে রওয়ানা হয়ে যায়। জালালাবাদের বন্ধুদের নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করো, তারা যেন সার্বিক সহযোগিতা করে। বর্তমানের এই ঠিকানায় মাত্র আটজন মুজাহিদ অবস্থান করবে। বাদবাকী যারা রয়েছে সবাই যেন আমার আগামী নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে নতুন অবস্থানের দিকে যাত্রা করে।"

"আপনার প্রতিটি নির্দেশ যথাযথ ভাবে পালিত হবে হে আমাদের আমীর!" কাসেম খান বলল। অতঃপর সকলে দায়িত্ব পালনের জন্য বেরিয়ে পড়ল।

।। ৩ ।।

আহমাদ তুরসুন পরের দিন দুপুরের পর অফিসে ফিরল। তার ডিউটির সময় হচ্ছে বেলা তিনটায়। বাড়ী থেকে রওয়ানা দেয়ার প্রাক্কালে তার বৃদ্ধা মা তাকে বিদায় জানানোর জন্য ঘরের দরজা পর্যন্ত এসেছিল। সে অভ্যাস অনুযায়ী তার প্রাণাধিক ছেলে আহমাদ তুরসুনের মাথা চুম্বন করে তার জন্য দুহাত তুলে দোয়া করল। রেশমজানের এই জগতে আহমাদ ছাড়া আছেই বা কে ?

একমাত্র এই ছেলেটির জন্য সে কত কষ্ট ভোগ করেছে। তার মনে খায়েশ ছিল যে, আহমাদ তুরসুন পড়ালেখা শেষ করে তার বাবার ব্যবসা হাতে নেবে। তাদের বংশের অনেক পূর্বতন পুরুষরাও কোন সরকারের চাকুরী করেনি। এটা তাদের সমাজে ঘৃণার বস্তু ছিল যে, অমুক খানের অমুক ছেলে সরকারের চাকর। এ কারণেই মান ইজ্জতের ভয়ে কেউ চাকুরীতে যোগ দিতো না। কিন্তু সর্বনাশ হোক আধুনিক শিক্ষার, যে আহমাদ তুরসুনের ব্রেনকে খারাপ করে দিয়েছে।

রেশমজানের মা-বাবা অনেক কম বয়সেই রেশমজানকে তাদেরই খান্দানের এক যুবকের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিল। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য যে, বিবাহের তিন মাসের মধ্যেই সে বিধবা হয়ে যায়। তার স্বামীর ওফাতের সাত মাস পর আহমাদ তুরসুন জন্ম গ্রহণ করে। তার জন্মের পর তার লালন পালনের প্রশ্নটি সব সময় তাকে ভাবিয়ে তুলতো। কারণ, তাদের সমাজে দ্বিতীয় বিবাহের ধারনাটি তেমন সুবিধাজনক ছিল না। সাধারণতঃ দেখা যেত যে, যদি কোন বিধবা মহিলার দ্বিতীয় বিবাহ হত এবং তার পরলোকগত স্বামীর কোন সন্তান থাকতো, তাহলে দ্বিতীয় স্বামী তার পরলোকগত স্বামীর সন্তানের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতো না। তার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করতো। একারণেই রেশমজান আহমাদ তুরসুনের ভবিষ্যত নিয়ে খুব চিন্তায় থাকতো।

ছেলের জন্মের পর যখন সে গজনীতে নিজেদের বাড়ীতে ফিরে এলো, তখন তার ধর্মপরায়ণতা ও সুন্দর আখলাকে প্রভাবিত হয়ে তাদেরই খান্দানের আরেকজন যুবক রেশমজানের মা-বাবার কাছে তার বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। সেই যুবকটির বাবা-মা কেউই জীবিত ছিল না। তবে যুবকটি আদর্শবান হিসেবে সবার কাছে ছিল সুপরিচিত।

রেশমজানের বাবা-মা যুবকটির প্রস্তাবকে আল্লাহর গায়েবী সাহায্য মনে করল। তারা রেশমজানের মতামত নিয়ে তার প্রস্তাবে সম্মতি জানালো।

একটি অনাড়াম্বর অনুষ্ঠানে তাদের বিবাহ হয়ে গেল। তখন আহমাদ তুরসুনের বয়স হবে বড় জোর দুবছর। তার নতুন বাবা ছিল ফলের ব্যবসায়ী। সে গজনী থেকে ফলফলাদী নিয়ে রাজধানী কাবুলের ফলমণ্ডীতে বিক্রয় করতো।

অতঃপর সে কাবুলে বসবাস শুরু করে এবং পুরো ফ্যামিলিকে কাবুলেই নিয়ে আসে। খাদে খান এক মুহূর্তের জন্যও রেশমজানকে অনুভব করতে দেয়নি যে, আহমাদ তুরসুন আপন ছেলে, না সৎ ছেলে।

খাদে খান ছেলেকে কাবুলের মিশনারী স্কুলে ভর্তি করে দেয়। শিক্ষা সমাপনীর পর আহমাদ তুরসুন খাদে খানের কাছে সরকারী চাকুরী করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সে ছেলেকে তার অনুমতিও দেয়। খাদেখান বেশীর ভাগ নিজের ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। কাজের ঝামেলার কারণে ঘরেও তার খুব কমই আসা হত। তবে আহমাদ তুরসনু দু-তিন দিন অন্তর অবশ্যই তার সঙ্গে দেখা করতো।

।।৪।।

ঘর থেকে বের হওয়ার পর সে অফিসে যাওয়ার জন্য ঠিক সেই পথ অবলম্বন করলো, যে পথ ধরে সে অফিস থেকে ঘরে এসেছিল।

পার্বত্য অঞ্চলের সেই সড়কটিতে পৌঁছে একবার পুনরায় আহমাদ তুরসুন তার মোটর সাইকেলের গতি কমিয়ে দিল। সে মোটর সাইকেলে ফিট করা ডান দিকের আয়না দিয়ে একটি আর্মি ট্রাক পিছনে আসতে দেখল। সে ট্রাকটিকে ওভারটেক করার সুযোগ করে দিল।

ট্রাক থেকে মুক্তি পেয়ে সে গত রাতের সেই মোড়টিতে পৌঁছে একবার পুনরায় মোটর সাইকেলটির স্টার্ট বন্ধ করে দাঁড় করিয়ে রাখল। সে এখানে

থামার একটি বাহানা খুঁজছিল। সে সারি সারি পর্বত মালার কোল ঘেঁষে যে সড়কটি চলে গেছে, সেখানেরই একটি স্থান তালাশ করছিল পেশাব করার জন্য। প্রকৃত পক্ষে প্রস্রাব করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। মতলব ছিল ভিন্ন। অবশেষে সেই জায়গাটি তার দৃষ্টিগোচর হল। একটি পাথরের নীচে চাপা দেওয়া নীল বর্ণের খামের এক কোণ সে ভালভাবেই দেখতে পাচ্ছিল। সে ওখানে বসল পেশাব করার ভঙ্গিতে। তারপর সে পাথরটি সরিয়ে খামটা তুলে নিল । তুরসুন খামটি ছিঁড়লে সেখান থেকে ছোট একটি কাগজ বেরিয়ে এলো। সেই কাগজটিতে লিপিবদ্ধ ছিল একটি পয়গাম। আহমাদ তুরসুন বার্তাটি পড়ে পকেট থেকে লাইটার বের করে সেটা পুড়িয়ে ফেলল। সে যখন নিশ্চিত হল যে, জলন্ত ছাই থেকে কেউ কিছু হাসিল করতে পারবে না, তখন সে আবার লাইটার জালিয়ে একটি সিগারেট ধরালো এবং লম্বা লম্বা টান নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়লো। এতগুলো কাজ সম্পাদন করতে তার দু-তিন মিনিট ব্যয় হল। এর চেয়ে কম সময়ে কোন আফগানী থেকে আশা করা যায় না যে, সে প্রস্রাবের কাজ সমাধা করতে পারবে।

সে মোটর সাইকেলের দিকে আসার মুহূর্তে পাহাড়ের টিলার আড়ালে সেই মুজাহিদকে উধাও হতে দেখতে পায়নি, যে মেইন রোড থেকে এ স্থান পর্যন্ত আহমাদ তুরসুনের উপর কড়া নজরদারী করে যাচ্ছিল, যে এত পাকা নিশানাবায ছিল যে, শুন্যে উড়ন্ত পাখিকেও ভূপাতিত করার যোগ্যতা সে রাখত। এ মুজাহিদটি হচ্ছে কাসেম ঈষানজাদা, মোল্লা মীরদাদ খানের ঈগলদের মধ্য হতে অন্যতম ঈগল।

অতঃপর অফিস পর্যন্ত পৌঁছতে আহমাদ তুরসুনকে কোথাও থামতে হলো না। সে মৃদু শব্দে শিশ বাজাতে বাজাতে খুবই বেপরোয়ার সাথে পূর্বের মত মোটরসাইকেলটিকে টানতে টানতে ভিতরে নিয়ে এলো। আজ ঘটনাক্রমে মেইন গেটে এমন একজন রক্ষী পাহারা দিচ্ছিল, যার সঙ্গে তার রয়েছে ভাল পরিচয়। নতুবা বার বার পাস দেখাতে দেখাতে তার অনেক বিরক্তি ও অস্বস্তিকর মনে হত।

রাশিয়ানরা আসার পূর্বে এসব পাস-টাসের কোন বালাই ছিল না। কিন্তু যখনই তারা আফগানিস্তানের মাটিতে পা রাখল, তখন নতুন নতুন ব্যাপার

দেখা ও শুনা যেত লাগল। সবখানেই পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। পরিচয় জানা-শুনা সত্বেও এক ব্লক হতে অন্য ব্লকে যেতে হলে পাস দেখাতে হতো, অথচ পূর্বে এরকম ছিল না। পূর্বে তারা মন খুলে একজন আরেকজনের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করতে পারতো। কিন্তু রাশিয়ান অফিসারদের আসার পর হতে খোলা মনে কথাবার্তা বলতে তারা দ্বিধা-সংকোচবোধ করছিল।

পরিবেশ এত দূষনীয় হয়ে পড়েছিল যে, খামাখা একজন আরেকজনকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছিল। যদি কোন জুনিয়র কিংবা সিনিয়র সামরিক অফিসার হাসি ঠাট্টার মধ্যে কৌতুহলী বশতও স্বীয় অফিস কিংবা কেন্টিনে বসে সরকার বা রাশিয়ান উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতো, তাহলে পরের দিনই উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারের সামনে তাকে জবাবদিহীর জন্য উপস্থিত হতে হতো। তাকে কড়া ভাষায় সতর্ক করে দেওয়া হত যেন এধরনের ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে। পুনরায় কিছু হলে তার পরিণাম হবে খুবই ভয়াবহ।

"দেওয়ালেরও কান রয়েছে" ভুলে যাওয়া এ সবকটি এখানকার প্রত্যেকেই ভালমত স্মরণ রাখছিল। তারা খুবই গুরুত্ব দিয়ে এই সবকটির উপর আমল করতো।

আহমাদ তুরসুন কাজে যোগ দেওয়ার পূর্বে যখন ডিউটি অফিসারের কাছে হাজিরা খাতায় নিজের হাজিরা লাগাতে গেল তখন সেখানে তার জন্য একটি নির্দেশ অপেক্ষা করছিল "এখ্খুনি অপারেশন চীফ-এর সঙ্গে দেখা করো।"

ক্ষণিকের জন্য তার মাথাটা ঘুরে গেল। এখন পর্যন্ত সে সরাসরি কর্নেল শোলোখোভের মুখোমুখি হয়নি। আজ এই প্রথমবার সে তার মুখোমুখী হতে যাচ্ছে। তার ডিউটি এমন ধরনের ছিল যে, তার সরাসরি কর্নেল শোলোখোভের সম্মুখে আসার অবকাশ ছিল না।

"তা হলে এ সব কি হতে যাচ্ছে, তাকে কেন তলব করা হচ্ছে?" বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন তার মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠল। সে গভীর চিন্তিত হয়ে পড়ল। অবশেষে নানা শংকা মনে নিয়ে সে শোলোখোভের কক্ষের দিকে পা বাড়ালো।

।।৫।।

ফয়জান উগ্‌লু চলতে চলতে এমন একটি ব্লকের সামনে এসে উপস্থিত হল, যেটা অন্য সকল ব্লক থেকে ছিল বিচ্ছিন্ন এবং এক কোণে অবস্থিত। এই ব্লকটি ছিল একটি ক্ষুদ্র দুর্গ সদৃশ। তার চৌ-দেয়ালের মাঝখানে রয়েছে লোহার একটি শক্তিশালী ফটক। এই ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই ফয়জান উগ্‌লুর চোখের বাঁধন খুলে দেয়া হল।

দরজার ভিতর অংশে কেবিনে বসা ছিল দুজন মোটাতাজা শক্তদেহওয়ালা জোয়ান। তাদের কাছে ফয়জানের চার্জ দিয়ে এ পর্যন্ত যারা তার সাথে এসেছিল তারা ফিরে গেল।

তারা চলে গেলে সেখানে বিদ্যমান তিন-চারজন সিপাহী ফয়জানকে ধাক্কা মেরে মেরে একটি কক্ষে নিয়ে গেল। তারা তার আন্ডারপ্যান্ট ছাড়া সমস্ত কাপড় খুলে ফেলল। অতঃপর পুনরায় তার তল্লাশী নেয়া হল।

এরপর তাকে কুর্তা এবং সেলোয়ার পরতে দেওয়া হল এবং নগ্ন পদে ধাক্কা দিতে দিতে তাকে হল রুমে নিয়ে যাওয়া হল।

ফয়জান যখন হল রুমে পা রাখল, তার উপর অকস্মাৎ যেমন কেয়ামত এসে পড়ল। কমপক্ষেও না হলে দশজন হাট্টাগোট্টা সিপাহী তার উপর চড়াও হল। হাত-পা চালিয়ে যে যে ভাবে পারছিল তাকে মারতে মারতে আধ-মরা করে ফেলল। ফয়জানের হাত দুটি ছিল পিছন দিক থেকে বাঁধা। এ কারণে তার পক্ষ থেকে আক্রমণ প্রতিহত করার প্রশ্নই ওঠেনা। সে অসহায় ভাবে মার খেতে লাগল। সে আত্মসংবরণ করার শত চেষ্টা সত্ত্বেও কয়েকবার তার মুখ থেকে উহ্‌ উহ্‌ শব্দ বের হল। সে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে এক পর্যায়ে নিজের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে এত জোরে চাপ দিল যে, নিম্ন ঠোঁটটি কেটে রক্ত নির্গত হতে লাগল। রক্তের তিক্ত স্বাদ এখনো তার জিহবায় অনুভূত হচ্ছিল যে, তার মনে হল যেন, ধীরে ধীরে তার জ্ঞান লোপ পেতে যাচ্ছে। এর সাথে সাথেই সে গভীর অচেতনে ডুবে গেল।

যখন তার সম্বিৎ ফিরে এলো, সে নিজেকে পাথরের ফরাশের উপর শোয়া দেখতে পেল। তার শরীরের নীচে ছিল দুর্গন্ধযুক্ত একটি পুরাতন ছেঁড়া-ফাটা কম্বল। শরীরের কাপড়গুলো ছিঁড়ে ফেটে রক্তাক্ত হয়ে রয়েছে। তার হাড্ডির

জোড়া জোড়ায় করছিল প্রচণ্ড ব্যথা, যেন কেউ তার শরীরের প্রতিটি অংশকে হাতুড়ি দিয়ে নির্দয়ভাবে আঘাত করেছে। ব্যথা তার হাড়ে হাড়ে অনুভব হচ্ছিল। সে কোন নড়াচড়া করল না, চুপচাপ পড়ে রইল। সে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে বুঝে একজন সিপাহী তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে আসল। সে ফয়জানকে কিছু বলল না, বা কিছু জিজ্ঞেসও করল না। বরং তার পরিপূর্ণ সম্বিৎ ফিরে এলো কিনা তার অপেক্ষায় রইল। খানিক পর সে রিপোর্ট করতে চলে গেল। ফয়জান ভীষণ ব্যথার সাথে সাথে প্রচণ্ড শীতও অনুভব করছিল। তার বুকটা তৃষ্ণায় ফেটে যাচ্ছিল। কিন্তু যথাসাধ্য সম্ভব সে নিজের পক্ষ থেকে কোন দুর্বলতা প্রকাশ করতে চাচ্ছিল না। ওঠে বসার মত শক্তি তার কাছে ছিল না। কিন্তু তবুও সে কোন না কোন ভাবে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসল। সে বসেছে দু-মিনিটও হয়নি, ওই সেলটির দরজা খুলে গেল এবং তিন-চারজন সিপাহী ধড়মড় করে ভিতরে ঢুকে পড়ল। তারা খুবই নির্দয়ভাবে তার বাহু ও পা ধরে টেনে হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে যেতে লাগল। তারা এমন ভাবে তাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল যেন সে কোন জীবন্ত মানুষ নয় বরং মৃত জানোয়ার, যাকে কোন খাদে ফেলে দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফয়জানের তো মনে চাচ্ছিল, কোন প্রকারে ওঠে এসব হিংস্র পাষন্ডদের শরীরের মাংসকে আলাদা আলাদা করে ফেলতে। কিন্তু তার মধ্যে আত্মরক্ষা ও প্রতি আক্রমণের সমস্ত শক্তি লোপ হয়ে গিয়েছিল। তার এই ভয়ানক সফর সেই হল রুমটির সামনে এসে শেষ হল, যেখানে প্রথমবার তার উপর কেয়ামত নাযিল হয়েছিল। সেখানে সে একজন বেটে রাশিয়ান মেজরকে তার সামনে দাঁড়ানো দেখলো। তার চেহারার মধ্যে হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতা ফুটে ওঠছিল। যেসব লোক ফয়জানকে পাকড়াও করে নিয়ে আসছিল তারা তাকে মেজরের পায়ের সামনে এনে ফেলে দিল। মেজর নিজের জ্বলজ্বল করা রক্তখেকো চোখ দুটো ফয়জানের উপর গেড়ে রেখেছিল। সে তার ডান হাতের ছড়িটি যার মাথায় লোহার খোল লাগানো ছিল, বার বার তার বাম হাতের উপর মেরে যাচ্ছিল।

সে অপ্রত্যাশিতভাবে একটি শক্তিশালী লাথি ফয়জানের পিঠের উপর বসিয়ে দিয়ে বলল "আমার নাম মেজর বুনাকোফ। অবশ্যই তুমি আমার নাম শুনে থাকবে।"

ফয়জান বুনাকোফকে যদিও চিনতো না। কিন্তু সে কেজিবি সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছিল যে, তারা অপরাধীদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি নেওয়ার জন্য তাদের উপর কত মারাত্মক ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে, যেগুলো শুনলে শরীরের লোম খাঁড়া হয়ে যায়।

বুনাকোফ যদি নিজের পরিচয় নাও দিতো তবুও তার বুঝতে অসুবিধা হতো না যে, সে একজন রাশিয়ান সেনা অফিসার। কারণ, সে রাশিয়ান আর্মি উর্দী পরিহিত ছিল।

কর্নেল শোলোখোভের নরম ব্যবহারের পর বুনাকোফের অপ্রত্যাশিত এই গরম ব্যবহার থেকে ফয়জান ভালমত আন্দাজ করতে পারলো যে, এটা মানসিক নির্যাতনেরই একটা কৌশলমাত্র। এর পিছনে 'খাদ'-এর কোন ক্রিয়া কাজ করছে না বরং এই বর্বরতার পিছনে অবশ্যই একমাত্র কেজিবি'র মস্তিষ্ক কাজ করে যাচ্ছে।

সে চুপচাপ বসে বুনাকোফকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। তার অভিধানে "মাথা নত" বলতে কোন শব্দ ছিল না। বুনাকোফ পায়চারী করতে করতে তার চার পার্শ্বে একটা চক্কর লাগাল এবং আচানক আরেকটি জোরদার লাথি বসিয়ে দিল তার পিঠের উপর।

ফয়জান উগ্‌লুর মনে হল যেন তার কোমরটা চড়চড় করে ভেঙ্গে গেছে। তার মুখ থেকে অনিহা সত্ত্বেও একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এলো। এতে মেজর বুনাকোফ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। মনে হল, ফয়জানের কষ্ট পাওয়াতে তার আনন্দের আর সীমা নেই। সে হিংস্রদানবের মত হোহো করে হাসতে হাসতে ফয়জানকে নিজের ডাণ্ডাটি দিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে পিটাতে লাগল। যে সব সিপাই ফয়জানকে নিয়ে এসেছিল, তারাও পাশে দাঁড়িয়ে মেজর বুনাকোফের সঙ্গে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন ঐই হাসিটাও তাদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বুনাকোফ লাফিয়ে লাফিয়ে ফয়জানের উপর জোরদার কিক মেরে যাচ্ছিল এবং ডান্ডা দিয়েও নির্যাতন চালাচ্ছিল।

সেই মুহূর্তে ফয়জানের মানস পটে ভেসে ওঠল সেই "রোমান আখড়া"র দৃশ্য, যেখানে রুমীয় ক্রীতদাসদের উপর অমানবিক নির্যাতন চালাতো কুখ্যাত জালেম শাসক "নীরু"র নিষ্ঠুর বর্বর সাঙ্গ-পাঙ্গরা।

হঠাৎ করে বুনাকোফের অট্টাহাসি থেমে গেল। সাথে সাথে বাকী লোকগুলোও খামোশ হয়ে গেল। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারা সকলেই একই মেশিনের পার্টস মাত্র।

মেজর বুনাকোফের ইশারায় একজন সিপাহী বাইরে চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই সিপাহীটি একজন "স্টেনগ্রাফার'কে সাথে করে নিয়ে এলো। তার হাতে রয়েছে কাগজ কলম। সে কক্ষের এক কোণে রাখা একটি কেদারায় বসে পড়ল। সাথে সাথে সেখানে রাখা টেপ রেকর্ডারের সুইচ অন্ করা হল।

"তোমার নাম?" বুনাকোফ গলা ছেড়ে প্রশ্ন করল।

"তোমাদের ফাইলে লেখা রয়েছে।" ফয়জান উগ্‌লু তাচ্ছিল্যতার সাথে উত্তর দিল।

"কোন দলের সাথে সম্পর্ক?"

"আফগানিস্তানের সাথে।"

"আখন্দজাদাকে কার আস্কারায় হত্যা করেছো?"

"স্বেচ্ছায়" ফয়জান খুবই বেপরোয়ার সাথে জবাব দিয়ে যাচ্ছিল।

এখনো পর্যন্ত তার কোন উত্তরে বুনাকোফের মধ্যে উত্তেজনা ভাব লক্ষ্য করা গেলো না। হয়ত সে মানসিক দিক থেকেও ফয়জান উগ্‌লুর উপর নিজের বড়ত্ব প্রদর্শন করতে চাচ্ছিল।

"নগরীতে যে সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, তার পিছনে কার হাত রয়েছে?"

"আমার।"

"তুমি কার কথায় এসব বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে যাচ্ছো?"

"আমি কারো কথায় কোন কিছু করি না।"

মেজর বুনাকোফের চেহারায় অস্বাভাবিক কিছু দেখা যাচ্ছিল না।

সে প্রশ্নোত্তরের সময় অভ্যাস অনুযায়ী নিজের ডান হাতের ছড়ি দিয়ে বাম হাতের উপর মৃদু আঘাত করে যাচ্ছিল।

আচানক সে গলা ছেড়ে হুংকার ছাড়ল ঃ

"মারো .... ওকে মারো ....।" সে নিষ্ঠুর পাষন্ডের মত চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে সেখানে উপস্থিত সিপাহীদের নির্দেশ দিল। তার নির্দেশ পাওয়ার

সাথে সাথে তারা ফয়জান উগ্লুর উপর ক্ষুধার্ত হায়নার ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। আবার সে প্রথমবারের মত পরিস্থিতির সম্মুখীন হল। মেজর বুনাকোফ এই নিষ্ঠুরতম নির্যাতনে আগে আগে ছিল। সে মাতালের মত তার উপর ডান্ডা মেরে যাচ্ছিল। আর বাকী চেলা চামুন্ডারা তাকে কিল, ঘুষি, লাথি মেরে যাচ্ছিল।

মার খেতে খেতে ফয়জানের ঠোঁট ফেটে রক্ত বেরিয়ে পড়ছিল। মুখ হয়ে গেল নীল বর্ণ। এক পর্যায়ে সে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ল এবং গভীর অচেতনে হারিয়ে গেল।

।।৬।।

কক্ষের বাইরে পৌঁছে আহমাদ তুরসুন নিজের পরিচয় দান করল। বাইরে পাহারারত বিশেষ গার্ডরা তার জামা তল্লাশী নিল। তারা তাকে সার্ভিস পিস্তল রেখে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দিল। কামরার ভিতর অপ্রত্যাশিত ভাবে কর্নেল শোলোখোভ নিজের আরামদায়ক কুরসীতে আসীন হয়ে অপলক দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়েছিলেন। কর্নেল স্বীয় আসন থেকে ওঠে আহমাদ তুরসুনকে "খোশ আমদেদ" জানালেন এবং তার সঙ্গে করমর্দন করে সামনের একটি চেয়ারে বসতে বললেন।

"আমি তোমার ফাইল দেখেছি।" কর্নেল শোলোখোভ টেবিলের উপরে রাখা ফাইলটির দিকে ইংগিত করে বললেন।

"ইয়েস, স্যার।" আহমাদ তুরসুন ঢোক গিলে বলল।

"তুমি খুবই ভালো যাচ্ছো।"

"ধন্যবাদ, স্যার।" আহমাদ তুরসুনের কিছুটা সাহস সঞ্চার হল।

"তোমার নম্রতা ভদ্রতার কারণে তোমার সঙ্গে সত্যি সত্যি অন্যায় আচরণ করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী এযাবৎ তোমাকে কোন সিনিয়র ফৌজী অফিসার হওয়া উচিৎ ছিল।" কর্নেল শোলোখোভকে খুবই ভাল মেজাজে দেখা যাচ্ছিল। আহমাদ তুরসুনের কিছুই বুঝে এলো না যে, সে তার কথার কি জবাব দেবে। সে খামোশ নির্বোধ বালকের ন্যায় কর্নেলের দিকে তাকিয়ে

রইল। তার বাহ্যিক অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল যে, কর্নেলের ব্যক্তিত্ব তার মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে।

"তুমি কি জানো এর কারণ কি ?"

"না, স্যার।" অপ্রত্যাশিত ভাবে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো।

"মেইন কারণ হচ্ছে সানাই।"

সানাই হচ্ছে টর্চার সেলের আফগান ইনচার্জ। ইদানিং তাকে আহমাদ তুরসুনদের ব্রাঞ্চ থেকে পদোন্নতি করে এই বিশেষ ব্রাঞ্চে বদলী করা হয়। সানাই ইতিপূর্বে তার প্রধান বস্ ছিল। সে কখনই আহমাদ তুরসুনের কোন কাজেই সন্তুষ্ট ছিল না।

আহমাদ চুপচাপ কর্নেল শোলোখোভের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

"সে হচ্ছে ইসফানদিয়ারের ঘনিষ্ঠ মানুষ। আর ওই বৃদ্ধটি সানাইকে অতিমাত্রায় বিশ্বাস করে।" কর্নেল নিজের বক্তব্য জারি রেখে বললেন।

আহমাদ কি উত্তর দেবে, বুঝে উঠতে পারছিল না।

"আমি তোমাকে এক মাসের মধ্যে সিনিয়র র‍্যাংকে পদোন্নতি দিতে চাই।"

"ধন্যবাদ, স্যার।" আহমাদ খুবই নম্রতার সাথে উত্তর দিল।

"তবে একটি শর্ত রয়েছে।"

হঠাৎ যেন একটি শীতল লহর আহমাদের হাড়গুলোকে বিদীর্ণ করে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

তার মন আতংকিত ছিল । কর্নেল কোন্ ধরণের শর্ত তার উপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছেন?

"শর্তটি কি, স্যার ?" সে হিম্মত করে জিজ্ঞেস করলো।

"দেখো, আজ থেকেই তোমাকে টর্চার সেলে বদলী করা হচ্ছে। তোমার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে এই যে, তুমি সানাই-এর উপর কড়া নজর রাখবে। তার প্রতি মুহূর্তের সংবাদগুলো সরাসরি আমার কাছে পৌঁছাবে। এ ব্যাপারে অন্য কারোর সাথে যোগাযোগ করার কোনই প্রয়োজন নেই। তোমাকে সদা-সর্বদা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার, যোগাযোগ করার বিশেষ পারমিশন রইল।" কর্নেল শোলোখোভের কটু হাসি তার ঠোঁটের সাথে লেগেই ছিল।

"ঠিক আছে, স্যার।" আহমাদ তুরসুন টর্চার সেল পর্যন্ত পৌঁছতে পারায় আল্লাহকে শত শত ধন্যবাদ জানালো। নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য গায়েবী মদদ ছিল।

"আর হ্যাঁ," কর্নেল শোলোখোভ এক কাপ চা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "যদি তুমি সন্ত্রাসবাদী মোল্লাদের সঙ্গে সানাইয়ের সাথে কোন গোপন সম্পর্ক রয়েছে বলে প্রমাণ দিতে সক্ষম হও, তা হলে" ....

তিনি কথা অসম্পূর্ণ রেখে আহমাদ তুরসুনের মুখের ভাব লক্ষ্য করতে লাগলেন। অতঃপর বললেন, "তাহলে তুমি সানাই-এর স্থান দখল করতে পারবে।"

আমি জানের বাজি লাগিয়েও আপনার নির্দেশ পালন করবো, স্যার!" আহমাদ তুরসুন তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল।

"তবে একটি কথা অবশ্যই খেয়াল রাখবে।" কর্নেল আবার তাকে লক্ষ্য করে বললেন।

"সেটা কি স্যার ?"

"বেশী চতুরতা দেখাতে চেষ্টা করবে না; কিন্তু হ্যাঁ, বুঝলে তো! তুমি তো ভাল করেই জানো যে, আমাদের তাড়াতাড়ি বেকুব বানানো যায় না।"

"ইয়েস, স্যার"! নির্দ্বিধায় তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো।

যখন আহমাদ তুরসুন তার নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করে স্বীয় ব্লকের দিকে যাচ্ছিল, তখন সে কমপক্ষে একথাটি ভাল করে বুঝতে সক্ষম হল যে, অবশেষে কর্নেল শোলোখোভ এই গোয়েন্দা অফিসের সাধারণ কর্মচারী থেকে নিয়ে উপরস্থ অফিসার পর্যন্ত সকলের গোপন কথা কি করে জানতে সক্ষম হন! তিনি লোভ ও ভয় দেখিয়ে এ ভাবেই একজনকে আরেকজনের পিছনে লাগিয়ে রাখেন।

তার সাথে সাথে সে মনে মনে আল্লাহর শোকর আদায় করলো যে, এখন সে ফয়জান উগ্লুর সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে সফলকাম হবে। নতুবা তার পর্যন্ত "বিশেষ বার্তাটি" পৌঁছাতে তার কতই না সমস্যার সৃষ্টি হত।

ইয়াসমীন

আহমাদ তুরসুনের পৌঁছার পূর্বেই তার পোস্টিং অর্ডার সানাই-এর টেবিলে পৌঁছে গিয়েছিল। সানাই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বিড়বিড় করছিল ঃ কমবখ্‌ত, তাহলে এখানেও এসে হাজির হয়েছে !"

যখন সানাই গোশ্বাভরে আহমাদ তুরসুনের ফাইলটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে মারছিল, ঠিক তখনি আহমাদ তুরসুন সানাইয়ের রুমে প্রবেশ করে। আহমাদ দরজার সামনে থেকে তাকে স্যালুট দিল এবং খুবই বিনয় ও আদবের সাথে তার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। সানাই অত্যন্ত রাগের সাথে তার দিকে তাকালো এবং বলল ঃ

"তুমি যখন এ ধরনের কাজে অভ্যস্ত নও, তখন তোমার এখানে আসার প্রয়োজনটা কি ছিল ?"

"স্যার!" আহমাদ তুরসুন বিদ্রূপাত্মক সুরে বলল ঃ"আমি তো এখানে নিজের মর্জিতে আসিনি।"

"ও আল্লাহ, এই রাশিয়ান কর্নেল তো দিন দিন আমাদের পক্ষে বড় আযাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই ইতর প্রাণীটিকে কেমন অসময়ে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।" সানাই উচ্চ স্বরে দাঁত কড়মড় করে বলতে লাগল।

"স্যার! আপনি যা বলছেন, যথার্থই বলছেন।" আহমাদ তুরসুন খুব কষ্টে তার হাসিটা সংবরণ করে বলল।

"আচ্ছা, তুমি একটু বসো। তোমাকে কি কি কাজ করতে হবে তা নির্ধারণ করে দিচ্ছি।" সানাই নিজের রাগটা প্রশমিত করে তাকে বলল।

"আচ্ছা, তুমি কিছুক্ষণের জন্য একটু বাইরে যাও।"

সানাই তেলে বেগুনে জ্বলছিল। আহমাদ তুরসুনের সঙ্গে তার কোন সময় বনি-বনা হয়নি। সানাই যেহেতু 'খাদ'-এর ডাইরেক্টর ইসফানদিয়ার খানের

আত্মীয়। এ জন্যই সে সব সময় চাইতো যে, যারা তার অধীনে কাজ করে তারা যেন তার ইংগিত পাওয়ার পূর্বেই কাজ সম্পন্ন করে ফেলে। সে তাদের কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত আনুগত্য আশা করতো। কিন্তু আহমাদ তুরসুন এসব কথার প্রতি কোন ধ্যানই দিতো না। সে তার স্বীয় দায়িত্ব পালনকেই বেশী গুরুত্ব প্রদান করতো। সে তোষামোদকে মোটেই পসন্দ করতো না। অথচ সানাই তার থেকে এ জিনিসটিরই আশা করতো। সানাই আহমাদ তুরসুনের ওপর তার আক্রোশটা ঝাড়তে পারেনি। কারণ, আহমাদ কোন সময় কাজে অবহেলা করেনি। তবে সে আহমাদ তুরসুনের ফাইলটা এতই বিকৃত করে দিয়েছিল যে, আগামী তিন বছরের মধ্যে তার "সিনিয়র অফিসার" হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ার আশা করাটা ছিল একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার।

আহমাদ তুরসুন অফিসের বাইরে চলে গেলে সানাই ভাবতে লাগল যে, আহমাদ তুরসুনের ডিউটির ধরন তো কোন সময়ই এ রকম ছিল না যে, তাকে বর্তমানের মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অতি গোপনীয় বিভাগে পোস্টিং করা যেতে পারে। অবশ্যই তার এই নতুন ডিউটি প্রদানের পিছনে কোন দুরভিসন্ধি থাকতে পারে হয়তো। আহমাদ তার অনিষ্ট ও তাকে হেয় করার জন্য চালাকি করে এখানে এসেছে। এখন তার মাথায় এ ব্যাপারটি ঘুরপাক খাচ্ছিল যে, সে কি করে আহমাদ তুরসুনের উচিৎ শিক্ষা দিতে পারে। সে বুঝে কুলিয়ে ওঠতে পারছিল না যে, কিভাবে ওকে জব্দ করা যায়। অবশেষে তার মাথায় একটি পরিকল্পনা আসল এবং সে মনে মনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল। "বাছা, এখন তোমাকে একটু দেখে নেবো।" সে মুখে মুখে বিড়বিড় করল।

খানিক পরই আহমাদ তুরসনের কাছে তার নতুন ডিউটির নির্দেশ পৌঁছে গেল। আহমাদ তুরসুন তার নির্দেশ নামা পড়ে মৃদু না হেসে পারল না।

সানাই তো প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাকে নিম্নমানের ডিউটি সোপর্দ করেছিল। কিন্তু আহমাদ তুরসুন আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে জানাচ্ছিল অশেষ ধন্যবাদ যে, এই ডিউটির ফলে সে ফয়জান উগ্লুর সঙ্গে অতিসহজে যোগাযোগ করতে পারবে।

আহমাদ তুরসুনের নতুন ডিউটি ছিল, যে সকল অপরাধী রিমান্ডে রয়েছে, আহমাদ তাদের বাবুর্চি খানার ইনচার্জ।

যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটাকে খুবই তুচ্ছ কাজ মনে হচ্ছে, কিন্তু এক হিসেবে এটা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ জিম্মাদারী।

সানাই যদিও প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাকে এই দায়িত্ব প্রদান করেছিল, তবুও উপরস্থ অফিসারদের আশ্বস্ত করার জন্য তার কাছে ছিল যথেষ্ট যুক্তি।

ইতোপূর্বে এখানে দু-তিনটি এমন ঘটনা ঘটতেও দেখা গেছে যে, কোন বাবুর্চি মেস ইনচার্জ-এর দৃষ্টি এড়িয়ে কোন আসামীর আহারে নেশাযুক্ত দ্রব্য মিশিয়ে সেই আহার নির্ধারিত আসামী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতো। সেই আসামী নেশাযুক্ত দ্রব্য মিলানো খানা খেয়ে রিমান্ডকালীন "ভয়ানক টর্চারিং"-এর প্রতিক্রিয়া থেকে থাকতো মুক্ত। তার উপর নির্যাতনের কোন আছরই পড়তো না। যদি অকথ্য নির্যাতনের পরও কোন আসামী দোষ স্বীকার না করতো, তা হলে তার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা হত যে, হয়ত এই আসামীটি নিরপরাধ।

এসব ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর মেস ইনচার্জের ডিউটিটা যেন অত্যন্ত শক্ত হয়ে গেল। তারপর থেকে সাধারণত খানা রান্না হয়ে গেলে মেস ইনচার্জ সেগুলোকে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিতো। অতঃপর তারই তত্ত্বাবধানে সেগুলো বন্দীদের মধ্যে বন্টন করে দিতো।

আহমাদ তুরসুন খুবই আনন্দ চিত্তে নিজের নতুন যিম্মাদারীর পরোয়ানার ওপর স্বাক্ষর করল এবং বাবুর্চি খানার দিকে যাত্রা করল।

ওখানে খানিক পরেই আসামীদের জন্য নৈশকালীন খানা পাকানো হবে।

রিমান্ডের আসামীদের রাখার জন্য মাটির গর্ভে দুই সারিতে অনেক কুঠুরী বানানো হয়েছে। উভয় সারির কুঠুরীর দরজা মুখোমুখী রাখা হয়নি, বরং সেগুলো হচ্ছে বিপরীত মুখী। যাতে করে এক বন্দী অন্য বন্দীর চেহারা দেখতে না পায়। উদ্দেশ্য, বন্দীদের বেশী বেশী মানসিক নির্যাতন দেয়া।

এসব বন্দীশালা থেকে যখন কোন আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তদন্তকারী টিমের কাছে নিয়ে যাওয়া হত, তখন তার চেহারা কম্বল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হত, যেন সে কাউকে দেখতে না পায় এবং অন্য কেউ তার চেহারা দেখতে না পায়। জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ঠিক অনুরূপ অবস্থাতেই তাকে আবার বন্দীশালায় নিয়ে আসা হত। মাসকে মাস চলে যেতো, কিন্তু তবুও এত

কাছে থাকা সত্ত্বেও এখানে গ্রেফতারকৃত লোকেরা একজন আরেকজন থেকে থাকতো সম্পূর্ণ বেখবর। তারা জানতো না যে, তারই পার্শ্বের কুঠুরীতে তার কোন হতভাগা ভাই বন্দী রয়েছে এবং তার পরিচয় কি?

এ আশংকা ছিল যে, হয়ত কোন বন্দী উচু গলায় তার লাগোয়া রুমের বন্দীর কাছে নিজের পরিচয় বলে ফেলবে, এজন্য উচু স্বরে কথা বলা কিংবা পরস্পরে কথা বলা ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও অমার্জনীয় অপরাধ। কেউ যদি এ আইন অমান্য করতো তা হলে তাকে এ জন্য ভোগ করতে হত মারাত্মক শাস্তি, সে শাস্তি ছিল অত্যন্ত নির্মম। এ ধরনের কড়া শাস্তি এজন্য দেয়া হত, যাতে অন্যান্য বন্দী শিক্ষা নেয় এবং আইন অমান্য করার কল্পনাও না করে। তাকে আচ্ছামত শাস্তি দেওয়ার পর তার মুখে কালি মেখে অন্যান্য কুঠুরীর সামনে দিয়ে ঘুরানো হত এবং এ কথা বলতে বাধ্য করা হত "আমি মহান কমরেডদের ইনসাফ ভিত্তিক আইন অমান্য করেছি বলে তারা আমাকে এই শাস্তি প্রদান করছে এবং তারা যে শাস্তিই দিচ্ছে তা খুবই ন্যায় সঙ্গত।"

এত কড়াকড়ি করা সত্ত্বেও কোন না কোন দিন কোন বন্দী অবশ্যই সেই আইন অমান্য করে বসতো। তারা নিজের পার্শ্বের কুঠুরীর বন্দী ভাইদের পরিচয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে যেতো। এ ব্যাপারে তারা কোন কোন গার্ডের সহযোগিতাও পেতো।

এখানে বিভিন্ন দলের সাথে সম্পৃক্ত মুজাহিদীন বন্দী ছিল। তারা সকলেই কোন না কোন ভাবে ফয়জান উগ্‌লুকে জানতো। যদিও তারা ফয়জান উগ্‌লুকে দেখেনি, তবুও তারা তার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতো। ফয়জান উগ্‌লু গেরিলা যুদ্ধে ছিল একজন রহস্যময় যুবক, বাহাদুর ও হিম্মতওয়ালা মুজাহিদ এবং কিংবদন্তীর নায়ক রূপে সবার কাছে ছিল সুপরিচিত। সে সংক্ষিপ্ত লড়াইয়ের মধ্যে এত বেশী কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল যে, সে মুজাহিদীনের নিকট একজন মহান হিরো হিসেবে গণ্য ছিল।

।।২।।

ফয়জান উগ্‌লুকে গ্রেফতার করে আনার সাথে সাথে এ সংবাদটি দাবানলের মত মুহূর্তের ভিতর টর্চার সেলে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাকে নিয়েই

সবখানে আলোচনা হচ্ছিল। তার এখানে আসার খবরটি প্রতিটি কোণে কোণে পৌঁছে গিয়েছিল। একদিকে তার মত একজন জাদরেল মুজাহিদ গ্রেপ্তার হয়ে এখানে আসার কারণে অন্যান্য বন্দী মুজাহিদদের দুশ্চিন্তা বাড়ে অপর দিকে তাদের মনোবলও বৃদ্ধি পায়।

ফয়জানকে যখন প্রথমবার বেহুশ অবস্থায় এখানে নিয়ে আসা হয় তখন এই বন্দীশালায় তার যে সকল বাহাদুর সঙ্গী বন্দী ছিল, তারা নারায়ে তাকবীর--আল্লাহু আকবার শ্লোগান দিয়ে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল।

মারাত্মক নির্যাতনের কারণে যদিও সে শারীরিকভাবে খুবই দুর্বল ও নাজেহাল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তবুও তার দৃঢ়তা ও মনোবলকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য কোন মারণাস্ত্র এখন পর্যন্ত আফগানী কিংবা রাশিয়ান সেনাদের হাতে পৌঁছেনি। তদন্ত কমিটির গুন্ডারা যখন প্রতিবার তার ওপর নির্যাতন চালাতো, তখন এক পর্যায়ে সেই নিপীড়নের মাত্রা বাড়তে বাড়তে চলে যেত তার বরদাশতের বাইরে। সে অজ্ঞান হয়ে যেত।

কিন্তু সে আবার যখন সম্বিৎ ফিরে পেতো, তখন তার মধ্যে বিরাজ করতো একটি নতুন চেতনা, নতুন উদ্যমতা। সেই স্পৃহা যেন বেড়েই চলতো। মুজাহিদ কমান্ডার মোল্লা মীরদাদখানের সংস্পর্শে কয়েক মাস থাকায় ফয়জানকে গোশত-চামড়ার সাধারণ মানুষ থেকে লৌহমানবে রূপান্তরিত করে দিয়েছিল। তার ঈমানী চেতনায় এতই দৃঢ়তা এসে গিয়েছিল যে, যদি তার দেহের গোশতকে আফগানিস্তানের আজাদীর জন্য টুকরা টুকরাও করে ফেলা হত, তাহলে এটাকে সে নিজের জন্য পরম সৌভাগ্যের বস্তু মনে করতো এবং হেসে হেসে জান দিতেও সে কুণ্ঠাবোধ করতো না।

এখানকার কমিউনিস্ট গার্ডরা তার মনোবল দেখে বিস্ময়ে হতবাক যে, সে আজ পর্যন্ত যতবার বেহুশ হওয়ার পর জ্ঞান ফিরে পেয়েছে, সে কখনো তাদের কাছে পানি চায়নি। তারা নিজেরাই মানবতার খাতিরে চুপে চুপে তাকে এক দুই ঢোক পানি পান করতে দিয়েছে!

আজ এই প্রথম ফয়জানের জন্য বন্দীদের বাবুর্চি খানা থেকে খানা আসছে। সে তাদের এই অনুগ্রহকে একটি কুটচাল হিসেবেই ধরে নিচ্ছিল।

সে মনে মনে হাসল, “বেদ্বীনরা! তোমরা যত ষড়যন্ত্রই করো না কেন, আমার ঈমানকে টলাতে পারবে না।”

বাবুর্চি খানার নতুন ইনচার্জ আহমদ তুরসুন নিজের তত্ত্বাবধানে খানা বন্টন করছিল। সে প্রতিটি কয়েদীকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখছিল এবং তাদের সাথে খুবই শক্ত ভাষায় কথা বলছিল, শাসাচ্ছিল।

ফয়জান উগ্‌লুকে সতর্কতা হিসেবে সর্বশেষের সেলটিতে রাখা হয়েছিল। সেই সেলের সাথে আরো দু-তিনটি কুঠুরী খালি রাখা হয়েছে। আসামীকে ‘ডেঞ্জার’ মনে করে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। হয়ত সে তার সাথের কুঠুরীর বন্দীদের নিজের পরিচয় বলে দিতে পারে জোর গলায় এবং তাদের সঙ্গে ভাব বিনিময় হতে পারে। এটা যাতে তার পক্ষ থেকে না হয়, এ জন্যই এ ব্যবস্থা।

আহমাদ তুরসুন পায়চারী করতে করতে এখন সেই প্রকোষ্ঠের দিকে যাচ্ছিল, যেখানে ফয়জান উগ্‌লুকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। পাহারাদার মেইন দরজার সামনে ছিল দন্ডায়মান। তার একমাত্র দৃষ্টি ছিল খানার প্রতি, যেগুলো বন্দীদের মধ্যে বন্টন করা হচ্ছিল। অন্য কোনদিকে তার দৃষ্টি ছিল না। সে চাচ্ছিল, আহমাদ তুরসূন সেখান থেকে সরে পড়ুক। যাতে সে চুপে চুপে খোরাক বন্টনকারী সিপাহীদের কাছ থেকে কিছু বাড়তি খোরাক হাসিল করতে পারে। যখন আহমাদ তুরসুন পায়চারী করতে করতে কুঠুরীগুলোর একেবারে শেষ মাথায় পৌঁছে গেল। তখন গার্ডটি তড়িঘড়ি করে নিজের প্লেট বের করে চুপিসারে রেশন বন্টনকারীদের সামনে রেখে দিল। তারা ঝট্‌পট্‌ করে কিছু খোরাক তার প্লেটে রেখে দিল।

“ঈগলের পক্ষ থেকে সালাম।” আহমাদ তুরসুন ফয়জান উগ্‌লুর কুঠুরীর একদম নিকটে গিয়ে বলল।

“ঈগল” শব্দটি শুনে ফয়জান চমকে উঠল। সে ধোঁকা খাচ্ছে না তো আবার।

।।৩।।

“কালো ঈগলের পক্ষ থেকে সালাম ও শান্তি বার্তা গ্রহণ করুন।”

আহমাদ তুরসুনের পরবর্তী কথায় ফয়জানের দ্বিধা-দ্বন্দের অবসান ঘটল

সে একটু ভাল করে বসল এবং উত্তর দিল ঃ“পাহাড় জীবন্ত -- আফগানরাও জীবন্ত।” এগুলো আসলে কোড, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে একজন আরেকজনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

আহমাদ তুরসুন আরো কয়েকটি কথা বলল, যার ফলে ফয়জান উগ্‌লুর সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেল।

সে অনিচ্ছাকৃত ভাবে তার মাথাটি সামনের দিকে এগিয়ে দিল। আহমাদ তুরসুন তার একেবারে কানের কাছে এসে ক্ষীণসুরে বলল ঃ“কালো ঈগলের পয়গাম আছে।” তার কথাটি শেষ হয়েছে, ঠিক তখনি আহমাদ তুরসুন দেখতে পেল যে, বাবুর্চিরা তার দিকে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সে এক কদম-দুই কদম পিছন হটে একটা ভাণ করে ফয়জানকে শাসাতে লাগল ঃ

“তোমরা পানাহার পাওয়ার একেবারেই উপযুক্ত নও। তোমাদের তো ধুঁকে ধুঁকে মরা উচিৎ। মোল্লারা তোমাদের মস্তিস্ক নষ্ট করে দিয়েছে।” সে আচ্ছামত ফয়জানকে শাসাতে লাগল।

ফয়জান উগ্‌লু নির্বাক হয়ে শির অবনত করে তার কৃত্রিম ঝাঁঝাঁলো কথাগুলো শুনছিল। সে কোন টুশব্দ করল না।

বাবুর্চিরা ফয়জান উগ্‌লুর সামনে একটি প্লাসটিকের প্লেটে তরকারী ও রুটি নিক্ষেপ করে চলে গেল। কিন্তু আহমাদ তুরসুন সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

আহমাদ তুরসুনের জিম্মায় এই দায়িত্বটিও ছিল, যেন সে খানা খাওয়ার শেষ সময় পর্যন্ত বন্দীদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখে। কারোর প্রতি কোন সন্দেহ হলে যেন সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাকড়াও করা হয়। কারণ, সাধারণত খাওয়ার মুহূর্তেই নেশাগ্রস্ত দ্রব্য খানার সঙ্গে মেশানো হত। ফয়জান উগ্‌লুর সেলের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আহমাদ তুরসুন কাগজে লেখা সেই পয়গামটি ফয়জানকে পৌঁছিয়ে দিল। বার্তাটি বলার পর সে ঝট্ পট্ করে সেখান থেকে প্রস্থান করে অন্যান্য বন্দীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। প্রত্যেকের কাছে গিয়ে তাদের অবস্থা গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

ঘড়ির কাটায় তখন রাত দশটা বাজছিল। ফয়জান উগ্‌লু স্বীয় প্রকোষ্ঠের এক কোণে নামায সেরে নিয়ে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে সামনের শারীরিক নির্যাতন মোকাবেলা করার ব্যাপারে মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

ঠিক সে মুহূর্তে বুনাকোফের পক্ষ থেকে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন সান্ত্রী এলো।

এবার তাকে ভদ্রতা ও সৌহার্দ্যমূলকভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তবে এখানকার নিয়ম অনুযায়ী তার চোখ-মুখ কম্বল দিয়ে ঢেকে নিয়ে যাওয়া হয়। পূর্বের মত টেনে হেঁচড়ে লাথি কিল ঘুষি মেরে নিয়ে যাওয়া হয়নি। সেই হলরুমটির দরজার সামনে পৌঁছে তার চেহারা থেকে কম্বল খানা সরিয়ে নেয়া হয়, অতঃপর তাকে ভিতরে ঠেলে দেওয়া হয়।

হল রুমের এক কোণে ছাদের একটি আংটার সাথে একটি রশি ঝুলছিল।

মেজর বুনাকোফ স্বীয় ছড়ি দিয়ে ঝুলন্ত রশির দিকে ইংগিত করে বলল "তোমাকে উল্টো লটকিয়ে প্রথমে মরিচের ধুঁয়া আস্বাদন করাবো, অতঃপর শরীরের প্রতিটি জোড়াকে কেটে কেটে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মুখ দিয়ে সত্য কথা বের না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত একাজ চলতে থাকবে"।

"মেজর!" ফয়জান ইগ্‌লু এই প্রথমবার তাকে নরম সুরে সম্বোধন করে বলল "যে সব শাস্তির ভয় তুমি আমাকে দেখাচ্ছো, এগুলোকে আমি মোটেও ভয় করি না। তোমার ধমকি ও ভীতি প্রদর্শনকে আমি একেবারেই পরোয়া করি না। আমার পরামর্শ হল, এ ধরনের কৌশলের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে একটা নতুন ও সুন্দর পরিবেশে কথা বলি যা আমার ও তোমার সকলের পক্ষে মঙ্গলজনক। তবে আমি তোমার সাথে কথা বলতে প্রস্তুত নই। কারণ, আমার কিছু জামানত ও নিশ্চয়তার দরকার রয়েছে, সেটা তোমার দ্বারা সম্ভব নয়।"

মেজর বুনাকোফের চতুর দৃষ্টি ফয়জানের চেহারার উপর স্থির ছিল। সে মিথ্যা বলছে কিনা, কিংবা ছলচাতুরীর আশ্রয় নিচ্ছে কিনা, তার কিছু আলামত ও হাবভাব খুঁজছিল সে ফয়জানের চেহারার মধ্যে। কিন্তু সে ইতোপূর্বে কখনো ফয়জান উগলুর মত ঘাঘু বন্দীর মুখোমুখী হয়নি।

এক-দু মিনিট পর্যন্ত মেজর অপলকদৃষ্টিতে তার দিকে ঘুরে ঘুরে দেখার পর যখন সে তার চেহারায় কোন ধরনের কপটতা, চালাকি কিংবা চতুরতার লক্ষণ মোটেও দেখতে পেল না বরং তার চেহারায় ছিল সরলতার সুস্পষ্ট ছাপ। তখন সে ফয়জান উগলুর প্রস্তাবে সাড়া দেয়ার ব্যাপারে ইতিবাচক চিন্তা ভাবনা করতে বাধ্য হল। কিছুক্ষণের মধ্যে সে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল।

"তুমি আমাদের সাথে সত্যিই সহযোগিতা করছো কিনা তার কি নিশ্চয়তা রয়েছে ?" বুনাকোফ ফয়জান উগলুর চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল।

"এটা দু পাক্ষিক চুক্তি, মেজর ! আর আমার ধারনা যে, তুমি এ ব্যাপারে আমাকে কোন সহযোগিতা করতে পারবে না।" ফয়জান শান্ত ও দ্বিধাহীন চিত্তে উত্তর দিল। তার কথায় সরলতার ছাপ ফুটে উঠছিল। সে খুবই সতর্কভাবে কেজিবি'র প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এই মেজরের সাথে গেম খেলছিল। কিন্তু সেই সতর্কতাভাব তার চেহারা দিয়ে ধরা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। তার এই কৃত্রিম সরলতার অভিনয় সফলতা বয়ে আনলো। সে আরেকবার কেজিবি'কে প্রতারিত করতে যাচ্ছিল।

"কিছু তো বলো" বুনাকোফ, আপ্রাণ চেষ্টা করে নিজের কণ্ঠকে স্বাভাবিক রেখে বলল।

"আমি কর্নেল শোলোখোভ ছাড়া আর কারোর সাথে এ ব্যাপারে কিছু বলতে প্রস্তুত নই।" ফয়জান চূড়ান্ত ও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জবাব দিল। মেজর বুনাকোফ ভ্যাবাচ্যাখা খেয়ে গেল। তার কাছে এই নতুন পরিস্থিতির তুলনায় আগের অবস্থাটাই ভাল ছিল, যখন ফয়জান উগ্‌লু মুখ খুলছিল না এবং নিজের দোষও স্বীকার করছিল না। যার ফলে তাকে মনমত শায়েস্তা করতে পেরেছিল।

কিন্তু ফয়জান অপ্রত্যাশিত ভাবে মেজর বুনাকোফের কোর্টে বল নিক্ষেপ করে তাকে একটা নতুন সমস্যার মধ্যে ফেলে দিল। এখন সে স্বয়ং নিজে যদি জোরপূর্বক এই কেস হ্যান্ডিল করার চেষ্টা করে তাহলে এরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, ফয়জান উগ্‌লু আবার পূর্বের ন্যায় অনমনীয় ভাব প্রকাশ করতে পারে। তার ফলে যেটুকু সফলতার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। যদি কর্নেল শোলোখোভ এই ব্যর্থতার কথা শুনতে পায় তাহলে তার ক্ষোভ ও কোপানল দৃষ্টিতে পড়ার পুরোপুরি ভয়ও রয়েছে।

তৃতীয় আরেকটি আশংকা তার সবচেয়ে বেশী দুশ্চিন্তার কারণ ছিল, তা হল এই যে, ফয়জান উগ্‌লু তাকে ডজ দিচ্ছে না তো আবার। সে পূর্বে তো এ ধরনের কিছু করেছিল।

মেজর বুনাকোফ ভাবল যে, সে সবধরনের জঞ্জাল ও দুশ্চিন্তা মুক্ত হতে পারে মাত্র একটা উপায়ে, তাহলো, ফয়জানের সব ব্যাপার স্যাপার কর্নেল

শোলোখোভের হাতে তুলে দেওয়া। এভাবে কমপক্ষে ভবিষ্যতে কোন অপ্রীতিকর কিংবা অস্বাভাবিক ও নেতিবাচক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তখন তার দায় দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত প্রমাণ করতে পারবে। তখন দোষটা এককভাবে শুধু তার ঘাড়ে চাপবে না। ফয়জান উগ্‌লুর প্রস্তাবকে এখানে উপস্থিত সব সিপাহীরা শুনে নিয়েছিল। তাদের মধ্য হতে হয়ত কেউ কর্নেল শোলোখোভ পর্যন্ত এই কথাগুলো পৌঁছে দিতে পারে। বুনাকোফ নিজে স্বয়ং কে,জি,বি'র মেজর। সে অবগত রয়েছে যে, প্রতিটি উচ্চপদস্থ অফিসার নিম্নপদস্থ অফিসারের ওপর নজরদারি করার জন্য তার পিছনে কোন না কোন চর অবশ্যই লাগিয়ে রাখে।

"ঠিক আছে, তুমি যা চাও তা-ই-হবে। ওকে নিয়ে যাও।" যারা ফয়জানকে এখান পর্যন্ত নিয়ে এসেছিল, তাদেরকে বুনাকোফ নির্দেশ দিল।

যখন ফয়জান উগ্‌লু স্বীয় প্রকোষ্ঠের দিকে যাচ্ছিল, তখন সে এই ভেবে মনে মনে আনন্দ পাচ্ছিল যে, কমপক্ষে কিছু দিনের জন্য হলেও মেজর বুনাকোফকে মানসিক টেনশনে জর্জরিত করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে ফয়জান হলরুম থেকে প্রস্থান করার পর পরই মেজর বুনাকোফ নিজের সামনে রাখা ইন্টারকমটি উঠিয়ে কর্নেল শোলোখোভকে সম্বোধন করে এ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে, সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবহিত করলো। তার মনে হল যেমন ভারী ওজনের একটা বস্তা তার মাথা হতে সরে গেছে। মোট কথা সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কর্নেলের কাছ থেকে নির্দেশ এলে বুনাকোফ বাবুর্চিখানার ইনচার্জের সাথে যোগাযোগ করল এবং নিজের দেহটা কুরসীর পিঠের সঙ্গে লাগিয়ে দিয়ে এবং মাথাটা চুলকাতে চুলকাতে আহমাদ তুরসুনকে ফায়জান উগ্‌লুর ব্যাপারে শোলোখোভের নতুন নির্দেশ জানিয়ে দিয়ে ইন্টারকমটি রেখে দিল।

খানিক পরেই আহমাদ তুরসুন মেজর বুনাকোফের বিশেষ নির্দেশ অনুযায়ী ফয়জানের জন্য কফি প্রস্তুত করে নিয়ে যাচ্ছিল। যখন সে ফয়জান উগ্‌লুর কাছে পৌঁছল, তখন উভয়ের ঠোঁটের নিম্ন দেশে ঈষৎ হাসি ছড়িয়ে পড়ছিল।

কফির মগটি এখনো শেষ হয়নি, কুঠুরীর পরিচালক তার জন্য দুটি অতিরিক্ত কম্বল নিয়ে এলো। আহমাদ তুরসুন চুপে চুপে ব্যথা উপশম হওয়ার দু'টি ট্যাবলেটও ফয়জান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছিল।

সুবহে সাদিকের সময় তার চোখ দু'টো নিকটেরই একটি কুঠুরী হতে আজানের শব্দে খুলে গেল। একজন সান্ত্রীকে আওয়াজ দিয়ে সে ওজুর পানি চাইল। কিছুক্ষণ পরেই সে মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে সেজদারত হয়ে নিজের পরিকল্পনা সফলতার জন্য কায়মনোবাক্যে দোয়া করছিল।

নামায সম্পন্ন হলে সাধারণত বন্দীদের হাত-মুখ ধৌত করা এবং পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজন মিটানোর জন্য এক একজন করে নিয়ে যাওয়া হত। আজ ফয়জান উগ্‌লুর জন্য বিশেষভাবে শুধু গোসল করারই অনুমতি ছিল না বরং তার জন্য প্রাইভেট কাপড়ের সুন্দর একটি জোড়াও বিদ্যমান ছিল। এমনকি তার বাজেয়াপ্তকৃত উলের পোশাকও তাকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। সে হাম্মামখানায় গোসলের কাজ সেরে কাপড় পরিধান করে যেইমাত্র বের হল, সেখানেই সে কয়েকজন সান্ত্রীকে দন্ডায়মান পেল । তাদের কর্নেল শোলোখোভ বিশেষ ভাবে পাঠিয়েছিল ফরজানকে নিয়ে যেতে। তারা তাকে কর্নেল শোলোখোভের কক্ষের দিকে নিয়ে গেল। কর্নেল শোলোখোভ একটি টেবিলে নাশ্‌তা সাজিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

"খোশ আমদেদ মিষ্টার ফায়জান।" কর্নেল ফয়জানকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে সামনের একটি কুরসীতে বসার জন্য ইংগিত করলেন। কামরায় এক কোণে মাত্র একজন সশস্ত্র সান্ত্রী বিদ্যমান ছিল। অবশিষ্ট সবাই কর্নেলের ইশারায় বাইরে চলে গেল।

"আপন বন্ধুদের জন্য রয়েছে আমাদের কাছে সীমাহীন ভালবাসা, মিস্টার উগলু"। কর্নেল এক মগ কফি নিজ হাতে প্রস্তুত করে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন।

"ধন্যবাদ, শুকরিয়া জনাব।" ফয়জান উগ্‌লু অত্যন্ত বিনয় ও নম্রভাব প্রদর্শন করে বলল।

"এসব মোল্লাদের কথায় কে আর কান দিবে! মিস্টার উগ্‌লু, আমরা তোমাদের শত্রু নই। আমরা স্বাধীন চেতা, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন

আফগানীদের বন্ধু। আমরা চাই আমাদের বন্ধুরা যেন উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করে। সেই বুর্জোয়া নীতি থেকে তারা পরিত্রাণ লাভ করে যা যুগ যুগ ধরে তাদের উপর এ দেশের মোল্লা ও খান সরদাররা চাপিয়ে দিয়েছিল। মোল্লারা ধর্ম ও খোদার নামে যেই পরাধীনতার জিঞ্জির এখানকার লোকদের গলায় পরিয়ে দিয়েছিল, আমরা সেই গোলামীর জিঞ্জিরকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করার জন্য এসেছি। যেন তারা আফিম সমতুল্য ধর্মের পরাধীনতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যায়। আমরা আফগানিস্তানের পাহাড় থেকে দুধের নহর বের করে দেব, যেন আমাদের মহান বন্ধুরা দুনিয়ার সব ধরনের নেয়ামত ভোগ করতে পারে। এ সবের বিনিময়ে আমরা চাই শুধু বন্ধুত্ব, নিবিড় সম্পর্ক "।

নাজানি তিনি আরো কত কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। ফয়জান উগ্‌লু তার বক্তৃতার ধারাকে ব্যাহত করে দিল এবং সে বলে উঠল ঃ

"কর্নেল, আপনার কথার উপর আমার পুরোপুরি বিশ্বাস রয়েছে। পরিতাপের বিষয়, আমি এসব মোল্লাদের কথায় প্রভাবিত হয়ে তাদের ফাঁদে পা বাড়িয়েছিলাম।"

অতঃপর সে বড় আশাভরা দৃষ্টি নিয়ে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ

"কর্নেল আমাকে কি পূনর্বার মস্কো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে ?"

"বাহ, বাহ, তুমি কি বলছো! আমাদের দরজা তো তোমাদের মত পথভোলাদের জন্য সদা সর্বদা উম্মুক্ত রয়েছে।" কর্নেল বললেন,

"নিঃসন্দেহে আপনারা আমাদের মহান বন্ধু, কর্নেল!" ফয়জান উগ্‌লু অত্যন্ত আবেগ ভরে বলল। মস্কো ইউনিভার্সিটির নাট্যমঞ্চে সে যে বিশেষ ফাংশনে মাঝে মাঝে অভিনয় করতো, আজ সেগুলো সত্যিকার ভাবে তার কাজে লাগছিল।

"নিজের পূর্বের জীবনকে ভুলে যেতে চেষ্টা করো।" কর্নেল বাহ্যিক ভাবে স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন।

"শুকরিয়া জনাব, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনার নির্দেশ আমার জন্য শিরোধার্য। আপনি আমার থেকে যতটুকু আশা করছেন, তার চেয়েও বেশী

বিশ্বস্ততার প্রমাণ আমি দেবো।" ফয়জানের কণ্ঠে যথেষ্ট জোশ ও আবেগ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল।

কর্নেল শোলোখোভ মুখ থেকে কিছু বলার পরিবর্তে শুধু জিজ্ঞাসাতুর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ক্ষান্ত করলেন।

"জি, হ্যাঁ, আমি মোল্লা মীরদাদ খান ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদেরকে গ্রেপ্তার করিয়ে দেবো।"

ফয়জান বাক্য অসম্পূর্ণ রেখে কিছুটা রোমাঞ্চ সৃষ্টি করতে চাইল। কর্ণেল শোলোখোভের চোখে মুখে বিস্ময় ও অনিশ্চয়তা ভাব সুস্পষ্ট হয়ে দেখা যাচ্ছিল। তিনি কিছুটা চঞ্চল হয়ে ফয়জানের দিকে তাকালেন।

"আজ রাতেই ....আজ রাতের ভিতরেই আমি তাদের ধরিয়ে দিতে চাই। আমি বলেছিলাম যে, আমি এমন কাজ দেখাবো যা আপনি আমার থেকে আশাও করেন না।"

ফয়জান উগ্‌লুর বক্তব্য কর্নেলের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলল। ফয়জান তার উপর পরিপূর্ণ আস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছিল। " লাইনের শুরু থেকে কথাগুলো আসবে যদি তুমি এই কাজটি করতে সক্ষম হও, তাহলে তুমি আগামী সপ্তার এই দিন থেকে মস্কোর রঙিন পরিবেশে তুমি তোমার জীবনের চরম স্বাদ ও আয়েশ পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করতে থাকবে।" কর্নেল তাকে দৃঢ় আশ্বাস দিয়ে বললেন।

"আমি একমাত্র আপনার কথাকেই বিশ্বাস করি, শুধু আপনার ওপরই আমার আস্থা রয়েছে। আফগান প্রশাসনের সাথে একটি কথাও বলতে চাই না আমি। আমার সম্পর্ক একমাত্র আপনার সঙ্গে।" ফয়জান আবেগ ভরা কণ্ঠে বলল।

"তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো কমরেড!" কর্নেল স্বীয় আসন থেকে ওঠে ফয়জানের সঙ্গে করমর্দন করার জন্য হাত প্রসারিত করে বললেন। ফয়জানও কুরসী থেকে ওঠে দাঁড়াল এবং বড় উষ্ণতার সাথে তার সঙ্গে করমর্দন করল।

কর্নেল শোলোখোভের চেহারা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, তিনি ফয়জান উগ্‌লুর কথায় যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি চোখের ইশারা দিয়ে সেখানে

উপস্থিত একমাত্র সান্ত্রীকেও বাইরে চলে যেতে বললেন। এখানে মাত্র এই পাহারাদারটিই বিদ্যমান ছিল, যে ছিল রাশিয়ান সেনা, পশতু ভাষা মোটেও বুঝত না, যেই ভাষা দিয়ে কর্নেল শোলোখোভ ও ফয়জান উগ্‌লু কথাবার্তা বলছিল। তথাপি কর্নেল শোলোখোভ কোন ধরনের আশংকার পথ খোলা রাখতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি চাচ্ছিলেন সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করতে। তিনি এ ব্যাপারটিও আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, ফয়জান উগ্‌লু এখানে সান্ত্রীর উপস্থিতিতে কিছুটা দ্বিধা-সংকোচের মধ্যে রয়েছে। সান্ত্রী কর্নেলের নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে বাইরে চলে গেল। খানিক পরে ফয়জান উগ্‌লু একটি কাগজে আকা-বাকা দাগ টেনে শোলোখোভকে কি কি বুঝাচ্ছিল। দুজনই আনুমানিক দু' ঘন্টা পর্যন্ত নকশাটি নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করল। অবশেষে তারা উভয়ে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছল।

"কর্নেল !" সিদ্ধান্তে পৌঁছার পর ফয়জান উগ্‌লু তাকে লক্ষ্য করে বলল

" আপনাকে কোন ধরনের পরামর্শ দেব, এই পর্যায়ের লোক আমি নই। আর আপনিও আমার পরামর্শ মত কাজ করবেন এটাও কোন জরুরী নয়। আমি আপনার কৌশলও জানতে আগ্রহী নই। তবে একটি সতর্কতার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।"

"সেটা আবার কি ?" কর্নেল অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলন।

"যদি আপনি হামলা করার পূর্বে সেখানে কমান্ডোদের লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন, তাহলে আমাদের সামান্যতম অসতর্কতার দরুন সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না যে, ওই সবমোল্লারা কত সতর্ক ও হুশিয়ার ! এই এলাকার প্রতিটি আনাচ কানাচ, উঁচু-নিচু সম্পর্কে তারা পুরোপুরি জ্ঞাত রয়েছে এবং সব জায়গার প্রতি রয়েছে তাদের সজাগ দৃষ্টি। যদি একবার আমীর মোল্লা মীরদাদ খান হাত ছাড়া হয়ে যায়, তাহলে কাবুলের সমগ্র সেনা মিলেও তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারবে না।"

ফয়জান তার শেষ স্নায়ু হাতিয়ারটিও পরীক্ষা করল। নিশানা জায়গা মতো গিয়ে লাগল।

কর্নেল গভীর দৃষ্টিতে ফয়জানের মুখের দিকে তাকালেন। সেখানে তিনি গাম্ভীর্যতা ছাড়া আর কিছুই পেলেন না।

"তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো মিস্টার ফয়জান উগ্‌লু!"

"আমার মতে, অপারেশনটা যদি রাতের বেলায় হয়, তাহলে সেটা হবে কার্যকর ও সর্বোত্তম।" ফয়জান পরামর্শ স্বরূপ বলল।

"ঠিক আছে। আপাতত তুমি সেখানেই অবস্থান করবে, যেখানে তোমাকে পাঠাচ্ছি। তোমাকে কেউই কিছু জিজ্ঞেস করবে না। যদি কেউ কোন প্রশ্ন করে তাহলে তুমি তাকে আচ্ছামত শাসিয়ে দেবে। আমি ছাড়া কারো সামনে তুমি জবাবদিহী করার পাবন্দ নও।" এ বলে কর্নেল শোলোখোভ ওঠে দাঁড়ালেন এবং তিনি স্বয়ং ফয়জানকে সেই আরামদায়ক কক্ষ পর্যন্ত ছাড়তে এলেন, যেখানে তাকে রাত দশটা পর্যন্ত অতিবাহিত করতে হবে।

।।৪।।

অপারেশন রুমে ইসফানদিয়ার খান, কর্নেল শোলোখোভ এবং আরো চার পাঁচজন অফিসার উপস্থিত রয়েছেন। সামনের দেয়ালে সেই নকশাটি টাঙ্গানো রয়েছে যাতে ফয়জান উগ্‌লুর টার্গেট করা জায়গা এবং সেখানে পৌঁছার পথের চিত্র অংকন করা রয়েছে। তারা অভিযান চালানোর জন্য রাতের সময়টিই বেছে নিয়েছিলেন। কারণ, ফয়জান উগ্‌লুর তথ্য মোতাবেক দিনের বেলায় সেখানে কিছুই থাকে না। সে তাদের একথাটিও বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, সন্ত্রাসীরা একমাত্র তাকে দেখলে সামনে আসতে পারে। যদি তাড়াহুড়া করে আক্রমণ করা হয়, কিংবা আক্রমণকারীরা ধৈর্যহীনতার পরিচয় দেয়, তাহলে হয়ত বাজি পাল্টে যেতে পারে এবং সব পরিকল্পনা গোল্লায় যেতে পারে।

"একটি কথা আমার মনে তোলপাড় খাচ্ছে, তাহলো এই যে, ফয়জান উগ্‌লু আমাদের যে পথ দিয়ে নিতে চাচ্ছে, সেখানে তো আমরা অনেক কমান্ডো লুকিয়ে রাখতে পারি। সেই অঞ্চলটি এমন নয় যে, আমরা গেরিলাদের ঘেরাও করে কাবু করতে পারবো। যদি গেরিলাদের ওপর সরাসরি কোন আক্রমণ চালানো হয়, তাহলে এতে বেসামরিক লোকদের

ক্ষয়-ক্ষতি হওয়ার অনেক আশংকা রয়েছে। বিমান হামলার তো কোন অবকাশই নেই।" একজন অফিসার থেমে থেমে বলতে লাগল।

"তুমি কি বলতে চাচ্ছে?" শোলোখোভ চমকে উঠলেন।

"স্যার, আমার আশংকা হচ্ছে যে, আমাদের সাথে প্রতারণা করা হচ্ছে না তো আবার? ওই জায়গাটিতে আমাদের সেনারা শত্রুদের ঘেরাও-এর কবলে পড়ে গেলে, সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে বেঁচে আসাটা তাদের পক্ষে খুবই মুশকিল ব্যাপার হবে।" সেই অফিসারটি নিজের সংশয় ব্যক্ত করে বলল।

তার কথায় শোলোখোভ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেলেন। কিন্তু ইসফানদিয়ার খান জোরদার অট্টহাসি লাগিয়ে বলতে লাগলেনঃ

"বেকুব! সন্ত্রাসীরা কি কখনো উন্মুক্ত সড়কে কাঁধের উপর রাইফেল সাজিয়ে ঘুরাফেরা করে? তাদের ঠিকানা-ই তো হচ্ছে পাহাড়, জঙ্গলের কোন দুর্গম ও বন্ধুর এলাকা।" অফিসারটির মুখ থেকে কোন প্রত্যুত্তর বের হল না।

"তাদের কাছ থেকে কোন রিপোর্ট এসেছে?" কর্নেল শোলোখোভ কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরাতে চাইলেন। তিনি নেতিবাচক ফলাফলের কল্পনাও করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

"এখনো তো কোন রিপোর্ট আসেনি। আমাদের লোকেরা ওখানে ছড়িয়ে পড়ছে।" ইসফানদিয়ার জবাবে বললেন।

নতুন কোন বিষয় নিয়ে আলাপ হওয়ার পূর্বেই আচানক অপারেশন রুমের ইমারজেন্সী রিসিভার হতে আওয়াজ ভেসে আসল "জরুরী বার্তা, জরুরী বার্তা।"

ইসফানদিয়ার সামনে অগ্রসর হয়ে একটি রেডিও সেটের কাছে রাখা চুঙ্গা মুখের সাথে লাগিয়ে নিলেন।

"ডাইরেক্টর অন দি লাইন" সে কাউকে সম্বোধন করে বলল।

"স্যার, কন্ট্রোল রুমের সাথে কথা বলুন।" অন্য দিক থেকে উত্তর এলো। সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রোল রুমের সাথে যোগাযোগ হয়ে গেল। এবার ইমারজেন্সী রিসিভার থেকে আওয়াজ ভেসে আসল ঃ

"স্যার, এডভান্স পার্টির রিপোর্ট হচ্ছে যে, সেখানে শত্রুদের কিছুটা সন্দেহমূলক আনাগুনা দেখা গেছে। পরিস্থিতির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে।"

কন্ট্রোল রুম থেকে রিতিমত বার্তাটি ভেসে আসছিল।

"আউট" বলে ডাইরেক্টর ইসফানদিয়ার সুইচ অফ করে দিলেন এবং শব্দ আসা বন্ধ হয়ে গেল।

সাথে সাথেই ইসফানদিয়ারের অট্টহাসিতে অপারেশন রুমটা যেন গম্‌গম করে উঠল। কর্নেল শোলোখোভের টান টান স্নায়ুটাও ঢিলা হয়ে পড়ল। ইসফানদিয়ার সেই অফিসারটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন, যে কিছুক্ষণ পূর্বে নিজের আশংকা ব্যক্ত করেছিল।

"এখন তোমার মতামত কি ?" তাকে বেশ লজ্জিত দেখা যাচ্ছিল, তার মুখ থেকে কোন কথা ফুটলো না।

অপারেশন রুমে সদ্য যে সংবাদটি এলো, তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ফয়জান উগ্‌লু তাদের ধোঁকা দিচ্ছে না। সে যেই প্লান তাদের দিয়েছে, তার মধ্যে বাস্তবতা ও সত্যতা রয়েছে।

গোয়েন্দা ডাইরেক্টর ইসফানদিয়ার কর্নেল শোলোখোভের দিকে এমন ভাবে তাকালে, যেমন এসব কৃতিত্বের দাবীদার একমাত্র তিনি একাই। তিনি পুনরায় এডভান্স পার্টির (অগ্রগামী দলের) সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। তাদের পূর্বে ওই এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল যেখানে অপারেশন হবে, যেন তারা সেখানকার পুরো অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সে সম্পর্কে অপারেশন কমিটিকে সংবাদ পরিবেশন করে।

"খাদ"-এর ডাইরেক্টর অগ্রগামী দলকে নির্দেশ দিলেন পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখতে এবং এও নির্দেশ দিলেন যেন তারা কন্ট্রোল রুমের পরিবর্তে সরাসরি তাদের কাছেই রিপোর্ট পৌছায়।

তারা বর্তমানে এই রুমটিকে নিজেদের অপারেশনের জন্য ইমার্জেন্সী হেড কোয়ার্টারে রূপান্তরিত করে ফেলেছিলেন। এখান থেকে তারা খুব সহজেই সব স্থানে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারতেন। "মিত্র শক্তি" আসার পর কেজিবি'র তত্ত্বাবধানে এ রুমটিকে অত্যাধুনিক ধারায় দাঁড় করানো হয়েছিল। এখন এখান থেকে কোন নির্দেশ জারি হওয়ার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে তা সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে পৌছে যেত। "ইমারজেন্সী নির্দেশ" পালনের জন্য ছিল বিভিন্ন জায়গায় প্রস্তুত বাহিনী (Stand by),

যারা একমাত্র 'খাদ'-এর তৎপরতা চালানোর জন্য ছিল নির্ধারিত। শোলোখোভের কাছে "উগ্‌লু প্লানের" পক্ষে একটি দলিলও অনাকাঙ্খিত নেয়ামতের চেয়ে কম ছিল না। এখন তিনি অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন এবং নিজেকে নির্ঝঞ্ঝাট ভাবতে লাগলেন। বাস্তব সত্য এই যে, অফিসারটির থেকে যে সংশয় ব্যক্ত করা হয়েছিল, কর্নেল সেই ব্যাপার নিয়ে দীর্ঘ এক ঘন্টা ধরে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। তার মস্তিষ্কের মধ্যেও কিছুটা সন্দেহের দানা বেঁধে উঠেছিল। কিন্তু না জানি কেন তিনি নিজের সেই সংশয়কে এসব লোকে সামনে ব্যক্ত করতে চাচ্ছিলেন না।

খাদ (খেদমতে এত্তেলাআ'তে দৌলতী 'রাষ্ট্রীয় তথ্য সেবা')-এর হেড কোয়ার্টারে তাৎক্ষণিক ভাবে আফগানী কমান্ডোদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করা হল, যার কমান্ডার নিয়োগ করা হল একজন রাশিয়ান মেজরকে। কমান্ডোদের মধ্য হতে একজন হাবিলদারকে যে নিশানাবাজিতে ছিল সবচেয়ে বেশী পটু এবং এ ব্যাপারে তার ছিল অনেক সুনাম, যার টার্গেট কখনো লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না, কর্নেল তাকে পৃথকভাবে নিয়ে নির্দেশ দিলেন ঃ

"তোমার একমাত্র কাজ হচ্ছে ফয়জানের উপর নজর রাখা। সে যদি পালাতে চেষ্টা করে তা হলে তাকে গুলি মেরে উড়িয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।"

॥ ৫ ॥

সকাল থেকেই অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল। ঠান্ডার প্রকোপটা আগের তুলনায় কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। খাদ-এর অফিসাররা আশা করছিলেন যে, আতংকবাদীরা এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে নিজেদের আস্তানা থেকে বের হবে না।

অনেক ভেবে চিন্তে স্থির করা হল যে, সূর্য ডোবার পরপরই অপারেশন শুরু করা হবে। প্রথমে গভীর রাতে হামলা করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। কিন্তু শোলোখোভ ছিলেন কেজিবি'র কর্নেল। তিনি প্লানের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ব্যাপারকেও অগ্রাহ্য করতে পারেন না। তার পক্ষ থেকে সব ধরনের সাবধানতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছিল। তিনি একা শানদার ও পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তুত করলেন যে, তার উপর আঙ্গুল উঠানোর কোন অবকাশই নেই এবং শত্রুরাও যাতে সন্দেহ পোষণ না করতে পারে তার প্রতিও ছিল তার সজাগ দৃষ্টি।

তিনি অবগত ছিলেন যে, কারফিউ চলাকালীন সময়ে ওই দিকে কোন যানবাহন যাতায়াত করলে সন্ত্রাসবাদীরা টের পেয়ে যাবে যে, এটা অবশ্যই সরকারী গাড়ী এবং এ গাড়ীতে যারা আরোহণ করেছে তারা নিঃন্দেহে সরকারী সেনা হবে। আর তিনি গেরিলাদের কোন সুযোগ দিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। এ কারণেই তিনি "এডভান্স পার্টির" চারজন জোয়ান ছাড়া অন্য কেউকে সেদিকে পা বাড়াতে কড়া ভাবে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কর্নেল শোলোখোভ সেই অঞ্চলের দিকে যে সব প্রাইভেট কোম্পানীর বাস চলাচল করে, তারই একটি বাস সংগ্রহ করেছিল। তার পরিকল্পনা হল, সেই বাসে করে কমান্ডোদের সিভিল পোশাক পরিয়ে অপারেশনের এলাকার দিকে রওয়ানা করিয়ে দেবেন। বাস যাত্রা করার জন্য সেই সময়টি বেছে নেওয়া হল, যে সময় ঐ কোম্পানীর একটি বাস বাস্তবিক পক্ষে সেখান দিয়ে অতিক্রম করে জালালাবাদ চলে যায়। তার ধারণা, তিনি পরিকল্পনার মধ্যে কোন ধরনের খুঁত রাখেনি।

ঐ বাস এবং কমান্ডো যাতে মুজাহিদ গেরিলাদের দৃষ্টিগোচর না হয়, সে জন্য অগ্রগামী দলটি একটি ভিন্ন গোপন পথও অনুসন্ধান করে রেখেছিল। এডভান্স পার্টি স্থানীয় লোকদের বেশ ধারন করে পর্যবেক্ষণ করার পর সমস্ত পরিস্থিতি যাচাই করে যে রিপোর্ট প্রস্তুত করেছিল, তারই ওপর ভিত্তি করে তারা নিজেদের একটা কর্মপন্থা তৈরী করল।

বাসটি 'খাদ'-এর কেল্লা সদৃশ কার্যালয়ের আঙ্গিনায় দাঁড়ানো ছিল। বাসের ছাদের উভয় সাইডে ভারী মেশিনগান ফিট করে এমন ভাবে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল যে, সেগুলো দৃষ্টিগোচর হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এসব মেশিনগানের সাথে সাথে বেশ কিছু কমান্ডোকে শুইয়ে দিয়ে তার উপর ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। তাদের কাজ ছিল, প্রয়োজন পড়লে তারা মেশিন গান চালাবে। বাহ্যিক ভাবে দেখলে মনে হবে যে, বাসের ভিতরে যে সব যাত্রী রয়েছে, তাদেরই আসবাবপত্র ছাদে রয়েছে। কাবুল থেকে জালালাবাদে যে সব বাস চলাচল করে, সেগুলোর ছাদে রাখা মাল-পত্রকে সাধারণত ত্রিপল দিয়ে এমন ভাবে ঢেকে বেঁধে দেওয়া হয়ে থাকে। বিশেষ করে যে মৌসুমে হালকা হালকা বৃষ্টি বর্ষণ হয়, তখন অবশ্যই এরূপ করা হয়।

বাসের ভিতরের কমান্ডোরা নিজ নিজ আসনের মধ্যখানে অস্ত্র রেখে তারা সবাই চাদর দিয়ে নিজেদের গা ঢেকে রেখেছিল। যদি কেউ জানালার বড় বড় গ্লাস দিয়ে ভিতরে উকি মেরেও দেখে, তবুও ভিতরে যে অস্ত্র রয়েছে তা বুঝবার মোটেও উপায় নেই।

দু-তিন ঘন্টা পূর্ব থেকেই কমান্ডোরা মুজাহিদ গেরিলাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করার জন্য মহড়া করছিল। তখন সূর্য অস্তমিত হয়েছে মাত্র পনের-বিশ মিনিট হবে। কর্নেল শোলোখোভ কমান্ডোদের সামনে হাজির হলেন। তারা কর্নেল শোলোখোভের সামনে শেষবারের মত শানদার মহড়া প্রদর্শন করলো। কর্নেল শোলোখোভ তাদের সামরিক নৈপুন্য দেখে আশ্বস্ত হলেন এবং সবাইকে বাহবা দিলেন। তিনি এ অপারেশনের কমান্ডার মেজর শুশকিনকে ডেকে কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করলেন। অতঃপর তিনি ফয়জান উগ্‌লুকে কিছু বুঝালেন। তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের শানদার স্বপ্ন পুনরায় তাকে দেখানো হল এবং তিনি তাকে আশ্বস্ত করে সান্ত্বনা দিলেন যে, তার ভয়ের কোন কারণ নেই। তার জান সম্পূর্ণ নিরাপদ। এ বলে কর্নেল ফয়জানকে বাসে আরোহণ করালেন। যে হাবিলদারের দায়িত্ব ছিল ফয়জানের উপর দৃষ্টি রাখা, সে তখনই ফয়জানের সঙ্গে গা লাগিয়ে বাসে বসে গেল। তাকে পরিকল্পিত ভাবেই ফয়জানের সঙ্গে বসানো হয়েছিল।

।।৬।।

আহমাদ তুরসুন বাস ছাড়ার দৃশ্যটি স্বীয় ব্লকের বেলকনীতে দাঁড়িয়ে দেখল। বাসের চাকা ঘুরার কিছু পূর্বে সে বেলকনী থেকে নীচে নেমে এসেছিল। অপারেশনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি সে স্বচক্ষে দেখে নিয়েছিল। সে সানাইয়ের কক্ষের দিকে পা বাড়ালো।

"স্যার, আজ কি বেশী সময়ের জন্য আমাকে ছুটি দিতে পারেন?" সে খুবই কাকুতি মিনতি কণ্ঠে তার কাছে আর্জি পেশ করলো।

"না-- ।" আহমাদের দিকে সানাই না দেখেই উত্তর দিল।

"স্যার, আমার বাবা অধীর হয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাকে মাত্র দেড় ঘন্টার জন্য ছুটি দিন, যাতে আমি তার সাথে ... ।"

"আমি বললাম তো ছুটি দেওয়া যাবে না।" সানাই এবার খুব ঝাঁঝাঁলো কণ্ঠে জবাব দিল।

"ঠিক আছে, স্যার, আপনার নির্দেশই শিরোধার্য।" বলে আহমাদ তুরসুন সেখান থেকে প্রস্থান করলো। কি বিড়বিড় করতে করতে সে নিজ কক্ষের দিকে যাচ্ছিল। তার সঙ্গীরা তার ও সানাই-এর মধ্যকার গরমিলের কথা ভাল ভাবেই জানতো। আহমাদ তুরসুনের হাবভাব দেখে তারা সবকিছুই বুঝে ফেললো। তাদের সকলের ঠোঁটের কোণে হাসি খেলে গেল। সানাই ইচ্ছে করলে আহমাদ তুরসুনকে অবশ্যই ছুটি দিতে পারতো। কারণ, আহমাদ তুরসুন কোন ইমার্জেন্সী ডিউটিতে ছিল না।

আহমাদ তুরসুন নিজের টেবিলে রাখা টেলিফোনটি ওঠালো এবং তার বাবার নম্বর ঘুরালো।

"হ্যালো, আব্বাজান, খালেদ হয়ত আমার অপেক্ষা করছে, তাকে বলুন, কিছুক্ষণ পর কাবুল-গজনী ট্রান্সপোর্টের যে বাসটি ছেড়ে যাচ্ছে, তাতে বসে সে যেন চলে যায়। আমি আজতো দুরের কথা, এক হপ্তা পর্যন্তও কোন ছুটি পাচ্ছি না।"

আহমদের কথা শুনে সেখানে উপস্থিত তার বন্ধুরা হো হো করে হেসে উঠল।

খাদ-এর টেলিফোন এক্সচেঞ্জে বসা অপারেটরও না হেসে পারল না। তার পুরো ব্যাপারটিই বুঝে আসলো। এখানে চাকুরী করে, প্রতিটি ব্যক্তিই ছুটিকে সৃষ্টিকর্তার একটা মহা উপহার হিসেবে গণ্য করে থাকে। এখানে এমন ভাগ্যবান লোক পাওয়া দুস্কর হবে, যে সপ্তার মধ্যে একদিনের ছুটিতে ঘরে যেতে পারছে। যখন থেকে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে, তারা প্রত্যেক নিজেকে এখানকার চার দেওয়ালের বন্দীরূপে ভাবতে শুরু করেছে। পুরো দিনটিতে একমাত্র মধ্যাহ্ন ভোজের সময় এক ঘন্টার জন্য তারা কিছুটা অবকাশ পেয়ে থাকে । ঐ সময় তারা অফিস থেকে বাইরে বেরিয়ে উন্মুক্ত পরিবেশে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। নতুবা বেচারারাতো সারা দিন এখানে নিজ নিজ কামরায় বসে প্রহর গুণতে থাকে।

খাদে খানের কাছে দুপুর থেকে আহমাদ তুরসুনের একজন বন্ধু জালালাবাদ থেকে এসে বসাছিল। আহমাদ তুরসুন পূর্ব থেকেই তার বাবাকে

জানিয়ে রেখেছিল যে, আজ সন্ধ্যায় খালেদ নামক বন্ধুটি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবে। ঠিক এমনি মুহূর্তে হঠাৎ তার ফোন এসে গেল।

খাদেখান ছেলের উপর খুব রাগান্বিত হচ্ছিল যে, সে জালালাবাদ থেকে আগত তার বন্ধুর কুশল জিজ্ঞেস করতেও ভুলে গেছে। সে ছেলের এই বেপরোয়া আচরণে আশ্চর্য না হয়ে পারল না। এ ব্যাপারটি তাদের পাঠানী ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল যে, মেহমান এসেছে, অথচ মেহমানের কুশলাদী জিজ্ঞেস করবে না! ছেলের এহেন ব্যবহারে তার বেজায় গোশ্বা হচ্ছিল। সে মনে মনে ভাবছিল যে, ছেলেটার কি হল যে, আজ কাল সরকারের চাকুরী করে নিজেদের ঐতিহ্য এবং কৃষ্টি-কালচারও ভুলতে বসেছে।

খাদে খান আহমাদ তুরসুনের বন্ধুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল এবং বলল ঃ "বেটা, ক্ষমা করবে, মনে কিছু নেবে না। আহমাদ তুরসুন তো ছুটি না পাওয়ার কারণে আসতে পারছে না। তবে সে তোমাকে একটি পয়গাম দিয়েছে তাহলো এই যে, যেই ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর বাসগুলো এখান থেকে গজনী এবং এরপর জালালাবাদ যাতায়াত করে থাকে, সেই কোম্পানীর বাসে চড়ে সে তোমাকে চলে যেতে বলেছে।"

"কোন অসুবিধা নেই --। আসলে কি, সরকারী চাকুরীটাই হচ্ছে মন্দ জিনিস।" খালেদ কিছুটা আক্ষেপ প্রকাশ করে বলল।

"হ্যাঁ, বেটা, তুমি ঠিকই বলেছো। কিন্তু আমার এই নালায়েক ছেলেটাকে বুঝায় কে .... !" খাদে খান বলল।

"আচ্ছা, চাচা, এখনতো আমাকে উঠতে হচ্ছে। দেরী হলে যদি বাস না পাই, তাহলে ভীষণ বেকায়দায় পড়তে পারি। কারফিউ লাগার সময়ও প্রায় কাছে।" খালেদ উঠতে উঠতে বলল।

"না, বেটা, এটাতো হয় না। তুমি আমার সঙ্গে বাড়ী চলো। সেখানে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে তারপর যেয়ো। এভাবে যাওয়াটা ঠিক হয় না।" খাদে খান তার কাঁধের উপর হাত রেখে তাকে বসার জন্য বলল।

"না, চাচা, আবার কখনো বেড়াবো। আহমাদ আমার ব্যাপারে ভাল করেই জানে যে, আমাকে রাতেই ফিরে যেতে হবে। ওখানেও অনেক অসুবিধা হতে পারে। সে জন্যই সে চলে যেতে বলেছে। আপনি মনে কোন

কষ্ট নেবেন না। আহমাদ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।" খালেদ বৃদ্ধ খাদেখানকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল।

"আপনি অনুমতি দিলে, আমি আমার জনৈক বন্ধুকে একটি ফোন করতে পারি কি ?"

"অবশ্যই, অবশ্যই।" খ্বাদে খান তার দিকে টেলিফোন সেট বাড়িয়ে দিয়ে বলল।

খালেদ একটি নম্বর মিলিয়ে জনৈক বন্ধুকে তার আগমণ ও রওয়ানা হওয়ার কথা জানিয়ে দিল এবং তাকে বলল যে, সে কাবুল-গজনী ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর বাসে জালালাবাদ যাচ্ছে। ফোন করা শেষ হলে সে উঠে দাঁড়াল। সে বাস ষ্ট্যান্ডের দিকে পা বাড়ালো। অনেক বারণ করা সত্ত্বেও খাদে খান তাকে বাসে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য তার সঙ্গে চলল।

তারা দু-আড়াইশ গজ চলার পর বাস ষ্ট্যান্ডের একেবারে কাছাকাছি পৌছে গেল। কি মনে করে হঠাৎ আহমাদ তুরসুনের সেই দোস্তটি খাদে খানকে বলল ঃ

"চাচা! আমাকে তো একটি প্রয়োজনীয় কাজে ঐ বাজারটিতে যেতে হচ্ছে। আপনি চলে যান। আমি ওখানে কাজ সেরে একাই বাসে চড়ে চলে যাবো। ধন্যবাদ, মনে কিছু নেবেন না।" এই বলে গেরিলা মুজাহিদীনের চর খালেদ খাদেখান থেকে জান বাঁচিয়ে একদিকে উধাও হয়ে গেল।

।।৭।।

"আল হামদুলিল্লাহ।" পয়গাম শ্রবণ করেই অনিচ্ছাকৃতভাবে মোল্লা মীরদাদ খানের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো।" আল্লাহতায়ালা অনুগ্রহ করেছেন। ফয়জান উগ্‌লু যে পরিকল্পনা করেছিল, তা সফলতার দিকে এগুচ্ছে। এজন্য আমরা মহান রব্বুল আলামীনের হাজার হাজার শোকর আদায় করছি।"

"আল হামদুলিল্লাহ।" তার কাছে বসা মুজাহিদীনও এক জবান হয়ে উচু কণ্ঠে বলল।

জীবন্ত পাহাড়ের সন্তান

"কাসেম খান! মুজাহিদ সাথীদেরকে সতর্ক করে দাও, তাদেরকে প্রস্তুত হতে বল। আজ আল্লাহ পাক আমাদের শত্রুদের সঙ্গে রাজধানী কাবুলে সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করার সুযোগ দান করেছেন। এটাকে তোমরা সৌভাগ্য মনে করো। ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ আমাদের অবশ্যই সাহায্য করবেন। অবশ্যই আমরা বিজয়ী হবো। যেহেতু আমরা আল্লাহর দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে জেহাদ করছি।" আমীর মোল্লা মীরদাদখান কাসেম ঈশান জাদাকে লক্ষ্য করে বললেন।

"হে আমাদের আমীর! নিশ্চয়ই আপনার কথামত কাজ হবে।" কাসেম ঈশানজাদা বললো।

সংক্ষিপ্ত দোয়ার পর বৈঠকটি সমাপ্ত হল। তারা যেখানে বসা ছিল সেই স্থানটি হচ্ছে রাজধানী কাবুলের দীর্ঘ পর্বতমালা ঘেষে যে অত্যাধুনিক জনবসতি গড়ে উঠেছে, সেখানকারই একটি গুপ্ত জায়গা। ওখানেই রয়েছে কাবুলের বড় বড় রঈস এবং সরকারী কর্মকর্তাদের আবাস স্থল। সাধারণ নাগরিকরা ঐ এলাকার ধারে কাছেও যেতে সাহস পায় না।

ঐ মডার্ণ এলাকার একটি বাড়ীর ভূতল কক্ষে রাখা ট্রান্সমিটারের সাহায্যে কাসেম ঈশানজাদা গেরিলা মুজাহিদীনদের কাছে তাদের নেতার নতুন পয়গামটি পৌঁছে দিল। কাসেমের পর তার সঙ্গীরা এক এক করে সেই ভূগর্ভস্থ কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়ল। আনুমানিক এক ঘন্টার মধ্যে তারা নিজ নিজ স্থানে পৌঁছে গেল। তারা ঐ বাড়িটিতে আসা-যাওয়ার জন্য এমন একটি পথ বেছে নিয়েছিল যে, সে ব্যাপারে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।

যেখান থেকে পর্বতশ্রেণী শুরু হয়েছে, সেখান হতে আনুমানিক দু-আড়াইশ গজ দুর থেকে গেরিলারা আত্মরক্ষা ব্যূহ তৈরী করতে লেগে গেল। তারা সকলেই বুঝেছিল যে, আজ তাদের এক অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর কৃতিত্ব প্রদর্শন করাতে হবে। আফগানিস্তানের সবচেয়ে বৃহত্তম শহরে দখলদার রাশিয়ান সেনাদের কেন্দ্রে সরকারী শক্তির প্রাণ কেন্দ্রে বসে তাদের এই বেদ্বীন ও নাস্তিক সরকারের সাথে টক্কর লাগাতে হবে। ভিনদেশী স্বঘোষিত মনিবদের জানিয়ে দিতে হবে যে, পাহাড়ের সন্তানরা মুক্ত পরিবেশের বাসিন্দা। তাদের অভিধানে পরাধীনতা বলতে কোন শব্দ নেই। তারা স্বাধীন

হয়ে জন্ম গ্রহণ করে এবং স্বাধীন ভাবে জীবিত থাকতে অভ্যস্ত। পরাধীনতার জীবন থেকে তারা আত্মমর্যাদা নিয়ে মরণ বরণ করাকে সর্বাবস্থায় প্রাধান্য দিয়ে থাকে। স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, বীরত্ব, বাহাদুরী, দুঃসাহসিকতা, দেশবিজয়, দেশ চালনা, কোরবানী ও আত্মত্যাগ তাদের রগে-রন্ধ্রে মিশে আছে। তারা মাথা নত করা শিখেনি। তারা আকাশচুম্বী পাহাড়ের ন্যায় চিরউন্নত এবং দুর্ভেদ্য পর্বতের মত তাদের অন্তরটাও হচ্ছে দৃঢ়। তাদের বিশ্বাস হল যে, পাহাড়ও যেমন অটল, আফগানীরাও তেমন অটল। পাহাড়কে যেমন ধ্বংস করা যায় না, ঠিক তদ্রুপ আফগানীদেরও কেউ বিনাশ করতে সক্ষম হবে না।

।।৮।।

কাবুল-গজনী ট্রান্সপোর্টের বাসটি কমান্ডোদের স্বীয় গর্ভে ধারন করে খুবই দ্রুত গতিতে আপন মনজিলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। মেজর শুশকিন বাসের সামনের আসনে বসে সতর্কভাবে বাইরের সড়কের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল। গুড়ো গুড়ো বৃষ্টি বর্ষণের পর এখন কুয়াশা ছড়িয়ে পড়ছিল। বাসের তীব্র লাইট এবং তার মাথায় বাঁধা সার্চ লাইটের রশ্মি সত্ত্বেও তারা খুব কষ্টে পনের থেকে বিশ গজ দুর পর্যন্ত দেখতে সক্ষম হচ্ছিল।

ধীরে ধীরে কুয়াশা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে চলছিল। শীতের প্রচন্ড লহর রাজধানী কাবুলকে স্বীয় আঁচলের ভিতর ঢেকে নিচ্ছিল। বাসটি ছিল এয়ারকন্ডিশন্ড সিস্টেম। তার হিটার পুরোদমে চলছিল। তা সত্ত্বেও মেজর শুশকিনের মনে হচ্ছিল যেন ঠান্ডা তার হাঁড়কে বিদীর্ণ করে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। মেজর গভীর উদ্বিগ্ন হচ্ছিল এই ভেবে যে, যখন বাস হতে বের হয়ে তারা মুক্ত পরিবেশে যাবে, তখন তারা কিভাবে বরফে আচ্ছাদিত হিম শীতল বাতাসের মোকাবেলা করবে! ফয়জান উগ্‌লুও অন্যান্য যাত্রীদের ন্যায় ভাবনার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল। তবে সে মনে মনে কতবার যে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করল, তার ইয়ত্তা নেই। সে এই ভেবে তৃপ্তি পাচ্ছিল যে, তার মুজাহিদীন সাথীরা তার কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করেছিল, সে তা পূরণ করে যাচ্ছিল। এ ব্যাপারে তার কোনই দুশ্চিন্তা ছিল না যে, তারা যদি

মুজাহিদীনদের ঘেরাও কবলে পড়ে তখন তার নিজের অবস্থা কি দাঁড়াবে! তার তো একমাত্র আনন্দের বিষয় এটাই ছিল যে, সে রাশিয়ান ও আফগান নাস্তিক কমান্ডোদের যে স্থানে নিয়ে যাচ্ছে, সেখান থেকে তাদের মধ্য হতে কেউ জীবিত ফিরে আসতে পারবে কিনা, তার একশ ভাগের এক ভাগেরও সম্ভাবনা ছিল না। সে যে বিষয়টা নিয়ে চিন্তিত ছিল তাহলো এই যে, তার কিছু মুজাহিদ সাথী হয়ত এ লড়াইতে নিহত হবে। যাই হোক না কেন, অবশেষে তারা তো হচ্ছে সকলে আফগানী। তারা দ্বীন ও ঈমানের খাতিরে যে কোন কোরবানী দিতে ছিল সদা প্রস্তুত।

বাসটি এখন পর্বত মালার একেবারে কাছাকাছি এসে পৌঁছে গিয়েছিল। প্রথম থেকে নির্ধারিত একটি স্থানে এসে বাসটি থেমে গেল। মেজর শুশকিন কমান্ডোদের বাস থেকে বের হতে বলল। সে কর্নেল শোলোখোভের নির্দেশ মোতাবেক কুয়াশাচ্ছন্ন পাহাড়ের কোল ঘেষে কমান্ডোদের ঐ দিকে অগ্রসর হওয়ার হুকুম দিল, যেদিকে ফয়জান উগ্‌লুর বর্ণনানুসারে সন্ত্রাসী লুকিয়ে আছে। এখন পজিশন কিছু এরূপ ছিল যে, ফয়জান খালি হাতে অস্ত্রবিহীন ছিল সবার আগে আগে। মেজর শুশকিন ও দুজন হাবিলদার ছিল তার পিছনে পিছনে। আর এই তিনজনের পিছনে আসছিল পুরো কমান্ডো বাহিনী। তারা এমন ভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল যে, দূর থেকে ফয়জান উগ্‌লু ছাড়া অন্য কাউকে যেন দেখা না যায় এবং সন্ত্রাসবাদীরা ভাবে যে, ফয়জান উগ্‌লু একাই তাদের দিকে আসছে। পথটি ছিল খুবই বিপজ্জনক এবং এবড়ো থেবড়ো। তারা পাহাড়ের উঁচু-নীচু পথ দিয়ে কমান্ডো পজিশনে লাফ মেরে মেরে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল।

আচমকা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। মেজর শুশকিনের মনে হল যেমন চলতে চলতে ফয়জান উগ্‌লুর পা ফঁসকে গেছে। সাথে সাথেই ফয়জান গড়াতে গড়াতে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নীচে, গভীরে পড়ে যেতে লাগল। মেজর শুশকিন ছিল অত্যন্ত সাহসী লোক। সে নির্ভয়ে ও কোন ধরনের দ্বিধা ছাড়া নিজের লম্বা কোট-এর পকেট থেকে টর্চলাইট বের করল এবং সে ইচ্ছা করলো টর্চের আলোর সাহায্যে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে। সে যেই মাত্র টর্চ জ্বালালো, ওমনি তার বক্ষে একটি গুলি এসে আঘাত করল। তার মুখ

থেকে একটি "আহ" শব্দ বের হল এবং সে উলোট খেয়ে পাহাড়ের গভীর খাদে পড়ে গেল। টর্চটিও তার হাত থেকে ছিটকে গিয়ে পাহাড়ের ঢালুতে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

।।৯।।

কাসেম ঈশান জাদা নিজ রাইফেলের সাথে ফিট করা ইনফ্রারেড গ্লাস (দূরবীণ) দিয়ে নিজের ছুড়া গুলিটি লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত হেনেছে দেখে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করলো এবং পরবর্তী শিকারের অপেক্ষা করতে লাগল।

হাবিলদারটি গুলির শব্দ শুনেই একদিকে লাফ দিল। তার সঙ্গী কমান্ডোরা মেজরকে এভাবে শেষ হতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে "আলোক গুলি" ফায়ার করতে লাগল। সাথে সাথে ঠর্‌র্‌র্ ঠর্‌র্‌র্ করে এলোপাথাড়ী ফায়ারিং শুরু হয়ে গেল। তবে তাদের গুলিগুলো গেরিলাদের আঘাত হানার পরিবর্তে পাহাড়ের গায়েই লাগছিল। রৌশনী-গুলি ফায়ারের কারণে রজনীটি দিনের ন্যায় আলোকিত হয়ে গেল। আতংকবাদীদের কোনই খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। তাদের কি জমিন খেয়ে ফেলেছে, নাকি আসমান নিজের ক্রোড়ে লুকিয়ে রেখেছে ! উল্টো তাদের উপর দিয়েই বয়ে যাচ্ছিল কেয়ামতের আযাব । মুজাহিদীনরা তাক করে তাদেরকে নিশানা বানাচ্ছিল। কিন্তু কে বা কারা, কোনদিক থেকে গুলি করছে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না বে-দ্বীন নাস্তিক কমন্ডোরা। ঘটনা দেখে মনে হচ্ছিল যেমন এটা কোন যুদ্ধই নয়, বরং নিশানাবাজির খেলা চলছে।

।।১০।।

কর্নেল শোলোখোভ এবং ডাইরেক্টর ইসফানদিয়ার অপারেশন রুমে বসে ব্যাকুল হয়ে কোন সুসংবাদ শুনার অপেক্ষায় ছিলেন। আচানক রেডিও সেটে প্রাণ সঞ্চার হল ঃ

"কমান্ড------ কমান্ড----- আওয়ার ----।" সেট হতে উচ্চ শব্দে ভেসে আসছিল।

ইসফানদিয়ার উৎফুল্ল হৃদয়ে কাছেই রাখা মাউথটি তাড়াতাড়ি উঠিয়ে নিলেন। সুইচ টিপ দিয়ে তিনি যোগাযোগ বহাল করলেন। রেডিও থেকে ভেসে আসছিল ঃ

"কমান্ড এ্যাটেনডিংগ ইউ ------- আওয়ার।

স্যার, আমরা মারাত্মক ঘেরাও কবলে পড়ে গেছি। আমাদের উপর প্রচন্ড ফায়ারিং হচ্ছে। কারা ফায়ার করছে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমরা মারত্মক ক্ষতির সম্মুখীন, আওয়ার-------আওয়ার------- আওয়ার------। " রেডিও'র মধ্যে সুস্পষ্টভাবে ফায়ারিং -এর আওয়াজ ভেসে আসছিল।

কর্নেল শোলোখোভের মনে হল যেন হঠাৎ কেউ তাকে মৃত্যুদন্ডাদেশ শুনিয়ে দিয়েছে। তিনি টলতে টলতে কোন রকমভাবে সেট পর্যন্ত পৌঁছলেন। তার হাত-পা কাঁপছিল।

"কি বক বক করছো---- আওয়ার----- আওয়ার বলে।" ইসাফানদিয়ার ক্রোধের সাথে চিৎকার দিয়ে বললেন।

"স্যার হেল্প্-----" গুলির শব্দ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

ইসফানদিয়ার খানের ইন্দ্রীয় শক্তি এখানো ছিল সজাগ। তিনি তাড়াতাড়ি অন্যত্র যোগাযোগ স্থাপন করলেন ঃ

"কন্ট্রোল------ কন্ট্রোল, আমাকে এখ্খুনি বাগরামের লাইন দাও।" ইসফানদিয়ার দ্রুতগতিতে বলতে লাগলেন।

"স্যার বাগরাম কথা বলুন।" আনুমানিক আধা মিনিট পর কন্ট্রোল থেকে আওয়াজ ভেসে এলো।

ইসফানদিয়ার খান সঙ্গে সঙ্গে কাছের টেলিফোন রিসিভারটা ওঠালেন।

"হ্যালো---লাইনে কে আছে?" তিনি অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"এ্যাডজোটেন্ট" উত্তর আসল।

আমাকে এখ্খুনি কমান্ডিং অফিসারের সাথে কথা বলাও, আমি খাদ ডাইরেক্টর ইসফানদিয়ার বল্ছি।"

"ওকে, স্যার।"

দ্বিতীয় মুহূর্তেই একজন রাশিয়ান কর্নেল লাইনে ছিল।

ইসফানদিয়ার তাকে বললেন ঃ“এখ্খুনি বিলম্ব না করে কোহেছাফীর দিকে গানশীপ হেলিকপ্টার পাঠিয়ে দাও।”

“স্যার, এত ঘন কুয়াশার মধ্যে এটা কিভাবে সম্ভব ? ” রাশিয়ান কর্নেলের উচ্চ কণ্ঠ ভেসে এলো।

কর্নেল শোলোখোভ ঝট্ করে ইসফানদিয়ার খানের হাত থেকে ফোনটা নিয়ে নিলেন। তিনি রুশ ভাষায় নিজের পরিচয় দিয়ে তাকে কড়াভাবে ধমক প্রদান করলেন এবং কোন বিলম্ব না করে এখ্খুনি নির্দেশ পালন করার জন্য বললেন।

খানিকের মধ্যে বাগরাম এয়ার পোর্ট থেকে একটি গানশীপ হেলিকপ্টার এবং কোহেছাফীর কাছাকাছি এলাকা থেকে “ষ্ট্যান্ডটু” সেনাদের একটি চৌকস বাহিনী দ্রুতগতিতে কোহে ছাফীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, যেখানে কমান্ডোদের সংখ্যা এক এক করে কমে যাচ্ছিল।

।। ১১ ।।

কমান্ডোদের একশ গুলির জবাবে গেরিলা মুজাহিদীনদের পক্ষ থেকে দশটি ফায়ার হচ্ছিল। বাসের ছাদে যেসব কমান্ডো আত্মরক্ষাব্যুহ বানিয়ে প্রস্তুত পজিশনে ছিল, তারা যখন ফায়ারিং এর শব্দ শুনতে পেল, তখন তারা ছাদে ফিট করা হেভী মেশিনগান দিয়ে ডা....... ডা....... ডা..... ডা...... করে এলোপাথাড়ী গুলি বর্ষণ করতে লাগলো। তাদেরও বুঝে আসছিল না যে, তাদের লক্ষ্যবস্তু কোন দিকে। তাদের অনুমানভিত্তিক তৎপরতা তাদের পক্ষে অকল্পণীয় ক্ষতি বয়ে আনলো। এখনো পর্যন্ত বাসটির প্রতি মুজাহিদীনের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়নি। কারণ, বাসটি এমনভাবেই রাখা হয়েছিল। যখনি বাসের ছাদ থেকে ফায়ারিং শুরু হয়ে গেল, মুজাহিদীন সে দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। ছাদের কমান্ডোরা এক ধ্যানে ফায়ার করে যাচ্ছিল। তারা বুঝতেই পারল না যে, কিভাবে তাদের শিয়রে এত আকস্মিকভাবে কেয়ামত এসে পড়লো! পর পর তিনটা শক্তিশালী হ্যান্ড গ্রেনেড ঠিক তাদের মধ্যখানে এসে বিস্ফোরিত হলো। ফলে বাস সহ তাদের দেহগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে এদিক-সেদিক ছিটকে পড়ল।

যদি তারা রৌশনী গুলি ফায়ার না করতো তা হলে এ ঘন কুয়াশার মধ্যে তাদের পশ্চাদপসরনের সম্ভাবনা অনেকটা উজ্জল ছিল। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য মহা বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। এসব কমান্ডোদের সকলেই ছিল রুশ সেনাদের ট্রেনিংপ্রাপ্ত। তাদের অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে যুদ্ধ এবং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল। বর্তমানে এখানে তারা যেই প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন, তাতে তারা যদিও বিচলিত হচ্ছিল না, কিন্তু তবুও তাদের কিছুই বুঝে আসছিল না যে, তারা কি করবে ?

যেদিক থেকে মাত্র একটিগুলিও আসছিল সেদিকে তারা শত শতগুলি বৃষ্টির মত বর্ষণ করে যাচ্ছিল। কিন্তু ফলাফল ছিল জিরো। তাদের আর কিছু তো বুঝে এলো না, এখন তারা ফায়ারিং করতে করতে একদিকে পিছপা হতে লাগল, যেন নিজেদেরকে পাহাড়ের আড়ালে কিছুটা নিরাপদ বানাতে পারে।

কাসেম ঈশানজাদা নিজ রাইফেলে লাগানো দূরবীণ দিয়ে ফয়জান উগ্‌লুকে দেখেছিল। মনে হয় পড়ে যাওয়ার কারণে সে অনেক চোট পেয়েছে। কারণ, তার ওঠে দাঁড়াতে বেজায় কষ্ট হচ্ছিল।। কাসেম চাইলো, যেখানে ব্যাংকার বানিয়ে সে যুদ্ধ করছে, সেই টিলাটি চক্কর কেটে ফয়জান উগ্‌লু পর্যন্ত পৌঁছতে, যাতে ফয়জানকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছার ব্যাপারে সাহায্য করা যায়।

আচানক সে থমকে গেল। সে একজন লোককে স্টেনগান দোলাতে দোলাতে লাফ দিয়ে ফয়জানের দিকে অগ্রসর হতে দেখল। ঐ ব্যক্তিটি টিলার উঁচু-নিচু স্থান লাফিয়ে মাড়িয়ে ঠিক সেদিকেই অগ্রসর হচ্ছিল, যে দিকে ফয়জান পতিত হয়েছিল।

হাবিলদার পতিত হয়ে পুনরায় ওঠে দাঁড়াতে বেশ তাড়াহুড়া প্রদর্শন করলো। সে ভাল করেই জানতো যে, কর্নেল শোলোখোভ ফয়জানকে গুলি মারার ডিউটি তারই জিম্মায় লাগিয়েছেন। যদি কর্নেল সকাল বেলায় এসকল লাশের মধ্যে ফয়জানের মৃতদেহটি না পায়, তাহলে নিশ্চিত কথা যে, তিনি স্বয়ং হাবিলদারকেই হত্যা করবেন। সে কমান্ডো পজিশনে সে দিকে দৌড়াচ্ছিল, যে দিকে তার অনুমান মোতাবেক ফয়জান উগ্‌লুর হওয়া উচিৎ।

শীঘ্র সে একটি পাথরের কাছে একটা আবছা আবছা ছায়া দেখতে পেল।

এটা ফয়জান ছাড়া আর কে হতে পারে?

হাবিলদার ঠিক তখনি স্টেনগান সোজা করল ফয়জানকে লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করার জন্য। কিন্তু, এখনো পর্যন্ত তার আঙ্গুলটা ট্রিগার পর্যন্ত পৌছেনি যে, আচমকা একটি গুলি এসে তার মস্তকের ভিতর আঘাত করল। আর ওমনি সে একদিকে কাত হয়ে ভুপাতিত হল।

।। ১২।।

কাসেম ঈশানজাদা এবং ফয়জান উগ্‌লু এক সঙ্গেই গানশীপ হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনতে পেল। সাথে সাথেই তারা উত্তর পূর্ব দিক থেকে এক ঝাঁক আলো তাদের দিকে বাড়তে দেখল। হেলিকপ্টারের তীব্র সার্চলাইট তার পাখার নীচে জ্বালানো ছিল। সেখানে মেশিনগানের নলগুলোও সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ফয়জান উগ্‌লু ইচ্ছা করেই পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু গড়িয়ে পড়ার কারণে শরীরের অনেক জায়গায় মারাত্মক যখম হয়ে যায়। চোটের কারণে পাঁজরের হাড়ে ব্যথার দরুন তার পুরো শরীরে ঝিম মেরে ওঠল। সে বেহাল হয়ে ওখানকার একটি পাথরের সাথে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। এরপর সে নিজের পিছনে গুলি চলার সাথে সাথে কারোর পতন হওয়ার শব্দ শুনলো। পতিত ব্যক্তিটি ছিল সেই হাবিলদার। হেলিকপ্টারের আওয়াজে সে চমকে ওঠলো। তার হারানো শক্তি যেন আবার পুনরায় তার শরীরে ফিরে এলো। সে ওঠে দাঁড়ালো এবং টিলার পিছনে বানানো যে মডার্ন আবাসিক এলাকা রয়েছে, সে দিকে সে দৌড়াতে লাগল। সেই এলাকাটি এখান থেকে আনুমানিক আড়াইশ-তিনশগজ দুরে অবস্থিত।

ফয়জান উগ্‌লু পাগলের মত দৌড়াচ্ছিল। সে তার পিছনে গানশীপের মেশিনগানের ফায়ারের আওয়াজও ভালমত শুনতে পাচ্ছিল। আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবানীই বলতে হবে যে, সে এখনো হেলিকপ্টারের সার্চ আলোর কবলে পড়েনি এবং তার দিকে কমান্ডোও বিদ্যমান ছিল না। ধীরে ধীরে সে সড়ক দেখতে পেল। অতঃপর হঠাৎ কেমন মন হল, জমিন যেন তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে ফেলেছে। সড়কের উভয় পার্শ্বে আলোর তুফান সে ভাল

করেই দেখতে পেল। আসলে সেগুলো ছিলো সরকারী সেনা। তারা অবরুদ্ধ কমান্ডোদের উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসছিল। ফয়জান উগ্‌লু দিক্ পাল্টালো। সে সড়কের দিকে না গিয়ে জনবসতির দিকে দৌড় মারল। তার অন্তর স্বাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, সে সেখানে অবশ্যই কোন না কোন আশ্রয়স্থল খুঁজে পাবে। কারণ, এ ব্যাপারটি চাক্ষুসভাবে দেখা গেছে যে, আফগান জনগনের অন্তর রয়েছে গেরিলা মুজাহিদীনের পক্ষে এবং মুখ মিত্র শক্তির পক্ষে।

সে দৌড়তে দৌড়তে হাপাতে লাগল। দম ছাড়তে তার কষ্ট হচ্ছিল। কার্ফিউর সময় হয়ে গেছে। একারণে পুরো এলাকাটি জনমানব শূণ্য হয়ে পড়েছিল। তার পিছন দিকে এখন খুব জোরে শোরে ফায়ারিংয়ের আওয়াজ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যে, সাহায্যের জন্য আগত সেনারাও পজিশন নিয়ে নিয়েছে। ফয়জান কোন না কোন ভাবে ওঠে পড়ে দৌড়তে দৌড়তে জনবসতির শেষ প্রান্তের বাড়িটি পর্যন্ত পৌছে গেল। বাড়িটি ছিল ছিমছাম ও আধুনিক মডেলের বানানো।

ব্যথায় অস্থির, বেহাল ফয়জান বাড়িটির চার দেয়ালের গেইটের কপাটে হাত দিয়ে আঘাত করল। কপাটটি আপ্‌সে খুলে গেল। আশপাশের বাড়ীগুলোর লাইট ছিল নিভানো। প্রায় সব জায়গায় বিরাজ করছিল অন্ধকার।

ফায়ারিংও বিস্ফোরণের শব্দ এখানেও শুনা যাচ্ছিল। এসব ব্যাপার নিয়ে এখানকার লোকেরা তেমন মাথা ঘামায় না। কারণ তাদের কাছে এটা একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। তবে আজকের ব্যাপারটি কেমন যেন বেশী সঙ্গীন মনে হচ্ছিল তাদের কাছে। আর সে জন্যই লোকজন নিজ নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে ভিতরে অবস্থান করছিল।

ফয়জান বাড়িটির আঙ্গিনা অতিক্রম করে ঘরের দরজায় মৃদু শব্দে খট খট করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের লাইটগুলো জ্বলে উঠল এবং দরজা খোলার শব্দও এলো। ফয়জানের দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি লোপ পেয়ে গিয়েছিল। দরজাখুলতেই সে সামনে অগ্রসর হল এবং ভারসাম্য হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। হঠাৎ কে যেন তার কোমরের উপর জোরদার লাথি বসিয়ে দিল। সে ব্যথায় কুঁকিয়ে ওঠল।

"হ্যান্ডস আপ" শব্দটি শুনে সে যখন ওঠে বসল, তখন সে পিছন ফিরে দেখল যে, মেজর উরখান তার দিকে পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে।

ফয়জান উগ্‌লু লাথির আঘাতে সামনে পাতা খাটটির সাথে মারাত্মক ভাবে টক্কর খেল। এখন সে খাটের সাথে পিঠ লাগিয়ে জোর আসন করে বসে অসহায় ভাবে নিজের খারাপ কিসমত নিয়ে পর্যালোচনা করছিল যে, যে ব্যক্তি তাকে প্লাজা হোটেল থেকে গ্রেফতার করে খাদের হেড কোয়ার্টার পর্যন্ত পৌছে দিয়েছিল, এখন সে ব্যক্তি তাকে পুনরায় খাদের হেড কোয়ার্টারে পৌছিয়ে দেয়ার জন্য তার সামনে উপস্থিত।

"খাদ"-এর হেড কোয়ার্টার --যেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিল একটি যন্ত্রনাদায়ক মৃত্যু!

আচমকা উরখানের পিছনের দরজাটি ধপাস্‌ করে খুলে গেল। সাথে সাথে একটি নারী কণ্ঠ ভেসে এলো ঃ

"পিস্তল ফেলে দিন। আপনি আমার গুলির আওতায় রয়েছেন।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফয়জান উগ্‌লুর দৃষ্টি সে দিকে ওঠে এলো। বাদামী রঙের চোখ এবং দীর্ঘ কেশ ওয়ালা ইয়াসমীন নাইট ড্রেসে উরখানের পশ্চাতে রিভলবার হাতে দণ্ডায়মান ছিল।

"ইয়াসমীন! তুমি!" মেজর উরখানের কণ্ঠে চরম বিস্ময়।

"ইয়াসমীন!" ফয়জানের মুখ থেকেও স্বতস্ফুর্তভাবে বেরিয়ে এলো। মনে হচ্ছিল, যেন সে স্বপ্নের ঘোরে বিড়বিড় করছে। তার চোখে ছিল চরম বিস্ময় ভাব।

লাল তুফান

হ্যাঁ, আমি ইয়াসমীনই, ফয়জান!

ইয়াসমীনের কণ্ঠ ছিল শান্ত এবং মনে হচ্ছিল যেন তার আওয়াজটা কোন গভীর কূপ থেকে ভেসে আসছে। "ফয়জান! আমি জানতাম, আমার বাবা তোমাকে ধরার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।"

"আমার জন্য তোমার বাবা একাই তো যথেষ্ট ছিলেন।" ফয়জান তার কথা কেটে মেজর উর খানের দিকে ইশারা করে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে বলল।

"তুমি আমাকে ভুল বুঝছো, ফয়জান! এই পিস্তলটি আমি আমার বাবার প্রতিই তাক করেছিলাম, তোমার প্রতি নয়। হয়ত অন্য লোকের ন্যায় তোমারও বিশ্বাস হবে না, ফয়জান! আমি এখন আর সেই ইয়াসমীন নেই, যে তোমার সঙ্গে মস্কোর একটি ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করতো।" ইয়াসমীন দৃঢ় কণ্ঠে বলল।

ইয়াসমীনের কথা শুনে সত্যিই সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। ফয়জান সকল ব্যথা ও অবসাদ ভুলে গেল। তার অতীত জীবনের অনেক স্মৃতি এক এক করে মনে পড়তে লাগল।

প্রথম বার যখন সে ইয়াসমীনের সঙ্গে কলেজের সিঁড়িতে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে তাদের উভয়ের হাতের বইগুলো ছিটকে বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়ে গিয়েছিল, তখন সে বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত বিষন্ন ও অস্থির অবস্থায় কাটায়।

সে দিনই কলেজের ক্যান্টিনে বসে তার জনৈক বন্ধু হেসে তাকে লক্ষ্য করে বলল ঃ

"এই মেয়েটির সাক্ষাৎ সব সময় কোন না কোন চঞ্চলতাকে জন্ম দেয়।"

ফয়জান ঈষৎ হেসে তার কথাটি উড়িয়ে দিল। কিন্তু ইয়াসমীনের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার ফলে তার মনের মধ্যে যে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, তা উড়িয়ে দেয়া বাস্তবিক পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে জালালাবাদ থেকে এখানে

এসেছে শিক্ষা গ্রহণ করতে। সে খুব তাড়াতাড়িই বুঝে ফেললো যে, কাবুল ও জালালাবাদের পরিবেশের মধ্যে রয়েছে জমিন-আসমান তফাৎ। প্রগতি ও আধুনিকতার নামে এখানে এমন এমন কামনা, খায়েশ, নগ্নতা ও ফ্যাশন চালু হয়ে গেছে যে, আল্লাহ্! তওবা!

সে জীবনে কখনো এ কথাটি কল্পনাও করেনি যে, কোন আফগানী ইসলামের নিদর্শন এবং রীতি-নীতিকে উপহাসও করতে পারে। কিন্তু এখানে পদে পদে ইসলামের নিদর্শন ও কৃষ্টি-কালচারকে শুধু কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ করা হচ্ছিল না, বরং যারা এ ধরনের দুঃসাহসিকতা দেখাচ্ছিল, তাদের সব ধরনের উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছিল। তাদের পুরস্কৃত করা হচ্ছিল বিভিন্ন উপায়ে। সে যখন কাবুলে এলো, তখন শুরুতে তার বুঝেই আসেনি যে, সে কি আফগানিস্তানের কোন শহরে রয়েছে, না ইউরোপে এসে গেছে?

ছাত্রদের সংগঠন "মাহাযে ইসলামী"কে প্রতিহত করার জন্য "পরচম" এবং "খালক" পার্টির কমিউনিস্টরা সরাসরি ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে পড়েছিল। ফয়জান উগ্‌লুর সহানুভূতি ও সমর্থন নিঃসন্দেহে মাহাযে ইসলামীর প্রতি ছিল। কিন্তু সে কখনো সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িত হয়নি।

ফয়জান উগ্‌লুর সঙ্গে ইয়াসমীনের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ ঐ সময় হল, যখন ইয়াসমীন কমিউনিজম আদর্শে অনুপ্রাণিত ছাত্রদের একটি গ্রুপের নেতৃত্ব দিতে সে স্থানে ঢুকে পড়ল, যেখানে ইসলাম পছন্দ ছাত্র সংগঠন মাহাযে ইসলামীর একটি জলসা হচ্ছিল। ফয়জান এই জলসায় এসেছিল শুধু বক্তৃতা শুনার জন্য। তার কোন পলিটিক্যাল উদ্দেশ্য ছিল না। সে জন্যই যখন হাঙ্গামা, মারপিট শুরু হয়ে গেল, তখন সে চুপে চুপে সেখান থেকে বের হয়ে গেল।

ইয়াসমীনের নজরও তার উপর পড়ল। দুজনেরই নজর বিনিময় হল। ইয়াসমীন যখন তার ভীত বিহ্বল চেহারাখানা দেখল, তখন তার মুখে হাসি খেলে গেল। তার হাসিটি ফয়জানের কাছে অত্যন্ত ভারী মনে হল। সে মুখে কিছুই বলতে পারল না। তার মনে হল যেন ইয়াসমীন তাকে উপহাস করছে।

রাতের বেলায় যখন সে হোস্টেলে এসে নিজের খাটে শুইল, তখন কেন যেন ঘুম তার চোখ থেকে হাজার মাইল দূরে চলে গিয়েছিল। একটি অকল্পনীয় ব্যাকুলতা তার মনকে তোলপাড় করে যাচ্ছিল। সে কয়েকবার

ভাবল যে, আমি ইয়াসমীনের ব্যাপারে কেন মাথা ঘামাচ্ছি? আমার সঙ্গে তার কিইবা সম্পর্ক রয়েছে? সে নিজের অবস্থা দেখে বেশ বিব্রত বোধ করল। নিজেকে নিয়ে সে অনেক পেরেশান হয়ে গেল। ফয়জান অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইল। অবশেষে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন যখন সে কলেজ গ্রাউন্ডের এক কোণে একটি পাথরের বেঞ্চে বসা ছিল, তখনও তার মাথায় ইয়াসমীনই সওয়ার ছিল। হঠাৎ যেন অলৌকিক ঘটনাই ঘটে গেল। ফয়জান ঘুর্ণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি যে, কখন থেকে ইয়াসমীন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

"হ্যালো কমরেড!" ফয়জনের কানে ইয়াসমীনের কণ্ঠ ভেসে আসলো এবং কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে তার দিকে ঘুরে তাকালো।

ইয়াসমীনের হঠাৎ আগমণ, তার দ্বিধাহীন কণ্ঠ ও সংকোচহীন মনোভাব ফয়জানকে নাড়া দিল। সে বুঝে উঠতে পারলো না যে, তার উত্তরটা কিভাবে দেবে। কিছু বুঝার আগেই তার মুখ থেকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বেরিয়ে এলো। ইয়াসমীন সালাম শুনে খামোখা হো হো করে হেসে উঠল। তার হাবভাবে কিছুটা ইয়ার্কির আভাস।

"আপনি এখানে একা বসে আছেন দেখে ভাবলাম, আপনার একটু কুশলাদি জিজ্ঞেস করি" ইয়াসমীন ফয়জানের চেহারার উপর তার ভাসাভাসা চোখ দুটো রাখলো। ফয়জানের কানের পর্দা শা শা করছিল।

ফয়জানের হৃদয়টা এত জোরে জোরে স্পন্দিত হচ্ছিল, মনে হল যেন এখনি বুকের পাঁজর ভেদ করে সেটা বেরিয়ে পড়বে। সে ভাবতে লাগল, ইয়াসমীন কেন তার কুশলাদী জানতে এসেছে? এখনোতো তাদের সরাসরি সাক্ষাৎ হয়নি। তারা কখনো এক সঙ্গে বসে আলাপ করেনি! শুধু একবার ঘটনাচক্রে ধাক্কা লেগেছিল।

অতঃপর সে চিন্তা করতে লাগল, হতে পারে, যে আগুনে সে জ্বলছে ইয়াসমীনও সে আগুনের ইন্ধনে পরিণত হয়েছে।

ঐ সময় ফয়জানের বোধশক্তি এতটুকু পাকাপোক্ত হয়ে সারেনি যে, সে এ ব্যাপারটিকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে। সে হচ্ছে সোজা সরল একজন পাঠান যুবক ও আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী মুসলমান, সে এর চেয়ে আর বেশী

কিছু নয়। কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল যে, তার মজবুত ও শক্ত দেহটার কারণে তার প্রতি ঐ সব লোকের মারাত্মক আকর্ষণ ছিল, যাদের সঙ্গে ইয়াসমীনের যোগাযোগ ছিল। তারা নিজেদের জন্য যে কোন মূল্যে ফয়জান উগ্‌লুর সহযোগিতা কামনা করছিল। তাকে তাদের দলে পাওয়ার জন্য প্রয়োজন বোধে ইয়াসমীনের মত শত শত যুবতীদেরও তারা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল। ইয়াসমীন বেশ সময় ধরে ফয়জান উগ্‌লুর সঙ্গে বসে কাটালো। ফয়জান ধীরে ধীরে তার সঙ্গে ফ্রি হতে চেষ্টা করলো। ইয়াসমীনও মন উদার করে তার সঙ্গে কথা-বার্তা চালিয়ে যাচ্ছিল। আলাপ কালে এক পর্যায়ে ফয়জান উগ্‌লু বলে ফেলল ইয়াসমীনকে, কলেজের সিঁড়িতে তার সঙ্গে টক্কর খাওয়ার পর থেকেই সে তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

ফয়জান ছিল একজন সাদাসিধে পাঠান যুবক। সে অনুভব করছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার নিজের ভিতরগত অবস্থার কথা ইয়াসমীনকে না বলবে, তার মনে স্বস্তি ফিরে আসবে না। ইয়াসমীন ফয়জানের এই "দুর্বল" দিকটাকে একটা মহা সুযোগ ও নিজের জন্য "বোনাস" ভাবতে লাগল।

"আপনাকে এ ভাবে ছাত্র রাজনীতিতে অংশ নেওয়া উচিৎ নয়।" সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে ইয়াসমীনকে লক্ষ্য করে বলল। এ কথাটি বলতে গিয়ে তার আওয়াজটি কাঁপছিল।

ইয়াসমীন তার ভীত বিহ্বল কণ্ঠ শুনে হো হো করে হেসে দিল। "তুমিও ধীরে ধীরে সব কিছুই বুঝে ফেলতে সক্ষম হবে, ফয়জান! আরো কিছুদিন যাক না!" এই বলে ইয়াসমীন ফয়জানের এত কাছ ঘেষে ঝুকে পড়ল যে, ফয়জান নিজেকে হারিয়ে ফেলতে লাগল। ইয়াসমীনের শরীরের স্পর্শে তার জ্ঞান লোপ পাওয়ার উপক্রম হল।

"এ সব মোল্লারা খুবই ভয়ানক লোক। আমাদের দেশের জন্য এরা ক্যান্সার সমতুল্য। এমন ক্যান্সার, যে ধীরে ধীরে আমাদের দেশ, আমাদের জাতির শিকড়কে দুর্বল করে দিচ্ছে। আমাদের ভিত্তি প্রাচীরে মরীচিকা লাগার পূর্বেই এই ক্যান্সারকে কেটে দুরে নিক্ষপ করার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের সবাইকে এক যোগে এ জন্য কাজ করতে হবে। এসো, চলো, কেন্টিনে গিয়ে বসি।" ইয়াসমীন ফয়জানের কাঁধের উপর হাত রেখে বলল। ফয়জান

সম্মোহিত ব্যক্তির মত ওঠে ইয়াসমীনের সাথে সাথে চলতে লাগল। কেন্টিনে বসা ছাত্র-ছাত্রীরা অবাক হয়ে গেল। তারা ইয়াসমীনের এই "নতুন শিকার"কে দেখতে লাগল। তাদের ঠোঁটের কোনে মিটিমিটি হাসি ছড়িয়ে পড়ছিল।

।।২।।

এ ধরনের কয়েকটি সাক্ষাতের পর সে ইয়াসমীনের প্রেমে গ্রেফতার হয়ে গেল। ইয়াসমীনকে তার প্রগতিশীল বন্ধুরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জানালো যে, সে একজন "প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লা"কে তাদের মতাদর্শে আনতে পেরেছে বলে। একদিন ফয়জান সংবাদ পেল যে, তার উত্তম কৃতিত্বের জন্য মস্কো ভার্সিটিতে পড়ার জন্য বৃত্তিপ্রাপ্ত নির্বাচিত ছাত্রদের মধ্যে তাকেও শামিল করা হয়েছে।

এ খবর পেয়ে সে আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে উদাস হয়ে গেল এই ভেবে যে, ইয়াসমীন ছাড়া সে এতদিন কি ভাবে কাটাবে!!"

কিন্তু সে সময় তার বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রইল না, যখন ইয়াসমীন তার রুমে এসে আশার বাণী শুনালো যে, ঐ কোর্স কম্পিলিট করার জন্য তাকেও নির্বাচিত করা হয়েছে। ফয়জানের বাবা ছেলের আগ্রহ দেখে তাকে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন। নতুবা তিনি ভাল করেই জানতেন যে, তার ছেলেকে তারই ব্যবসা চালাতে হবে।

তবুও তিনি যখন শুনতে পেলেন যে, ফয়জান উচ্চ শিক্ষার জন্য রাশিয়া যাচ্ছে, তখন তিনি গভীর দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। তার মন মোটেও সায় দিচ্ছিল না যে, তার ছেলে কোন বিধর্মী দেশে গিয়ে পড়া-শুনা করুক। তবে ফয়জানের প্রতি তার একটা আত্মবিশ্বাস ছিল। তিনি ছেলেকে যে তরবিয়াত দিয়েছিলেন, সে কারণে ছেলের প্রতি তার গভীর আস্থা ছিল। আজ পর্যন্ত তিনি ছেলেকে যা বলেছেন, সে তা অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিয়েছে। কিন্তু উদ্বেগের ব্যাপার ছিল যে, ছেলে বর্তমানে তার থেকে পৃথক থেকে কাবুল কলেজে অধ্যয়ন করছিল। ভয়ের কারণ ছিল এখানেই। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে, তথাকথিত আধুনিকবাদীরা আধুনিকতা ও প্রগতির নামে সামাজিক ব্যবস্থা

পরিবর্তন করতে চাচ্ছে, যেটা আফগান মিল্লাতের সঙ্গে মোটেও খাপ খায় না। বিশেষ করে রাশিয়ান উপদেষ্টা ও সেনাবাহিনীর আগমনের পর, যারা নিজেদের সঙ্গে নাস্তিক্যবাদের ওপর লেখা ব্যাপক লিফলেট, বই ও ম্যাগজিন নিয়ে এসেছে, তাদের প্রচেষ্টা দিন দিন তীব্রতর হচ্ছে, যাতে আফগান সমাজকে ধর্মহীনতা, নগ্নতা ও সভ্যতার নামে দ্রুত গতিতে অশ্লীলতার দিকে ধাবিত করা যায়। তাদের প্রচেষ্টাও ফলপ্রসূ হচ্ছে। আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর তার প্রভাবটা পড়ছে ব্যাপকভাবে। এ কারণেই ফয়জানের বাবা ছেলের ব্যাপারে ছিলেন বেশ উদ্বিগ্ন। তিনি যখন শুনতে পেলেন যে, ফয়জান পড়াশুনার জন্য মস্কো যাচ্ছে, তিনি কাবুল ছুটে এলেন ফয়জানের সঙ্গে দেখা করতে। কথায় কথায় তিনি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন যে, সে ওখানে কি শিখতে যাচ্ছে। ফয়জান তার ধর্মভীরু বাবার উৎকণ্ঠা ও ভয়কে জানতো এবং বুঝতো। বর্তমান পরিস্থিতিতে তার আশংকা যে অমূলক নয়; সেটাও সে বুঝতো। তবুও সে তার পিতাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল ঃ “বাবা, যতই ঝড়-তুফান আসুক না কেন, আমি আমার ইসলামী চেতনাকে কোন ক্রমেই বিসর্জন দেবো না, ইনশাআল্লাহ। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আপনি শুধু আমার জন্য দোয়া করুন, যেন কঠিন মুহূর্তেও আমি একজন মুমিন হিসেবে অটল থাকতে পারি।” পিতা আশ্বস্ত হয়ে চলে গেলেন। তবে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ফয়জানকে তার বাবা আবারো তুর্কিস্তানের নিজের সেই রক্ত রঞ্জিত হিজরতের কাহিনী শুনিয়ে গেলেন, রাশিয়ানরা সেখানে কিভাবে মুসলমানেদের ওপর গণ হত্যা চালিয়েছিল। তারা মাদরাসা মসজিদগুলোকে নাইট ক্লাব, মদের আড্ডাখানা ও ঘোড়ার আস্তাবল বানিয়েছিল। যে সকল মুসলিম রমণীদের জীবনে কোন বেগানা পুরুষ চেহারা পর্যন্ত দেখতে পায়নি, তাদের উলঙ্গ ও বিবস্ত্র করে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছিল জোরপূর্বক। যখন তিনি তার ঈমান রক্ষা করার জন্য তুর্কিস্তান থেকে রক্ত পিচ্ছিল পথে হিজরত করলেন, তখন তিনি তার সেই হিজরতের সফরে কত করুণ, কত মর্মান্তিক অবস্থা দেখেছেন। কত আপনজনকে জবাই হতে দেখেছেন কমিউনিস্ট কসাইদের হাতে। যে নৃশংশতা দেখা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, সব কিছুই তিনি দেখেছেন তার দেশ ছাড়ার প্রাক্কালে।

।।৩।।

"এরোফ্লোটের" এ জাহাজটিতে ফয়জান ও ইয়াসমীনের আসন এক সঙ্গে রাখা হয়। কলেজ থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পথটি তারা এমনি অতিক্রম করেনি। যাত্রার প্রাক্কালে ফয়জানকেও তার অন্যান্য সহপাঠীর মত কয়েকবার রাশিয়ান অফিসারদের সমীপে ইন্টারভিও'র জন্য উপস্থিত হতে হয়েছে। ফয়জানের তখন বিস্ময়ের সীমা রইল না যখন সে এসব রাশিয়ানদের এমন ভাবে অনর্গল ফার্সি ও পশ্‌তু ভাষায় কথা বলতে দেখল, যেন এটা তদের মাতৃভাষা, অথচ বাস্তবে তা নয়।

যারা তার থেকে ইন্টারভিউ নিচ্ছিল; তারা তাকে জটিল জটিল প্রশ্ন করছিল এবং তার হাবভাবও ভালভাবে যাচাই করছিল। তারা হাসি মুখেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। এক-দু'বার ধর্মের ব্যাপারেও তারা তাকে প্রশ্ন করলো অভিনব পন্থায়। ফয়জান এ ব্যাপারটি ঘূর্ণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি যে, জাহাজে তার সাথে ইয়াসমীনের আসনটি কেন রাখা হয়েছে? এটা যে সেই পরিকল্পনারই একটা অংশ মাত্র, যার শিকার সে হতে যাচ্ছে।

এরোফ্লোটের সেই সুন্দরী স্মার্ট এয়ার হোস্টেজটি যেন তারই জন্য নির্ধারিত ছিল। সে প্রাণ খুলে ফয়জান ও ইয়াসমীনের সেবা ও আপ্যায়ন করে যাচ্ছিল। মস্কো পর্যন্ত পৌঁছতে ফয়জান উগ্‌লুর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল যে, বিশ্বের সব চেয়ে সভ্য জাতির বাস হচ্ছে রাশিয়াতে। এ সফরে ইয়াসমীন ও নিজের যোগ্যতা প্রদর্শন করছিল অত্যন্ত নিপুঁণ ভাবে। সে তার নরম ও মোলায়েম ছোয়াচ এবং কথার যাদু দ্বারা ফয়জানের তনু-মনে পুরোপুরি প্রভাব বিস্তার করে ফেললো। জাহাজ যখন মস্কো এয়ারপোর্টে অবতরণ করছিল, সে সময় পর্যন্ত সে মানসিক ভাবে স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, আফগানীদের জন্য রাশিয়ার চেয়ে পরম বন্ধু এবং মোল্লাদের চেয়ে বড় শত্রু আর কেউ নয়।

।।৪।।

মস্কো এয়ারপোর্টে অবতরণকারী এই "বিশেষ ফ্লাইটটি" একটি আলাদা স্থানে ল্যাণ্ড করলো। ফয়জান জাহাজের খিড়কী দিয়ে বাইরে উকি মারল। এয়ারপোর্টটি লাল রঙে ঝলমল করছিল। সবদিকে লাল পতাকা পত্‌পত্‌ করে উড়ছিল।

সেই সুন্দরী এয়ার হোস্টেজটি একবার পুনরায় তাদের কাছে এলো এবং ফয়জানের সামনে নত হয়ে ঈষৎ হেসে বললঃ

"কমরেড! সেবা যত্নে ত্রুটি হয়ে থাকলে ক্ষমা করে দিবেন।"

"না, না, শুকরিয়া, ধন্যবাদ। আপনি তো ...।" চরম আবেগে আপ্লুত এই পাঠান যুবকটি তার আগে আর কিছু বলতে পারল না। জাহাজের সিঁড়ি দিয়ে আবতরণ করতে করতে একটি অনুভূতি তার পুরো শরীরে শিহরিত হলো। তারা লাইন ধরে একজন একজন করে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। মস্কো ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এসেছিল অনেক যুবতী, যারা ছিল অর্ধ উলঙ্গ। তারা সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আগত মেহমানদের সবার সাথে উষ্ণ আবেগ নিয়ে করমর্দন করছিল। ফয়জান আজ পর্যন্ত ইয়াসমীন ছাড়া অন্য মেয়ের হাত ছুইয়ে দেখেনি। সে বেশ ইতস্তত বোধ করছিল যুবতীদের সঙ্গে হাত মেলাতে। কিন্তু এতটুকু অবকাশ তার ছিল কোথায়!

সে হাত প্রসারিত করার পূর্বেই মেয়েরা সহাস্যে তার হাতখানা টেনে চেপে ধরে "খোশ আমদেদ" বলে যাচ্ছিল।

তাদের ফ্লাইটটি অন্যান্য ফ্লাইট থেকে একেবারে পৃথক একটি স্থানে দাঁড়িয়ে ছিল। ফয়জান এবং তার সাথীদের মেজবান মেয়েরা তাদের বেস্টনীর মধ্যে নিয়ে কাছেরই একটি ইমারতে চলে গেল, যেখানে তাদের জন্য ভরপুর আপ্যায়নের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। ওই ইমারতটির দরজার সামনে একটি বড় ব্যানারে সুন্দর অক্ষরে লেখা ছিল ঃ "রুশ-আফগান বন্ধুত্ব, চিরঞ্জীব হোক।" যেখানে তাদের বসানো হল, সেটা ছিল হল সদৃশ বড় রুম। যেখানে উপস্থিত হয়েছিল পত্র-পত্রিকা, রেডিও এবং টিভির সাংবাদিক ও প্রতিনিধিরা। তারা নিজ নিজ ক্যামেরা ও মাইক নিয়ে ছিল ব্যস্ত। রাশিয়াস্থ আফগান দুতাবাসের প্রতিনিধি ছাড়াও রাশিয়ার মিত্র দেশসমূহের কুটনীতিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দু-আড়াই ঘন্টা পর্যন্ত তারা একে অপরের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খোলামেলা ভাবে মত বিনিময় করলেন এবং এর মাঝে চলল সুস্বাদু চা ও বিভিন্ন পানীয় দ্রব্যের আপ্যায়ন। ফয়জানদের গ্রুপে কাবুল থেকে বিশজন ছেলে এবং দশজন মেয়ে এসেছে। সব মেয়েই ইয়াসমীনের মত স্বাধীন চিন্তাধারার এবং যথেষ্ট চতুর। তারা এখানে উপস্থিত রাশিয়ান ও

অন্যান্য কমিউনিস্ট ব্লকের দেশসমূহের কুটনীতিবৃন্দ ও কর্মকর্তাদের সাথে খুবই খোলামেলা ও নির্ভয়ে আলাপ করছিল। না জানি, ফয়জানের আজ কি হয়েছে যে, আফগানী মেয়েদের এত নির্ভীকতা ও ইতস্তহীন আচরণ দেখা সত্বেও তার মধ্যে কোন ক্রোধের সৃষ্টি হচ্ছিল না। এ সবকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করতে পরিবেশ তাকে বাধ্য করছিল। অথচ এর আগে সে মেয়েদের খোলামেলা আচরণকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতো।

।।৫।।

ফয়জান এবং তার সঙ্গীরা জাহাজ থেকে নীচে অবতরণ করতেই জাহাজের কর্মকর্তারা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অন্যান্য আমলাদের মত ঐ এয়ার হোস্টেসটি যে বিশেষভাবে ফয়জান ও ইয়াসমীনের খেদমতে নিয়োজিত ছিল, সেও হাতে কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে তাকে যেই কাজ দেওয়া হয়েছিল, ঝটপট করে সেই কাজে লেগে পড়ল। সে উভয়ের আসনের পিঠ খুললো। সেখানে ফিট করা ছিল টেপ রেকর্ডার, সেখান থেকে সে একটি ক্যাসেট বের করল। অতঃপর আসনের পিঠ আবার বন্ধ করে দিল। ফলে পূর্বে যেমন ছিল, তেমন হয়ে গেল। কারোর পক্ষে মোটেও বুঝার কায়দা নেই যে, আসনের পিঠ আসন থেকে পৃথক হতে পারে। ঠিক একই ধরনের কাজ করে যাচ্ছিল তার বাকী সাথীরা, যাদের ফয়জানের সঙ্গে আগত সহপাঠীদের জন্য ভাগ ভাগ করে নিয়োজিত করে রাখা হয়েছিল। মোটকথা, সকলের আসনেই ফিট করে রাখা হয়েছিল টেপরেকর্ডার ও ক্যাসেট। জাহাজের কর্মকর্তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারা একটি মেশিনের বিভিন্ন পার্টস। তারা একজন আরেকজন থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত, নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে জাহাজের ক্যাপ্টেন ককপিট থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি সবার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন। তার গভীর ও ঠাণ্ডা চোখে না জানি কেমন রহস্যময় চমক ছিল যে, কেউই তার দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে তাকাতে সাহস পাচ্ছিল না। তিনি তাদের কাছে পৌঁছার পূর্বেই তাদের যে মিশন দেয়া হয়েছিল, তা পুরো হয়ে গিয়েছিল। তারা সবাই দৃষ্টি অবনত করে আদবের সাথে দাঁড়িয়েছিল। তাদের চেহারার ওপর আরেকবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে

ক্যাপ্টেন দরজার দিকে অগ্রসর হলেন। জাহাজের কর্মকর্তারাও তার পিছনে পিছনে দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ক্যাপ্টেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে সামান্য দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। এয়ার পোর্টের আমলারা নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে মশগুল ছিল। জাহাজের দরজা খুলে গেল। যাত্রীদের আসবাব-পত্র একটি গাড়ীতে ভরা হচ্ছিল।

জাহাজের দায়িত্বশীলদের নিয়ে যাওয়ার জন্য এরোফ্লোটের একটি মিনিবাস সেখানে এসে থামল। ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারা এক এক করে বাসটিতে আরোহণ করতে লাগলেন। ফয়জান ও ইয়াসমীনের খেদমতে যে এয়ারহোস্টেজটি নিয়োজিত ছিল, সে ও বাসে চড়ার জন্য সামনে অগ্রসর হল, সে বাসের দরজা পর্যন্ত পৌছলে, ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর শুনা গেল ঃ

"ভিলেনতিনা!"

এয়ার হোস্টেজটি নিথর নিস্বব্ধ হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। ভয় ও আতংকের একটি শীতল লহর তার পাঁজরের হাঁড়কে যেন বিদীর্ণ করে ভিতরে ঢুকে পড়ল। সে খুবই কষ্টে স্বীয় পায়ের উপর দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে ঘুরে তাকালো।

"তুমি যাবে না?" ক্যাপ্টেনের নির্দেশ শুনে ভিলেনতিনা আদবের সাথে একদিকে সরে দাঁড়াল।

বাস স্টার্ট দিয়েছে। খুব বেশী সময় অতিবাহিত হয়নি, রানওয়ের এক কোন্ থেকে একটি দ্রুতগামী কার ক্যাপ্টেনের দিকে আসতে দেখা গেল। কারটি ক্যাপ্টেনের কাছে এসে থেমে গেল। ড্রাইভার বিদ্যুৎগতিতে দরজা খুলে কার থেকে বেরিয়ে আসল এবং চৌকস সেনাদের মত ক্যাপ্টেনকে স্যালুট মেরে সম্মান প্রদর্শন করে একদিকে সরে দাঁড়াল। ক্যাপ্টেন মাথা দুলিয়ে তড়িৎগতিতে অন্য দিকে এসে সামনের দরজাটি ভিলেনতিনার জন্য খুলে দিলেন। তিনি ভিতরে বসতেই ড্রাইভার দরজাটি বন্ধ করে দিল।

ক্যাপ্টেনের কার স্টার্ট দিল। দেখতে দেখতে কারটি বিদ্যুতগতিতে চলতে লাগল। সে মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত কেউই তার দিকে দৃষ্টি ভরে তাকাতে সাহস করলনা।

এয়ারপোর্টের সীমানা পার হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের কার তিন জায়গায় থামানো হল, কিন্তু এয়ারপোর্টের রক্ষীরা ক্যাপ্টেনকে চেনামাত্র প্রতিবারই স্যালুট মেরে একদিকে সরে দাঁড়াচ্ছিল। তাড়াতাড়িই তাদের কারটি এয়ার পোর্টের সীমানা পেরিয়ে প্রধান সড়কে এসে গেল। এ মুহূর্তে ক্যাপ্টেন কথা বলাতো দূরের কথা, ভিলেনতিনার দিকে দৃষ্টি দিতেও চেষ্টা করলেন না। হঠাৎ গাড়ীর সামনের ছোট্ট আয়নাটির দিকে নজর পড়লো ভিলেনতিনার। সে দেখতে পেল যে, ক্যাপ্টেন সেই আয়না দিয়ে তার দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে যেন তার রক্ত চোখ দুটো আয়নার গ্লাসকে ভেদ করে ছিদ্র করে দেবে।

প্রায় আধাঘন্টা কারটি দ্রুতগতিতে চালানের পর তারা মস্কোর অত্যাধুনিক জনবসতি এলাকায় এসে গেল। একটি ছোট্ট দালানের সামনে এসে গাড়িটি থেমে গেল। এই ইমারতটি ভিলেনতিনার কাছে নতুন কোন বস্তু ছিল না। সে ইতোপূর্বে আরো বেশ কয়েকজন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে এখানে অনেক সময় কাটিয়েছে। দালানটির গেইটের সামনে এসে ক্যাপ্টেন গাড়ীর হর্ণ বাজালেন। এক বিশাল দেহী লম্বা চেহারা ও রক্ত চক্ষুওয়ালা গার্ড গেইট খুললো। ক্যাপ্টেন গাড়ী ভিতরে নিয়ে এলেন। সাথে সাথে গেইট বন্ধ হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন ইঞ্জিন বন্ধ করে চাবিটি বের করার প্রয়োজনও বোধ করলেন না। তিনি ভিলেনতিনার দিকে তাকালেন। কোন কিছু না বলেই গাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন এবং একটা ঝট্‌কা দিয়ে গাড়ীর দরজা বন্ধ করে দিলেন। দরজার চেয়ে বেশী ঝটকা অনুভব করলো ভিলেনতিনা নিজের শরীরে। সে হিম্মত করে নিজের পঞ্চইন্দ্রিয়কে সজাগ রেখে ওঠে দাঁড়ালো এবং ক্যাপ্টেনের অনুসরণ করে সামনে অগ্রসর হতে লাগল। ক্যাপ্টেন আঙ্গিনায় পৌঁছে একবার পিছন দিক ঘুরে দেখলো। ভিলেনতিনাকে সে হাতের ইশারা দিয়ে তার পিছন পিছন আসতে বললেন। ভিলেনতিনা ত্রস্ত পদে তার পদাংক অনুসরন করতে লাগল। দ্বিতীয় তলার একটি আরামদায়ক কক্ষের সামনে এসে তারা উপস্থিত হল। ক্যাপ্টেন দরজা খুলে ভিলেনতিনাকে ভিতরে আসতে বললেন। সে ভিতরে ঢুকলে ক্যাপ্টেন দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং একটি আরামদায়ক কুরসীর দিকে ইংগিত করে সেখানে তাকে বসতে বললেন। অতঃপর ক্যাপ্টেন বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন। ভিলেনতিনা একটা

গভীর নিঃশ্বাস ছেড়ে নিজেকে কিছুটা স্বাভাবিক করে নিতে চেষ্টা করলো এবং সে যেই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে ভাবতে লাগল। সে গত আট বছর ধরে এ ধরনের সেবা করে যাচ্ছে। তার সম্পর্ক ছিল রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা K. G. B.' এর সেই বিশেষ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে, যাদের দায়িত্ব ছিল রাশিয়ার বিদেশী বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং তাদের ব্যাপারে তথ্য যোগাড় করা। তার অতীত সেবা কৃতিত্বের আলোকেই কেজিবি কর্তৃক "ফয়জান উগ্লুর" ব্রেন ওয়াশ করার জন্য বিশেষ মিশনটি তার উপর ন্যস্ত করা হয়। এই যুবকটির ব্যাপারে কাবুলের স্পাই মাষ্টারের রিপোর্ট ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও শানদার। তার রিপোর্ট ছিল ঃ "যদি ফয়জান আমাদের নিয়ন্ত্রনে চলে আসে, তাহলে সেটা আমাদের মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য যেন একটি "শক্তির পাহাড়" হাতে পেলাম।

তারা ফয়জানকে জালালাবাদ এবং তারও আগে পাকিস্তানী সীমানার ভিতরে যেসকল মুহাজেরীন ক্যাম্প রয়েছে, সেখানে ব্যবহার করতে চাচ্ছিল। কিন্তু তার পূর্বে দরকার ছিল তার ব্রেন ও মস্তিষ্ক ওয়াশ করে তার থেকে "মোল্লাতন্ত্রের" ভূত বের করা। যদি সেটা করতে পারা যায়, তাহলে সম্ভব হবে তাকে একজন প্রগতিশীল বিপ্লবী হিসেবে দাঁড় করানো। কাবুলে সেই মিশনটি সোপর্দ করা হয়েছিল ইয়াসমীনকে।

।।৬।।

পনের বিশ মিনিট পর ক্যাপ্টেন বাথরুম থেকে বের হলেন। এতক্ষণে তিনি তার কাপড় পাল্টে নেন। কাপড়ের সঙ্গে সঙ্গে তার মেজাজও বদলে গিয়েছিল। চেহারার সেই কঠোরতা, যার দরুন অধীনস্তদের প্রাণ থাকতো সব সময় ভয়ে ওষ্ঠাগত, এখন সেই ভাবটি একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তার চিকন ঠোঁটে রহস্যভরা একটি ঈষৎ হাসি বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়েছিল। তা সত্ত্বেও না জানি, কেন এখনো ভিলেনতিনা তার সাথে চোখ মেলাতে সাহস পাচ্ছিল না।

"কমরেড ফয়জানকে কেমন বুঝলে?" ক্যাপ্টেন কামরার বড় টেবিলটির সাথে লাগানো একটি আরামদায়ক কেদারায় বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলেন।

"অনেক শান্দার, স্যার!" ভিলেনতিনার কথা শেষ হতে না হতেই একজন খেদমতগার রুমে ঢুকলো। সে বিনয়ের সাথে বললো "স্যার, আপনার কি খেদমত করতে পারি?"

"ভদকা নিয়ে এসো।" ক্যাপ্টেন ফরমায়েশ করলেন। খেদমতগার চলে গেলো।

"ক্যাসেট চালাও।" ক্যাপ্টেনের সংক্ষিপ্ত অর্ডার। ভিলেনতিনা মেশিনের মত ঝট্পট্ করে ওঠে দাঁড়াল। টেবিলের এক কোণে রাখাছিল একটি টেপরেকর্ডার। সেখানে গিয়ে সে ক্যাসেট চালিয়ে দিল। তখন সে সেখানে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল। ক্যাসেট শেষ হওয়া পর্যন্ত ভিলেনতিনা নিজ স্থান থেকে মোটেও নড়ল না।

"ও, কে, তুমি বস ।" ক্যাপ্টেন তার দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিলেন। ইতোমধ্যে খেদমতগার টেবিলের উপর ভদকার বোতল, ছোডা এবং গ্লাস রেখে চলে গেল। সে এক মূহুর্তের জন্যও এখানকার পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো না।

ভিলেনতিনা এখানকার আদব কায়দা এবং পরিবেশ সম্পর্কে ছিল পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। সে ভারি পদে টেবিল পর্যন্ত পৌছল এবং ভদকার একটি জাম প্রস্তুত করে ক্যাপ্টেনকে দিল। অতঃপর নিজের জন্য আরেক গ্লাস জাম প্রস্তুত করে নিজ কুরসীতে গিয়ে বসল। দু-তিন ঢোক শরাব গলাধকরণের পর সে নিজেকে কিছুটা নর্মাল মনে করছিল।

"আজ থেকে তোমার ডিউটি পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে তুমি শুধু ফয়জানের উপর কাজ করবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তাকে তুমি প্রস্তুত করো, কমিউনিজম আদর্শে বিপ্লব মুখী বানাও। ইয়াসমীন ঠিক আছে।

কিন্তু আমরা কোন মুসলমান, বিশেষ করে পাঠান মেয়ের উপর ভরসা করতে পারি না। যে কোন মুহূর্তে এরা নিজেদের 'বুর্জোয়া' চিন্তা ধারায় ফিরে যেতে পারে।"

"ও কে, স্যার।"

"এ ব্যাপারে যে পরিকল্পনা তুমি প্রস্তুত করবে, সে সম্পর্কে আমাকে অবশ্যই জানাবে।" ক্যাপ্টেন ভিলেনতিনার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন।

"ইয়েস, স্যার।"

"আজ রাত তুমি আমার মেহমান থাকবে। কাল থেকে তুমি তোমার কাজ শুরু করবে। এ ব্যাপারে স্বয়ং আমি নিজেই রিপোর্ট তৈরী করবো।" এ বলে ক্যাপ্টেন নিজের জায়গা থেকে ওঠে ভিলেনতিনার দিকে অগ্রসর হলেন।

এ ধরনের কয়েকজন ক্যাপ্টেন ইতোপূর্বে ভিলেনতিনাকে এ প্রকারের ডিউটি দিয়েছিলেন। সে এটাও জানতো যে, রাতে তাদের সাথে শয্যাশায়িনী হওয়াও তার ডিউটিরই অংশ। সত্যিকারের কোন কমরেড সে তার ডিউটিকে অস্বীকার বা অবহেলা করতে পারে না। সেই রাতটিতেও সে নিজের জীবনের অতীত কয়েক রাতের মত মহান বিপ্লব, মহান আদর্শের খাতিরে নিজেকে বিসর্জন দিল। নিজের দেহকে সোপর্দ করে দিল কমিউনিজম বিপ্লবের ধ্বজাধারীর কাছে। ভিলেনতিনা জানতো যে, সে যে আদর্শের জন্য কাজ করে যাচ্ছে, তার পুরুষ কর্মীরা যদি নারী কর্মীদের ভোগ করতে চায়, তাদের যৌন সম্ভোগে আহ্বান করে, সেখানে নারীদের অবশ্যই সাড়া দিতে হবে, ইচ্ছাকৃত ভাবে হোক, কিংবা অনিচ্ছাকৃত ভাবে।

অতি প্রত্যূষে যখন সে ক্যাপ্টেনের বাহু আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাথরুমের দিকে যাচ্ছিল, তখন তার শরীর ব্যথায় চিন্‌চিন্‌ করছিল, যেন তার কোন ফোঁড়া হয়েছে।

নাস্তার টেবিলে ক্যাপ্টেন তার সামনে এমন ভাবে বসা ছিলেন, যেন তিনি এখানে এখনই এসেছেন। রাতের বেলা তিনি যে অপকর্ম করেছেন, সে ব্যাপারে কোন অনুভূতি বা আছর তার মধ্যে মোটেও লক্ষ্য করা যাচ্ছিল না।

খানিক পর ভিলেনতিনা একটি দ্রুতগামী কারে চড়ে মস্কোর সেই জনবসতির দিকে যাচ্ছিল, যেখানে তার বৃদ্ধা মা এবং ছোট্ট দুই বোন তার জন্য অপেক্ষা করছিল। তার বুড়ো বাবা গত তিন বছর ধরে সাইবেরিয়ার বরফাচ্ছাদিত অঞ্চলে কমিউনিজম অপছন্দ করার কারণে নির্বাসন জীবন যাপন করছে। এখন তার বাবার ব্যাপারটি পুরোপুরি ভিলেনতিনার ওপর নির্ভর করছিল যে, সে এই মহান আদর্শের জন্য কতটুকু আত্মবিসর্জন দিতে পারে! সে এই মতবাদের কতটুকু সেবা করতে পারে! হয়ত তার আত্মত্যাগকে উসিলা করে তার বাবা নির্বাসিত জীবনযাপনের আযাব থেকে রেহাই পেতে পারে।

।। ৭।।

ফয়জান এয়ারপোর্ট থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত যাত্রা পথে আফগান জনতার জন্য রুশ মৈত্রীর শানদার দৃশ্যাবলী দেখে অবাক না হয়ে পারল না। তার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেল যে, সে পূর্বে রাশিয়া সম্পর্কে যা শুনেছিল, তা মিথ্যা, ভুল এবং অমূলক। ইউনিভার্সিটির গেইটে পৌঁছলে রাস্তার দুই ধারে দাঁড়ানো রাশিয়ান যুবক–যুবতীরা তাদের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিল। বিভিন্ন সম্মানসূচক শ্লোগান দিয়ে তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালো। রাতের জাকজমকপূর্ণ খাওয়ার অনুষ্ঠানের সূচনা হল "ভদকা" শরাব দিয়ে।

কাবুল থেকে আগত ফয়জানের সঙ্গীরা রাশিয়ান ছাত্র–ছাত্রীদের সঙ্গে মিলে "মৈত্রী জাম" পান করছিল। ইয়াসমীন ফয়জানের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল। সে যদিও এখন পর্যন্ত ফয়জানকে শরাব পান করতে আহ্বান করেনি। কিন্তু সে অবশ্যই চাচ্ছিল যেন ফয়জান নিজেই আগে বেড়ে অন্যদের মত "বন্ধুত্বের জাম" ঠোঁটের সাথে স্পর্শ করে। ফয়জানের প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছিল এবং সে আগের তুলনায় বেশী 'স্বাধীন চিন্তাধারার' হয়ে গিয়েছিল। তবুও তার বিবেক সায় দিচ্ছিল না শরাব পান করতে। সে অনুষ্ঠানের অন্য শরীকদের থেকে কিছুটা দূরে সরে দাঁড়িয়েছিল। ইয়াসমীন ছায়ারমত তার শরীরের সঙ্গে লেগে দাঁড়িয়েছিল। জনৈক খেদমতগার ফয়জানের হাবভাব বিশেষভাবে নোট করছিল। এই খেদমতগারটিকে আফগানীদের অবস্থা যাচাই করার জন্য এখানে নিয়োজিত করা হয়েছিল।

"আমার কেমন জানি, এসব কিছু মোটেই ভাল লাগছে না।" ফয়জান বিরক্তির সাথে ক্ষীণ কণ্ঠে ইয়াসমীনকে বলল।

"আসলে কি, কিছুদিন পর তুমি সবকিছুই বুঝতে সক্ষম হবে, ফয়জান! প্রগতিশীল বিপ্লব প্রতিষ্ঠার জন্য এগুলোর প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের সবার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামনে অগ্রসর হতে হবে।" ইয়াসমীন বলল।

ইয়াসমীনের কথা শুনে ফয়জানের মনটা কেমন যেন আঁতকে উঠল। কিন্তু সে ইয়াসমীনকে মুখ দিয়ে কিছু বলল না। ইয়াসমীন বেশীক্ষণ ধৈর্য

ধরতে পারল না। সে ফয়জানকে "এখনি আসছি" বলে সেই হল রুমের বাইরে লনের দিকে চলে গেল। সেও তার অন্য সাথীদের সঙ্গে মদ পানের আসরে শরীক হয়ে গেল।

।।৮।।

পরদিন হতেই তাদের পড়াশুনা শুরু হয়ে গেল। তাদেরকে হোস্টেলে এক জায়গাতেই থাকতে দেয়া হয়েছিল। যেই হোস্টেলে তাদের অবস্থান ছিল, সেখানে বেশীর ভাগ বিদেশী ছাত্ররা থাকতো।

ইয়াসমীনও ফয়জানের রুম যদিও পাশাপাশি ছিল না, তবুও তেমন দূরেও ছিল না। ফয়জানের রুমে যেতে ইয়াসমীনের মোটেও সময় লাগত না। সে অনেক রাত পর্যন্ত ফয়জানের রুমে কাটাতো এবং দিনের বেলায় ইউনিভার্সিটিতে যা পড়ানো হতো, সে ব্যাপারে সে ফয়জানের সঙ্গে আলোচনা পর্যালোচনা করতো।

ফয়জান কখনো এ ভেবে পেরেশান হয়ে যেত যে, সে এখানে কি পড়তে এসেছে ?

তার জানা মতে, তাকে তো মস্কো ইউনিভার্সিটিতে উচ্চতর ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স কম্পিলিট করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এখানে শুধু কমিউনিজম মতবাদ সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

বড়জোর দুই পিরিয়ড ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে পড়ানো হত, তাও ছিল নাম মাত্র।

বাকী ছয় পিরিয়ড কমিউনিজম মতাদর্শে ব্রেন ওয়াশ করা হতো। ফয়জান কখনো কখনো প্রফেসরদের গদবাঁধা লেকচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠতো, টুটে যেতো তার ধৈর্যের বাঁধ। সাধারণত এসব মুহূর্তে ইয়াসমীন তাকে প্রবোধ দান করতো। সে তাকে বুঝাতো যে, একজন সত্যিকারের বিপ্লবীর জন্য এসব কথা শেখার দরকার রয়েছে। ইয়াসমীন এ যাবত "বিপ্লব" শব্দটি এত বেশী ব্যবহার করছিল যে, ফয়জান এখন এ শব্দটি শুনলে তার শরীর যেন জ্বলে উঠতো।

কিন্তু সে ইচ্ছা সত্বেও কখনো নিজের ভিতরের অবস্থা ইয়াসমীনের কাছে ব্যক্ত করতে পারছিল না।

একটি বিষয় সে ভাল ভাবে নোট করলো যে, এখানে আইন শৃঙ্খলার নামে তাদের ওপর ছিল সীমাহীন অন্যায়, অসঙ্গত বাধ্যবাধকতা। স্বাধীন ভাবে ঘোরাফেরা করার অনুমতি তাদের ছিল না। কিন্তু এ ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কোন ছাত্র কোন ধরনের প্রতিবাদ করেনি। এখানে যারা এসেছে, তারাও হয়ত সবাই চরম বিপ্লবপন্থী। নতুবা সাধারণ অবস্থাতে ফয়জানের খেয়াল মোতাবেক কোন ছাত্রের পক্ষে এত কড়াকড়ি, এত বাড়াবাড়ি আদৌ বরদাশ্‌ত্‌ করা সম্ভবপর নয়।

।।৯।।

ছুটির দিন এলে ইয়াসমীন সাধারণত ফয়জানের সঙ্গে ঘোরাফেরা করতো। এখানে কাছেই একটি নদীর ধারে খুবই মনোরম "বিনোদন জায়গা" বানানো হয়েছিল। আজ ফয়জান ইয়াসমীনের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলো নিজ রুমে বসে। কিন্তু ইয়াসমীন এলো না। সে ধৈর্য না ধরতে পেরে নিজেই ইয়াসমীনের কামরার দিকে গেল। সেখানে গিয়ে সে জানলো যে, ইয়াসমীন তার একজন রাশিয়ান বান্ধবীর সাথে হঠাৎ কোন জরুরী কাজে বের হয়ে গেছে।

ফয়জান কিছুটা পেরেশান হয়ে পড়ল। তার কিছুই বুঝে এলো না যে, সেই প্রয়োজনীয় কাজটি কি, যার জন্য সে হঠাৎ চলে গেল? অথচ তাকে কিছু জানালোও না?

যখন সে এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর খুঁজে পেলো না, তখন সে একাই নদী তীরের সেই বিনোদন পার্কে চলে গেল। এখানে নদীর কিনারায় কিনারায় সবুজ বৃক্ষের ছায়াতলে পাথরের বেঞ্চ ছিল। এখানে বসলে তার মনে গভীর প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়তো।

ফয়জান একটি আড়াল জায়গায় বানানো বেঞ্চে বসে নদীর স্বচ্ছ-পানির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

সময়টি ছিল যেহেতু ভোর বেলা, সে জন্য নদীতীরের এই উদ্যানে লোকের আনা-গোনা কম দেখা যাচ্ছিল। ফয়জান হঠাৎ তার পশ্চাতে পদধ্বনি শুনে চমকে উঠল। সে পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। সে

একটি রাশিয়ান যুবতীকে তার দিকে আসতে দেখলো। ফয়জান এই পার্কে বেশ কয়েকবারই এসেছে। তবে আজ যে স্থানে সে বসেছিল, সেখানে সে ইতোপূর্বে আর কোন সময় বসেনি, আজই প্রথম। মেয়েটি আকর্ষণীয় ভঙ্গিমায় চলতে চলতে তারদিকে আসছিল।

ফয়জানের ইচ্ছা হল দৃষ্টি তার থেকে সরিয়ে নিতে। কিন্তু, আল্লাহ-ই ভাল করে জানেন যে, মেয়েটির মধ্যে কি আকর্ষণ ছিল। সে দৃষ্টি হটাতে পারল না। যুবতীটি যখন ফয়জানের একেবারে কাছে এসে গেল, তখন তার অবয়বটি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। ফয়জানের মনে হল, যেন সে এর পূর্বে তাকে কোথাও দেখেছিলো। কিন্তু, কোথায়?

তার স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠলো তারই ছবি। আরে, এতো সেই এয়ার হোস্টেজ, যে এরোফ্লোটে তাদের মেজবান ছিল, ছিল তাদের সেবিকা।

"হ্যালো কমরেড।" ফয়জানকে এখানে দেখে সেই যুবতীটি কিছুটা বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করে বললো।

"হ্যালো!" ফয়জানও তাকে খোশ আমদেদ জানালো।

"বাহ্, কতই না মজার ব্যাপার যে, আপনার সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ হয়ে গেল। আমি তো কল্পনাও করিনি যে, আমাদের আবার দেখা হয়ে যাবে।"

যুবতীটি এত স্পষ্টভাবে ফার্সী বলে যাচ্ছিল যে, ফয়জানের সন্দেহ হতে লাগল যে, সে কি সত্যিই রাশিয়ান?

"আপনি কি এখানে এসে থাকেন?" ফয়জান জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ,–আমি কিছুটা অবকাশ পেলেই এখানে এসে থাকি মনকে ফ্রেশ করার জন্য এবং আপনি যে বেঞ্চটিতে বসে আছেন, সেটাতেই সাধারণত বসি। আজ এদিকে আসার সময় যখন দূর থেকে দেখলাম, আমার বেঞ্চটিতে একজন অপরিচিত লোক বসা আছে, তখন ভাবলাম দেখে আসি কোন লোকটি বসা আছে আমার জায়গাটিতে! কিন্তু আমি মোটেও কল্পনা করতে পারিনি যে, তোমার সাথে এখানে আমার আবার সাক্ষাৎ ঘটবে।" যুবতীটি অপ্রত্যাশিত ভাবে আপনি'র বদলে তুমি সম্বোধন করে ফয়জানের সঙ্গে ফ্রি হতে চেষ্টা করলো। ফয়জান এতে মোটেও আর্শ্চযান্বিত হল না।

কারণ, রাশিয়াতে আসার পরে এ যাবত তার যতটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে তার আলোকে সে বুঝতে পেরেছে যে, রাশিয়ানরা খুব তাড়াতাড়িই ফ্রি হয়ে যায়।

কমপক্ষে ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে তো সে এই জিনিসটি ভাল ভাবেই লক্ষ্য করেছে।

।।১০।।

এয়ার হোস্টেজটি ফয়জানকে বলল, তার নাম ভিলেনতিনা। সে বেশ সময় পর্যন্ত ফয়জানের সাথে খোলামেলা কথাবার্তা বলল। ভিলেনতিনা বয়সে ফয়জানের চেয়ে এক-দু বছরের ছোট হবে। ফয়জান তার সান্নিধ্যে একটা আশ্চর্য্য ধরনের তৃপ্তি ও প্রশান্তি অনুভব করছিল। ভিলেনতিনা ইয়াসমীনের মত বিপ্লব ও কমিউনিজম আদর্শের ব্যাপারে একটা শব্দও মুখ থেকে বের করল না।

দুপুর বেলা ঘনিয়ে এলে ভিলেনতিনা তাকে তার বাসায় যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালো। ফয়জান তার অনুরোধকে উপেক্ষা করতে পারল না। তার বাসা এখান থেকে তেমন একটা দূরে ছিল না। ফয়জান এই প্রথম কোন রাশিয়ান জনবসতিতে আসার সুযোগ পেলো। সে অনুভব করল যে, বাসাটি খুবই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছে। ছিমছাম ছোট্ট আকারের দু'টি রুম। ভিলেনতিনা বলল যে, সে এই বাসাটি রুশ এয়ারলাইন-এর পক্ষ থেকে পেয়েছে এবং এখানে সে একাই থাকে।

ফয়জান ভিলেনতিনার সঙ্গে তাদের বাড়ী-ঘর পরিবার পরিজন সর্ম্পকে খোলা-মেলাভাবে অনেক ধরনের আলাপ করলো।

এখানকার নিয়ম তো ছিল, মেহমানদের মেহমানদারী করানো হয় "ভদকা " শরাব দিয়ে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল যে, ভিলেনতিনা সেই নিয়ম পালন করল না। ফয়জানকে শরাব পান করতে বলল না বরং আফগানীদের মুসলিম রুচি অনুযায়ী হালাল খানা এবং পানীয় পরিবেশন করলো। সে ফয়জানের সঙ্গে কমিউনিজম মতাদর্শ সম্পর্কেও কিছু বলল না এবং সত্যিকারের বিপ্লবী কি ভাবে হওয়া যায়, এধরনের কোন উপদেশও সে ফয়জানকে দিল না। মোটকথা, সে রাজনীতি সম্পর্কে একটি শব্দও মুখে আনলো না । তবে ফয়জান যখন কথায় কথায় কাবুল প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ

করছিল, তখন ভিলেনতিনা উৎসাহ ভরে বলল যে, "কাবুল ও মস্কোর মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব বিরাজমান রয়েছে এবং আমাদের চরম আকাঙ্খা হল, যেন আফগানিস্তান খুবই উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করে।"

বিকাল হয়ে গেলে ফয়জান ভিলেনতিনাকে বলল যে, "সরি, অনেক সময় পার হয়ে গেল, এখন তাহলে উঠা যাক।"

সে যখন ভিলেনতিনার বাসা থেকে বের হচ্ছিল, তখন সে নিজেকে অনেকটা নরমাল অনুভব করছিল।

ভিলেনতিনা নিজের কার দিয়েই ফয়জানকে ইউনিভার্সিটির গেইট পর্যন্ত ছেড়ে গেল। সেই ছোট্ট কারটি ছিল এয়ারলাইনের। ভিলেনতিনা ফয়জানকে বলেছিল যে, ছুটির দিনে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এয়ারলাইনের পক্ষ থেকে গাড়ী দেওয়া হয়। সে আরো বলেছিল যে, সাধারণত তার ডিউটি দেশের অভ্যন্তরীন জাহাজেই থাকে এবং রাতের বেলায় সে নিজের বাসায় অবস্থান করে। তবে কোন কোন সময় কাবুলগামী ফ্লাইটেও তার ডিউটি পড়ে। ভিলেনতিনার ভদ্রতা, অনুপম ব্যবহার এবং জীবন সম্পর্কে প্রাণবন্ত কথা-বার্তায় ফয়জানের এই প্রথমবার প্রবাসী জীবনে নিজের দেশের কথা মনে পড়ল।

সে যখন ভিলেনতিনা থেকে পৃথক হচ্ছিল, কেমন জানি একটি অকল্পনীয় নৈরাশ্য ভাব তাকে গ্রাস করে ফেলছিল।

।। ১১ ।।

বিকাল বেলায় ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের জন্য খেলার মাঠে পৌছা এবং কোন একটি খেলায় অংশ গ্রহণ করা ছিল একান্ত জরুরী। কিন্তু ফয়জান আজ হোস্টেল ইনচার্জের কাছে "শরীর ভাল নয়।" অজুহাত দেখিয়ে শুয়ে রইল। রাতের খানাও সে নিজের কামরাতেই আনলো। তার অসুখের কথা শুনে অনেক বন্ধুরা এলো সেবা শুশ্রূষা করার জন্য। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল যে, ইয়াসমীন এখন পর্যন্ত তার কাছে এলো না।

ফয়জান কিছুটা পেরেশান হয়ে গেল। সে বুঝে কুলিয়ে উঠতে পারছিল না যে, ইয়াসমীনের হঠাৎ কি হয়ে গেল? এমন তো ইতোপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। যেই ইয়াসমীন এক মুহূর্তের জন্যও ফয়জানকে ছাড়া থাকতে পারে না।

আজ সে তার জন্য বার্তা রেখে আসা সত্ত্বেও তার কাছে এলো না, কিন্তু, কেন?

কয়েক বার তার ইচ্ছে করল, ইয়াসমীনের কাছে গিয়ে তার হাল হকিকত জানার জন্য। কিন্তু সে তো ছিল পাঠান, প্রতিবার তার এই আত্মমর্যাদাবোধ বারণ করছিল তাকে যেতে। মনে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে নিজের জায়গা থেকে নড়ল না।

রাত দশ-এগারটা পর্যন্ত সে বিভিন্ন বই হাতে নিয়ে পৃষ্ঠা উল্টাতে লাগল অস্থির ভাবে। কিন্তু অবশেষে মনের তাড়নায় সে উঠে দাড়াল এবং নিজ কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়ল।

ব্লকের উভয় পার্শ্বের পিলারে জ্বলছিল ঝুলন্ত বাল্ব। অনেক দূর পর্যন্ত কোন পাহারাদারের নাম নিশানা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না।

এখানকার পরিবেশ অনুযায়ী যদি সে কোন ছাত্রীর কামরায় পুরো রাতও কাটিয়ে দেয়, তাহলে এ ব্যাপারে কারোর কোন আপত্তি ছিল না। এখানে শুধু এতটুকু আবশ্যকীয়, অধ্যাপকদের লেকচারের সময় সব ছাত্র সময় মত ক্লাশ রুমে যেন উপস্থিত থাকে। এর বাইরে তারা কি করে, কর্তৃপক্ষ সে ব্যাপারে কোন-ই মাথা ঘামাতেন না। তবুও ফয়জান চাচ্ছিল, সে যে ইয়াসমীনের কক্ষের দিকে যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে ঘুর্ণাক্ষরেও কেউ না জানুক। সে মস্কোর বরফাচ্ছাদিত হাওয়া থেকে বাঁচার জন্য লম্বা গরম কোট পরে নিল এবং তার উপর দিয়ে একটি চাদর পেচিয়ে নিল। খুবই সতর্কতা অবলম্বন করে সে ধীরে ধীরে ইয়াসমীনের কামরার দিকে পা বাড়াচ্ছিল।

ইয়াসমীনদের ব্লকে যাওয়ার জন্য সে অন্ধকার পথ অবলম্বন করল। তার উদ্দেশ্য সফল হল। সত্যিই এখন পর্যন্ত কেউ তাকে দেখতে পায়নি। ওই ব্লকটির অধিকাংশ কামরায় অন্ধকার বিরাজ করছিল। কিন্তু ইয়াসমীন সহ আরো দু-তিন জন আফগানী ছাত্রীদের রুমে এখনো বাল্ব জ্বলছিল।

ইয়াসমীনের রুম থেকে ফয়জান খানিক দূরে এসে থেমে গেল। একটা আজব ধরনের খেয়াল তার মাথায় এলো। তার ইচ্ছে হল, আজ চুপে চুপে দেখবে, এত রাত পর্যন্ত ইয়াসমীন কি করছে?

সে এই অভিপ্রায় নিয়ে ইয়াসমীনের কামরার পৃষ্ঠদেশে এসে গেল। ঐ ব্লকের সব কামরার বাতায়নগুলো সে দিকেই খুলতো, যে দিকে ফয়জান

দন্ডায়মান ছিল। ওখানকার দৃশ্যটি ছিল খুবই মনোমুগ্ধকর। পুষ্পে পুষ্পে ভরা সবুজ বৃক্ষ এবং সারি সারি ফুলের কেয়ারী, একটা মোহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করছিল। ইয়াসমীনের কামরার জানালার সাথে ফুলে ভরা একটি খুবসুরত শাখা পেচিয়ে রয়েছে। ফয়জান সেই ডালাটির আঁড়ালে এসে দাড়িয়ে গেল। সে যা-করে যাচ্ছিল, তার বিবেক যদিও দংশন করছিল, কিন্তু তার মনে যে সন্দেহ তোলপাড় খাচ্ছিল তার থেকে মুক্তি পাওয়ার এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। সে জন্যই তাকে অপসন্দনীয় পন্থা বেছে নিতে হচ্ছে। জানালা ছিল বন্ধ। কিন্তু জানালার গ্লাসের পিছনে পর্দা না থাকার কারণে বাইরে থেকে ভিতরের দৃশ্যটি ভাল ভাবে দেখা সম্ভব ছিল।

ফয়জান এক মুহূর্তের জন্য নিজের পায়ের উপর ভর করে খিড়কীর ভিতরে উঁকি মারল। ভিতরের অবস্থা দেখামাত্র তার পুরো শরীরে একটা প্রচন্ড শিহরণ খেয়ে উঠল। হতাশায় সে ভেঙ্গে পড়ল। তার শরীরটা অবশ হয়ে গেল। একটা প্রচন্ড ক্ষোভ ও বিতৃষ্ণা তাকে ঝেকে ধরল।

ফয়জান তো অবশ্যই জানতো যে, ইয়াসমীন স্বাধীন প্রকৃতির মেয়ে এবং সে প্রয়োজনের চেয়েও বেশী মডার্ণ। তবুও সে পূর্বে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিতো যে, আধুনিক কাবুলের আনুমানিক প্রতিটি যুবতীই বর্তমানে এই রঙে রঙীন হয়ে যাচ্ছে। সেখানে ইয়াসমীনও যদি আধুনিক হয়ে যায় তাতে দোষের কি আছে।” কিন্তু, আজ এখানে তার চোখ দুটো যেই বিশ্রী দৃশ্য দর্শন করল, তার পর থেকে ইয়াসমীনের প্রতি তার চরম ঘৃণা ভাব সৃষ্টি হল।

তার সামনে কামরার যে দৃশ্যটি ভেসে এলো তাহলো এই যে, ইয়াসমীন ও আরেকটি আফগানী যুবতী তাদের রাশিয়ান ফ্রেন্ডদের সাথে মিলে মাদকদ্রব্য পান করে প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত অশালীন ও অরুচীপূর্ণ কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছিল।

ফয়জানের ভিতরে আগুন জ্বলে ওঠল। তার মন চাইলো, ভিতরে গিয়ে আর না হলেও এদুজন আফগান যুবতীদের টুটি চেপে ধরে একদম শেষ করে দিতে। কিন্তু সে অনেক কিছু করতে চাইলেও কিছুই করতে পারল না। সে তো আর এখন ছোট নয়। তাকে খুব ভেবে চিন্তে কাজ করতে হবে। আজকের এই খানিক মুহূর্ত তার সামনে অনেক রহস্য উদঘাটিত হয়ে গেল। এই ঘটনা তার জীবনের ধারাকে সম্পূর্ণ রূপে পাল্টে দিল।

প্রথম দিনে এয়ারপোর্ট থেকে মস্কো ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত সফরের প্রাক্কালে তার মধ্যে রাশিয়া সম্পর্কে যে সু ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। এখন তা পুরোপুরি পাল্টে গেছে। রাশিয়া শব্দটিই এখন তার কাছে সবচেয়ে ঘৃণার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিদিন লেকচারাররা একটি থিওরী অবশ্যই বলতো, তাহলো "তোমাকে যা বলা হচ্ছে সেটা বাস্তব নয় , বরং বাস্তব হচ্ছে সেটা যা তুমি দেখছো।" এই থিওরীটি ফয়জানের বেলায় পুরোপুরি প্রযোজ্য হচ্ছিল।

ফয়জান তো দেখতে পাচ্ছিল যে, রাশিয়ানরা তার দেশের যুবক যুবতীদের উচ্চ শিক্ষার নাম দিয়ে এনে এখানে কমিউনিজম মতবাদ শিখাচ্ছে, সুরুচির ও সভ্যতার নাম দিয়ে তাদের অসভ্যতা, অশ্লীলতা ও মদ-সুরায় আসক্ত করছে। এখানে ইঞ্জিনীয়ারিং কোর্স তো একটা সাইন বোর্ড মাত্র; আসলে তারা আফগান যুবক-যুবতীদের ব্রেন ওয়াশ করে আফগানিস্তানের পবিত্র ভুমিতে কমিউনিজমের মত নাস্তিক্যবাদ সমাজ ব্যবস্থাকে সাপ্লাই করতে চাচ্ছে।

ফয়জানের ঈমানী চেতনা আকস্মিক ভাবে জেগে উঠলো। একটা প্রচন্ড আক্রোশ তাকে পেয়ে বসল। সে আর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা সমীচীন মনে করলো না। সে যেমন চুপচাপ গিয়েছিল, ঠিক তেমন ভাবে ফিরে এলো। যাওয়ার মুহূর্তে সে নিজ রুমের বাতিটি অফ করে গিয়েছিল, যাতে দুর থেকে দেখলে মনে হয় যে, সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিজের বিছানায় শুতেই ফয়জান উগ্‌লুর মনে হল, তার শরীরখানা পুড়ে যাচ্ছে। প্রচন্ড জ্বরে সে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। পুরো রাত সে এপাশ-ওপাশ করে কাটিয়ে দিল। তার ভিতরকে আগুনের একটি লাভা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছার-খার করে দিচ্ছিল। সুবহে সাদিকের সময় গভীর নিদ্রায় তাকে পেয়ে বসল। সকাল বেলায় সময় মতই তাকে ঘুম থেকে জাগানো হল। বড়জোর সে দু ঘন্টা ঘুমোতে পেরেছে। ইউনিভাসির্টির গ্রাউন্ডে প্রভাত কালীন ব্যায়াম করার জন্য লোক এলো তাকে নিয়ে যেতে। কিন্তু ফয়জান অসুস্থতার কথা বলে যেতে অপারগতা প্রকাশ করলো। খানিক পরেই একজন চৌকস

ডাক্তার তার কামরায় হাজির হলেন। তিনি নিষ্ঠার সাথে তার শরীর চেক করলেন। ডাক্তার কিছু ঔষধ দিলেন এবং ইনজেকশন পুশ করে চরে গেলো।

ফয়জান জানতো যে, ডাক্তারের আগামী রিপোর্ট পর্যন্ত তার আর ক্লাশে হাজির না হলেও চলবে, তার ছুটি হয়ে গেছে।

।।১২।।

দুপুরে ছুটি হলে ইয়াসমীন সোজা তার কামরাতেই এলো। তাকে বেশ লজ্জিত মনে হচ্ছিল। কাল আসতে না পারায় সর্বপ্রথম সে ফয়জানের কাছে ক্ষমা চাইল। অতঃপর অপ্রত্যাশিতভাবে ফয়জানের হাতখানা আকর্ষণ করে সে তার নাড়ীর স্পন্দন পরীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু ফয়জান হালকা টান দিয়ে তার হাতটা ছাড়িয়ে নিল। ফয়জানের এই অনাকাঙ্খিত ব্যবহারে ইয়াসমীন হতভম্ব হয়ে পড়ল। সে কিছুটা বিস্ময়ের সাথে তারদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"ফয়জান কি ব্যাপার? ভালো তো?" তার চোখ দু'টি বিস্ফারিত।

"কিছুনা-কিছু না-।" ফয়জান মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে উত্তর দিল। এছাড়া সে আর কিই বা উত্তর দিতে পারে।

তার তো ইচ্ছে করছিল ইয়াসমীনকে আচ্ছামত শুনাতে, তার ভিতরে আগুনের যে লাভা পাকখাচ্ছিল তার বিস্ফোরণ ঘটাতে। কিন্তু সে চুপ থাকাটাই শ্রেয় মনে করল। মনের ভিতর যে কথাটি তোলপাড় করছিল, তা মুখে প্রকাশ না করা ফয়জানের পক্ষে একটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কিন্তু, আজ এই প্রথমবার সে অনুভব করতে পেলো যে, জীবনে কখনো মানুষকে কুট কৌশলেরও আশ্রয় নিতে হয়।

সে ইয়াসমীনের কাছে কোন ধরনের অভিযোগ করলো না এবং তাকে এ কথাটিও জানালো না যে, সে গত রাতে তার কামরায় উঁকি মেরে তার আসল রূপ দেখে ফেলেছে।

ইয়াসমীন অনেকক্ষণ ধরে তার কাছে বসে রইল। সে ফয়জানের মধ্যে আজ কেমন যেন একটা বিমুখ ও অনীহা ভাব লক্ষ্য করছিল। সে অনেক চেষ্টা করলো ফয়জানের মনের হাবভাবটা বুঝার জন্য। কিন্তু সে কৃতকার্য হতে পারল না। ফয়জান যে এত গভীর হবে, ঘুর্ণাক্ষরেও সে ভাবেনি।

দুপুরের খানা সে ফয়জানের রুমেই আনালো। ইয়াসমীনের অনেক বলা সাধার পর ফয়জান দু-চারটি লোকমা গলাধকরণ করলো।

কিন্তু তার মনে হচ্ছিল, যেন সে বিষ খাচ্ছে। ফয়জানের এধরনের অনীহা ব্যবহারে ইয়াসমীনের মনটা একেবারে ভেঙ্গে গেল। তার ক্ষুধা উবে গেল, সে কিছু খেলো না।

বিকাল হলে ফয়জান বিশ্রাম নিতে হবে বাহানা করে ইয়াসমীনকে সেখান থেকে চলে যেতে বলল। এখন তার কাছে ইয়াসমীনের অস্তিত্বটা কেমন যেন ঘৃণার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। ইয়াসমীন বিষন্ন মনে ফয়জানের কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

।। ১৩ ।।

অনেক রাত পর্যন্ত পালাক্রমে তার স্বজাতি ছাত্র সঙ্গীরা তার সেবা শুশ্রূষা করতে এলো। কিন্তু এ কথাটি কেউ জানতে পারলো না যে, এই আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন আফগান সন্তান কোন্ রোগে, কোন্ অভিমানে জ্বলে পুড়ে ছার-খার হয়ে যাচ্ছে? কি ব্যাধি, কি ব্যথা তার?

লোকেরা রীতি অনুযায়ী তার পরিচর্যা করে যাচ্ছিল। ইয়াসমীনও দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তার শিয়রে বসা ছিল। ফয়জানের অনীহা ভাব তাকে যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। তাকে বড়ই বিচলিত মনে হচ্ছিল।

একটা চিন্তায়ই সে বেশী টেনশনে ভুগছিল। তাহলো এই যে, ফয়জান মন খুলে কেন কথা বলছে না? তার মনে অবশ্যই এমন কথা রয়েছে যা সে মুখে আনতে সংকোচ বোধ করছে।

দু-দিনের মধ্যে ফয়জান অনেকটা নরমাল হয়ে এলো। এ সময়ের মধ্যে ইয়াসমীন ছায়ার মত তাকে চিমটে ধরে রাখে। সে ফয়জানকে সব ধরনের মনতুষ্টি করতে চাইল। কিন্তু সে অনুভব করতে পারল যে, এখন সে আর পূর্বের ফয়জান থাকেনি। সে বদলে গেছে। তৃতীয় দিন ফয়জান যখন ইউনিভার্সিটি গেল, তখন সে লক্ষ্য করল যে, একজন প্রফেসর তার ব্যাপার নিয়ে বিশেষ ভাবে মাথা ঘামাচ্ছেন। পিরিয়ড শেষ হলে সেই প্রফেসর ফয়জানকে নিজের সঙ্গে নিয়ে ইউনিভার্সিটির একটি মাঠে চলে গেলেন।

প্রফেসর ফয়জানের সঙ্গে আপন হওয়ার চেষ্টা করলেন। তিনি তার সঙ্গে এমন ভাবে সহমর্মিতা ও সমবেদনা প্রকাশ করতে লাগলেন, মনে হল যেন এ দুনিয়াতে ফয়জানের জন্য তার চেয়ে বড় আর কোন হিতাকাংখী নেই। ফয়জান এখন তো আর বাচ্চা রয়নি। সে এখন থেকে নিজের বিবেক ও অন্তর্দৃষ্টিকে কখনো বন্ধ হতে দেয়নি। বিশেষ করে ইয়াসমীনের সেই নোংরা অবস্থা দেখার পর তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, তার জাতি কোন গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হতে যাচ্ছে। এখন থেকে সে নিজের চোখ-কান খোলা রাখতে শুরু করেছে।

প্রফেসর প্রথমে ফয়জানের কুশলাদী জিজ্ঞেস করলেন। তার শারীরিক অবস্থা জানলেন। অতঃপর কথা-বার্তার মধ্য দিয়ে ব্যাপারটি আঁচ করতে চেষ্টা করলেন যে, ফয়জানের মানসিক অবস্থা কি! সে কি ভাবছে!

তবে ফয়জান নিজের কোন ব্যবহার কিংবা কথা দ্বারা প্রফেসরকে কোন ধরনের সন্দেহের সূত্র দিতে প্রস্তুত ছিল না। প্রফেসর তাকে বুঝালেন যে, সত্যিকার কমরেড নিজের কোন শারীরিক কিংবা সামাজিক অসুবিধাকে অসুবিধা মনে করে না এবং সে মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে প্রতিষ্ঠা ও সফল করার জন্য সবধরনের আত্মত্যাগে প্রস্তুত থাকে। ফয়জানও কম ঘাগু ছিল না, সে প্রফেসরের সব কথায় সায় দিয়ে যাচ্ছিল, ইয়েস স্যার, জি স্যার বলে।

দুপুরের ছুটির পর ফয়জান ক্লাশ রুম থেকে বেরিয়ে এলো। মেসে খানা খেয়ে সে কামরার দিকে এলো না। সে জানতো যে, খানিক পরেই ইয়াসমীন তার রুমে সাক্ষাত করতে আসবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে আটকে রাখবে।

ফয়জান হোস্টেলেরই এক কোণে ফিট করা টেলিফোন বোথের দিকে পা বাড়ালো। সে ভিলেনতিনার নাম্বার ডায়েল করলো। তার আনন্দের সীমা রইল না, যখন অন্যদিক থেকে ভিলেনতিনাই স্বয়ং ফোন ধরলো। সেও ফয়জানের কণ্ঠশুনে আনন্দে আত্মহারা। ফয়জান তাকে শুধু একথাটি জিজ্ঞেস করল যে, আজ সে অবসর আছে কি না!

জবাবে ভিলেনতিনা তাকে ইউনিভার্সিটির বাইরে সড়কের সেই স্থানটিতে অপেক্ষা করতে বলল, যেখানে সে কিছুদিন পূর্বে তাকে ড্রপ করেছিল।

ভিলেনতিনার এই উদারতায় সে প্রভাবিত না হয়ে পারল না। সে চাইলো ভিলেনতিনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে। কিন্তু সেই অবকাশ সে পেলো না। কারণ, অন্যদিক থেকে "ওকে" বলে ভিলেনতিনা টেলিফোনটি রেখে দিয়েছিল।

।। ১৪ ।।

ফয়জান উগলু স্বীয় হৃদয়ের স্পন্দনকে সংযত করে সড়কের সেই মোড়টিতে পৌঁছল। সে অপেক্ষা করছে, বেশী দেরী হয়নি, সে দূর থেকে ভিলেনতিনার কারটিকে আসতে দেখল। রেড কালারের ওই ছোট্ট কারটি ফয়জানের মনের পর্দায় সুস্পষ্ট ভাসছিল।

ফয়জান নিজেকে প্রস্তুত করে নিল এবং সে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল, যাতে তাকে স্বাভাবিক দেখা যায়।

সড়কে হালকা-পাতলা দু-একটি কারই দেখা যেত। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত এখানে গাড়ীর অধিক্য ছিল না। ভিলেনতিনারও ব্যক্তিগত কোন কার ছিল না। সে পূর্বে ফয়জানকে বলেছিল যে, এই কারটি তাকে রুশ এয়ারলাইনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। ভিলেনতিনা তার কাছে পৌঁছে গাড়ী দাঁড় করালো। সে তার বরাবর সামনের আসনের দরজাটি খুলে দিল। ফয়জান আসনে বসতে গেলে ভিলেনতিনা তার দিকে ঝুকে স্বীয় হাত খানা বাড়িয়ে দিল ফয়জানের সঙ্গে করমর্দন করার জন্য। হঠাৎ সামনের দিকে নুইয়ে পড়ার কারণে ভিলেনতিনার বক্ষের সুন্দর স্থানটি উদ্ভাসিত হয়ে গেল। এ ঘটনাটি এতই অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটে গেল যে, ফয়জানের অন্তরকে চরম ভাবে আন্দোলিত করে তুলল। ফয়জান সীটে বসে গাড়ীর দরজা বন্ধ করল। কিন্তু সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভিলেনতিনার মন ভোলানো "সৌন্দর্য্য" ও মন মাতানো দর্শনকে অনুভব করতে লাগল।

"কেমন আছো, মিস্টার ফয়জান?!" ভিলেনতিনা তার দিকে ঈষৎ হেসে জিজ্ঞেস করল। তার চতুর দৃষ্টি ফয়জানের চেহারার ওঠা-নামা রঙগুলো ভালভাবে ধরতে পারছিল। সে ভালভাবে অনুমান করতে পারল যে, তার প্রথম আক্রমণ ফয়জানের মধ্যে গভীর রেখাপাত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

"হ্যাঁ, খুব ভাল!" ফয়জান সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে একবার ঢোক গিলল।

"তোমাকে ধন্যবাদ যে, তুমি আমাকে স্মরণ রেখেছো।" ভিলেনতিনা এবার অনেকটা ফ্রি হয়ে তার কাঁধের উপর নিজের কোমল সুন্দর হাতখানা রেখে বলল।

ফয়জান তার হাতের পরশে কেঁপে উঠল। সে এর পূর্বেও ভিলেনতিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল। কিন্তু আজ কেন জানি তার কাছে ভিলেনতিনা পূর্বের তুলনায় বেশী সুশ্রী ও খুবসুরত মনে হচ্ছিল। যদিও সে কোন অশ্লীল পোশাক পরিধান করেনি। তবুও ফয়জান কয়েকবার আড়চোখে তার দৈহিক গঠনকে চুপে চুপে যাচাই করল । সে যতবার তার দিকে তাকালো, তার স্নায়ু যেন ততই উষ্ণ ও চঞ্চল হতে লাগল। তার ভিতর কে যেন আগুন লাগিয়ে দিল।

ফয়জান মনে করছিল যে, ভিলেনতিনা হয়ত তার এই লুকোচুরিকে ধরতে পারেনি। কিন্তু সরল পাঠান বাচ্চা এখনো বুঝতে পারেনি যে, তার পালা কেজিবির একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্পাই এর সাথে। ভিলেনতিনা কার চালাতে চালাতে যখন ফয়জানের কাঁধের উপর হাত রাখলো, তখন সে অনুভব করল যেমন ভিলেনতিনার হাত থেকে বিদ্যুত তরঙ্গ বের হয়ে তার শরীরের ভিতর ঢুকে পড়ছে। ভিলেনতিনার সান্নিধ্যের ছোয়ায় ফয়জানের হৃদয়টা মারাত্মক রূপে স্পন্দিত হচ্ছিল।

হঠাৎ সামনে দিয়ে একটি ট্রাক আসতে দেখে ভিলেনতিনা স্টৈয়ারিংকে উভয় হাত দিয়ে কন্ট্রোল করে নিল। এক্সিডেন্ট হতে হতে বেঁচে গেল। ফয়জানও বেজায় ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সে প্রশান্তির হাঁফ ছাড়ল।

"ফয়জান! তোমার কি খেয়াল, আজ আমার বাসায় বেড়ালে কেমন হয়?" ভিলেনতিনা তার দিকে মন আহতকারী দৃষ্টি হেনে বলল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ; ভালই হয়, ঠিক আছে, চলো।" ফয়জান ভিলেনতিনার প্রস্তাবে আনন্দে সায় দিল।

ভিলেনতিনা বাসার গেইটের সামনে গাড়ী থামিয়ে ফয়জানের দিকে ভরপুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। ভিলেনতিনার চাহনি এই পাঠান যুবককে ধরাশায়ী করে ফেলল। তার ইচ্ছে করছিল, এই রাশিয়ান সুন্দরীর চোখের যাদুতে এ ভাবে ডুবে থাকতে।

"এসো", ভিলেনতিনা গাড়ীর ইঞ্জিন বন্ধ করে গাড়ীর দরজা খুলে বাইরে এসে তাকেও বাইরে আসতে বলল। ফয়জান সম্মোহিত ব্যক্তির মত সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো। সে ভিলেনতিনার পিছনে পিছনে চলে ঘরে প্রবেশ করল। সেখানে আর কেউ ছিল না। ভিলেনতিনা ফয়জানের জন্য সুস্বাদু চা বানিয়ে আনলো। তারা দুজন অনেকক্ষণ পর্যন্ত সামনা সামনি বসে বিভিন্ন ব্যাপারে আলাপ করছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এবারও ভিলেনতিনা ফয়জানের সঙ্গে "কমিউনিজম বিপ্লব ও তার আদর্শ" সম্পর্কে কোন আলোচনা করল না। ভিলেনতিনা নিজের অঙ্গ-ভঙ্গী দ্বারা ফয়জানের মধ্যে উত্তেজনার আগুন বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

ফয়জান আরেকবার ঠিক সেই ধরনের প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলছিল, যেমন এর পূর্বে ইয়াসমীনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তে হয়েছিল। এধরনের প্রেমাসক্তি এক সময় সে ইয়াসমীনের বেলায়ও অনুভব করেছিল এবং সে খোলাখুলি ভাবে তার সামনে ভালবাসার কথা ব্যক্তও করেছিল। কিন্তু এখন সে এই ব্যাপারে সর্তক থাকতে চায়, কারণ সে ভাল করেই জানতো যে, রাশিয়ান মেয়ে কোন বিদেশীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। এটা রাশিয়ার আইন অনুযায়ী মুলত নিষিদ্ধ। তবুও অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার হৃদয়ের মাঝে প্রেমাসক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল।

সে মনে মনে ইচ্ছে পোষণ করছিল, যে ভাবেই হোক না কেন, সে ভিলেনতিনাকে জালালাবাদে নিয়ে যাবে। বাস্তবিক পক্ষেও ভিলেনতিনার মত এত সুন্দরী মেয়ে পাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার।

।। ১৫ ।।

ভিলেনতিনা আজও ফয়জানের কাছে তাদের বাড়ী, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও নিজের এলাকা সম্পর্কে অনেক কিছু বলল। হঠাৎ ভিলেনতিনার একটি কথা ফয়জানকে মারাত্মকভাবে স্তম্ভিত করে ফেলল।

"ফয়জান!" ভিলেনতিনা নিজের জায়গা থেকে ওঠে ফয়জানের একেবারে শরীর ঘেঁষে সোফার উপর বসল। সে ফয়জানের চিবুকের নীচে হাত রেখে তারমুখ খানা উপর দিকে উঠালো। ভিলেনতিনার চোখ দুটো পানিতে ছলছল করছিল। ভিলেনতিনার অবস্থা দেখে ফয়জানের মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

"ফয়জান!" তুমি আমাকে তোমার দেশে নিয়ে চলো। আমি রাশিয়াতে থাকতে চাই না। হায়, আমি যদি তোমার দেশ আফগানিস্তান যেতে পারতাম, আমি চাই, এখান থেকে অনেক দূরে তোমাদের পল্লীতে চলে যেতে, যেখানে তোমার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে। সেখানে গিয়ে আমি সেই সব পাহাড়ের কোলে বকরী, দুম্বা চরাবো, যেখানে তুমি কোন এক সময় খেলা-ধূলা করতে। তোমার জন্য আমি নিজ হাতে রান্নাকরে খানা পাকাবো। তোমার কাপড় ধুয়ে দেবো, তোমার খেদমত ও পরিচর্যা করবো।"

প্রবল আবেগে তার কণ্ঠ বন্ধ হয়ে এলো। সে আর কিছু বলতে পারল না। দু ফোটা অশ্রু তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল, যা মোতির মত চমক সৃষ্টি করছিল।

তার কণ্ঠ কাঁপছিল। প্রথমতো সে স্বীয় কামিজের আস্তিন দিয়ে চোখের অশ্রু মুছে নিল। অতঃপর "ক্ষমা করবে" বলে হঠাৎ উঠে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। ফয়জানের কলিজাটা টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল।

সে পুরুষ ছিল এবং এভাবে চোখের পানি ফেলাকে সে কাপুরুষের কাজ ভাবতো। তা না হলে সে যে নিজেও কেঁদে ফেলতো, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। ফয়জান তখন একরকম শপথই করে ফেললো যে, সে অবশ্যই অবশ্যই ভিলেনতিনাকে নিজের সঙ্গে করে জালালাবাদ নিয়ে যাবে, যে ভাবে হোক সে এটা অবশ্যই করবে।

অন্যদিকে ভিলেনতিনা বাথরুমে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিল যে, আজ যে অভিনয়টা সে করল, এটা যেন অভিনয় নয়, বরং বাস্তব কথাটাই তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। জীবনে এই প্রথমবার অভিনয়কে বাস্তব সত্য বলে মনে হচ্ছিল।

তবে কি সে নিজেকে একজন নারী ভাবতে শুরু করেছে? একথা চিন্তা করতেই ভিলেনতিনার মধ্যে একটা অজানা ভয় শিহরণ খেয়ে উঠলো।

।। ১৬ ।।

ফয়জান সে দিন ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ভিলেনতিনার বাসা থেকে ফিরে এসেছিল। ভিলেনতিনার গাড়ীতে বসে সে ভাবছিল, অবশেষে সে কেন এত

দুর্বল হয়ে গেছে যে, এখন এই রাশিয়ান যুবতীটি তার মন ও মস্তিস্কের উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে? ফয়জানের সাথে ড্রাইভারের আসনে বসে ভিলেনতিনাও ঠিক একই ধরনের ভাবনায় ছিল বিভোর। সে ভাবছিল যে, আজ হঠাৎ করে কেন একজন দুশ্চরিত্রা ও বেহায়া প্রকৃতির যুবতী নিজেকে সতী পূত-পবিত্র মেয়ের মত ভাবতে শুরু করেছে।

অবশ্যই এ যুবকটির মধ্যে এমন কিছু ব্যাপার, রহস্যময় শক্তি ও আকর্ষণ রয়েছে। আর এ কারণেই তো কে জি বি (K.G.B) তার পিছনে উঠে পড়ে লেগেছে। ভিলেনতিনার চেয়ে একথাটি আর কে ভাল করে জানে যে, কেজিবি যার পিছনে একবার লেগে যায়, সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

ফয়জানের চোখ দুটো ছিল বালকের মত অনুসন্ধিৎসু ও চমকদার। ভিলেনতিনা অনুভব করতে পারছিল, যেন তার এই যাদুময়ী চোখ দুটো তার হৃদয়ের গভীরে ঢুকে পড়ছে। ফয়জানের কাছে বসে তার অতীত দিনগুলো মনে পড়ছিল।

তার মা একটি স্কুলের টিচার ছিলেন। বাবা ছিলেন একটি রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার। তাদের দিনগুলো কত শান্তিতে অতিবাহিত হচ্ছিল। কত সুখময় জীবন ছিল তাদের। একদিন তার বাবা ঘরে এলেন। ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে কি যেন বলে যাচ্ছিলেন। গভীর রাত পর্যন্ত মা-বাবা কি সব ব্যাপার নিয়ে কথা-বার্তা বলছিলেন। ঐ ঘটনার তিনদিন পর ভিলেনতিনা যখন কলেজ থেকে ঘরে ফিরলো, সে জানতে পেলো যে, পুলিশরা তার বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে। তার মার চোখ দুটো কাঁদতে কাঁদতে ফুলে গিয়েছিল। আম্মা বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। এর কিছু দিন পর রাতের বেলায় বেশ কয়েকজন লোক তাদের ঘরে এলো। তারা তার মাকে আলাদা একটি স্থানে নিয়ে কি সব কথা বলল। তার মা তার কাছে এসে বলল।

"ভিলেনতিনা বেটী আমার! যদি তুমি তোমার বাবার জীবন চাও, তাহলে তুমি এদের সাথে চলে যাও। তারা তোমাকে যে ধরনের ফরমায়েশ করুক, তা তুমি পালন করবে।" এ কথাগুলো বলার সময় মার চেহারাতে বিষন্নতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

জীবন্ত পাহাড়ের সন্তান

ভিলেনতিনাকে এসব লোকেরা রুশ এয়ারলাইন "এরোফ্লোটে" ভর্তি করালো। এয়ার হোস্টেস হিসেবে তার নিয়োগ দান করা হল। কেজিবি'র একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তার ট্রেনিং হয়। তার পেশাগত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে সে কেজিবি'র একজন গোয়েন্দা হিসেবে তাকে কি কি কাজ করতে হবে এবং কি উপায়ে তা করতে হবে সব কিছু বুঝিয়ে দেওয়ার পর তাকে ডিউটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

প্রথম প্রথম ভিলেনতিনার পক্ষে কেজিবি'র চাকুরী খুবই অস্বস্তিকর মনে হয়েছিল। কারণ, এখানে তার সতীত্ব পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হচ্ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তার কাছে সবই স্বাভাবিক হয়ে এলো। কারণ, এছাড়া উপায়ও ছিল না। তার মনে হতে লাগল যেন এগুলো তার দৈনন্দিন জীবনেরই একটা অংশ। এরি মাঝে তার বিশেষ সেবা'র স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে তার বাবার সাথে তিন-চারবার সাক্ষাৎ করার সুযোগ দেওয়া হয়।

যখন প্রথমবার তার বাবাকে তার সাথে দেখা করার জন্য মস্কো আনা হয়, তখন ভিলেনতিনা তার বাবাকে চিনতেই পারছিল না। তার স্বাস্থ্যবান বাবা শুকিয়ে কংকাল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল এই যে, কেজিবি'র কর্মকর্তাদের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি উভয় অবস্থাতেই তার বাবা ভিলেনতিনার কাছে সরকারী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোন ধরনের অভিযোগ করল না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল যে, সে তার অবস্থার উপর সন্তুষ্ট রয়েছে।

তখন সে ভিলেনতিনাকে লক্ষ্য করে বলেছিল যে, বুর্জোয়াদের রেডিও প্রোগ্রাম শ্রবণ করার দরুন তার ব্রেন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সে বিপথগামী হয়ে পড়েছিল। যার কারণে সে মহান সমাজতন্ত্র আর্দশের বিরুদ্ধে মন্তব্য করতো। এখন তার মস্তিস্ক আবার সঠিক পথে আসতে শুরু করেছে। সে ভিলেনতিনাকে উপদেশ দিল, সে যেন এই মহান বিপ্লবের জন্য সর্বস্ব কুরবানী করে দেয় এবং এ ব্যাপারে কোন ধরনের শৈথিল্য প্রদর্শন না করে। সে সাইবেরিয়াতে খুবই সুখে আছে।

কিন্তু ভিলেনতিনা ভাল করেই বুঝতে পারছিল যে, তার হতভাগা বাবা এসব লোকদের জুলুমের যাঁতাকলে চরম ভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছে। তার ওপর

যে অন্যায় অবিচার চালানো হচ্ছে, কারো বিরুদ্ধে কোন ধরনের প্রতিবাদ করার উপায় নেই তার। সে সর্বদা এ ভয়ে ভীত যে, তার মুখ থেকে বিরোধীতামূলক কোন কথা বের হলে হয়ত তার মেয়ে ও স্ত্রীর ওপর কঠোর শাস্তি আপতিত হতে পারে। কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বিদায় নেওয়ার মুহূর্তেও সে মনের ভাবটা প্রকাশ করতেও ছিল সম্পূর্ণ অপারগ। যখন তার বাবা চলে যাচ্ছিল, তখন সে জোর করে মেয়ের সামনে মৃদু সুরে হাসল। তার এই হাসির মধ্যে কত বেদনা যে লুকায়িত ছিল, তা ভিলেনতিনা ভাল করেই উপলব্ধি করতে পারছিল। অতঃপর তার বাবাকে একটি বদ্ধগাড়ীতে বসিয়ে পুনরায় মহান বিপ্লবের খাতিরে সাইবেরিয়ার বরফঢাকা অঞ্চলের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।

।। ১৭ ।।

সে দিন ভিলেনতিনার বাসা থেকে ইউনিভার্সিটি যাওয়ার সময় তাদের মাঝে বড় জোর দু-তিনটি বাক্য বিনিময় হয়। দুজনের হৃদয়ই ছিল ভারাক্রান্ত। ভিলেনতিনার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার মুহূর্তে ফয়জান তার চোখে মুখে বিষন্নতা ও নৈরাশ্যের যে ছাপ দেখতে পেল, তাতে তার মনের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। তার হৃদয়টা ব্যাকুল হয়ে পড়ল।

ইউনিভার্সিটিতে ফেরার পথে সে খেয়াল করেনি যে, ইয়াসমীন সড়কের পার্শ্বে লাগানো সারিবদ্ধ বৃক্ষের আঁড়ালে দাঁড়িয়ে চুপিসারে ফয়জানকে গাড়ী থেকে নামতে দেখেছে। ইয়াসমীন কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে ফয়জানের পিছু নিয়ে চলতে চলতে তার রুম পর্যন্ত এলো। ফয়জান মস্কোতে আসার পর যথেষ্ট সর্তক হয়ে গিয়েছিল। এত সর্তক যে, নিজের ছায়া থেকে পর্যন্ত সাবধান থাকতো। কিন্তু, আজ ফয়জান এতই আবেগময় হয়ে পড়েছিল যে, সে নিজের আশে পাশে কি হচ্ছে সেদিকে তার মোটেও খেয়াল নেই। ফয়জান তার কামরায় ঢুকেছে দু-তিন মিনিটও হয়নি, ইয়াসমীন তার সামনে এসে হাজির হল।

"তুমি কোথায় গিয়েছিলে? আমি এযাবত তিন বার তোমার রুমে এসে ঘুরে গেছি তোমার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে, কিন্তু তোমার কোন খবর নেই, কোথায় গিয়েছিলে তুমি?"

তার কণ্ঠে উদ্ধত ভাব লক্ষ্য করে পাঠান বাচ্চা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। সে উত্তর দিল ঃ

"দেখো ইয়াসমীন, আমাকে তোমার এধরনের প্রশ্ন করার কোনই অধিকার নেই। আমি কারো গোলাম নই যে, তার নির্দেশ পালন আমার করতে হবে। আমি মোটেও বরদাশত করবো না যে, কেউ খামাখা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুক।"

"কি মতলব তোমার?" ইয়াসমীন তার উত্তর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

সে বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে, ফয়জান তাকে লক্ষ্য করে এ ভাবে কথা বলতে পারে। যে ফয়জান কোন এক সময় তার ইশারায় জান দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত থাকতো, যে তার ভালবাসা হাসিল করার জন্য নিজের ইসলামী আর্দশ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিল। সেই ফয়জানের হাবভাব আজ কেমন কেমন লাগছে!

"তুমি মতলব বুঝতে পারছো না! আমি তো আর অন্য ভাষায় কথা বলছি না। ফার্সী ভাষায় কথা বলছি, যা তোমার মাতৃভাষা।" ফয়জানের কণ্ঠে এখনো পর্যন্ত তর্জনী ভাব।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবই বুঝে ফেলেছি। ঐ পাপিষ্ঠা, বদকার, ব্যভিচারিনী ডাইনী তাহলে তোমার মাথাও খারাপ করে দিয়েছে।" ইয়াসমীন রাগে ও দুঃখে কাঁপতে লাগল। সে ফেটে পড়ল। ফয়জান ইয়াসমীনের উত্তর শুনে চমকে উঠল। সে বুঝে ফেললো যে, ভিলেনতিনার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারটি ইয়াসমীনের কাছে আর গোপন রয়নি।

"দেখো, ইয়াসমীন!" ফয়জান আত্মসংবরণ করে বলল ঃ "তোমার এখন এ ব্যাপারে কোনই গরজ থাকা উচিৎ নয় যে, আমি কি করি, কোথায় যাই, কার সাথে সাক্ষাৎ করি। তোমার জন্য আমার অন্তরে যে সম্মান ও ভালবাসা ছিল, আমার সেই আবেগ সে দিনই মৃত্যুবরণ করেছে, যে দিন আমি তোমাকে তোমার কমরেড বন্ধুদের সাথে শরাব পান করতে এবং অশ্লীল কাজে লিপ্ত হতে দেখেছি। সে দিন থেকে তোমার সেই অসভ্য বিপ্লবী আদর্শ ও চিরদিনের জন্য মৃত্যুবরণ করেছে আমার কাছে। কিন্তু আমি তো তোমার বেহুদা কর্ম দেখেও তোমাকে কখনো ভর্ৎসনা করিনি, উপহাস করিনি, যেমনটি আজ তুমি আমাকে করছো।"

ইয়াসমীন হত বিহবল হয়ে পাগলের মত তার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। এর পর তার চোখ থেকে দরদর করে অশ্রু বের হতে লাগল। ফয়জান আরো কিছু বলার পূর্বেই ইয়াসমীন কাঁদতে কাঁদতে তার কামরা থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।

ফয়জান যথেষ্ট অনুতপ্ত হল যে, সে কেন ইয়াসমীনকে সেই কথাটি বলে দিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আজ নিজেকে অনেকটা স্বাভাবিক ও হালকা অনুভব করছিল। তার মনে হল যেন একটা ভারি বোঝা তার মাথা থেকে নেমে গেছে। কোন একদিন তো এমনটা হওয়ারই ছিল। কিন্তু এ মুহূর্তে, আর এত অপ্রত্যাশিতভাবে এত সব কথা হয়ে যাবে, ফয়জানও তা কল্পনা করেনি।

।। ১৮ ।।

ইয়াসমীনকে এখন নিজের উপরই ঘেন্না লাগছিল। নিজের পালঙ্গের উপর উপুড় হয়ে পড়ে সে অনেক্ষণ পর্যন্ত একা একা ক্রন্দন করল। যখন মনের বোঝা কিছুটা হালকা হল, সে নিজের কর্মের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। আজ ফয়জান তাকে যেসব কথা বলল, সেসব কথাতো তাকে যে কেউ বলতে পারে, সে ধরনের অবকাশ রয়েছে। কারণ, সে প্রগতি প্রেমে এবং কমিউনিজম বিপ্লবের চক্করে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী বেড়ে গিয়েছিল।

সে দিন এই প্রথমবার সে ভাবতে লাগল যে, এটা আবার কোন ধরনের মতবাদ, আদর্শ, যে তার থেকে তার নারীত্ব বোধকে ছিনিয়ে নিতে তৎপর? আমি যেই বিপ্লব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, সেখানে তো নারী এবং তার সতীত্বের কোন বালাই নেই। যেখানে পুরুষ ও নারীরা জীব-জন্তুর ন্যায় যখন ইচ্ছা নির্লজ্জ ভাবে নিজেদের যৌন চাহিদা মিটাচ্ছে। জীবনে এই প্রথমবার তার খোদ নিজের উপর ঘৃণা বোধ হচ্ছিল। এই ঘৃণা অনুভূতি তার ভিতরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছার-খার করে দিচ্ছিল। এ যাবত সে পার্টির নির্দেশে ফয়জানকে আঙ্গুল দিয়ে নাচিয়ে আসছিল। ফয়জানের সঙ্গে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলার পিছনে পার্টিগত চিন্তাধারাই সক্রিয়ভাবে কাজ করেছিল। কিন্তু এখন সে অনুভব করতে পারল যে, সে তো ফয়জানকে ভালবাসতে শুরু করেছে। এই প্রথমবার তার নিজের মধ্যে এই পরিবর্তনটি

সে লক্ষ্য করল। নতুবা গতকাল পর্যন্তও সে তার জীবনের কোন ব্যাপারকে গভীর ভাবে নেয়নি।

কমিউনিজম আদর্শের প্রতি সে প্রভাবিত ও আকৃষ্ট হয়েছিল। তার কারণ ছিল এই যে, সে মনে করতো যে, আফগানিস্তানের প্রগতি ও উন্নতির জন্য সেখানে সমাজতন্ত্র আদর্শ প্রতিষ্ঠা হওয়ার দরকার রয়েছে। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল, অন্য কোন মতলব ছিল না তার।

সে নিজে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। সে দেখতে পায় যে, তার দেশের প্রভাবশালী খান ও সরদাররা নিজেদের চাকর, নওকর ও কর্মচারীদের ইতরপ্রাণী মনে করতো। তাদের সঙ্গে তারা যা-তা ব্যবহার করতো, করতো অন্যায় আচরণ। সাম্য ও ন্যায় বিচার বলতে কোন জিনিস ছিল না। তার দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার দরিদ্রতাও দৈন্যতা দেখে তার অন্তরটা সব সময় ব্যথিত থাকতো।

লাল কভারওয়ালা বইসমূহ, যেগুলো সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আমদানী করা হয়েছিল, অধ্যয়ন করে সে বুঝতে পেরেছিল যে, কমিউনিস্ট ও সোশালিষ্ট বিপ্লব ছাড়া মজদুর, কৃষক ও জনতার ভাগ্য পরির্তন করা সম্ভব নয়।

সরদারী ও সামন্তবাদ প্রথার যাতাকলে নিষ্পেষিত তার দেশের দরিদ্র, দুর্বল ও মুর্খ জনসাধারণের কিসমত বদল করার জন্য সে এই ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু আজ সে প্রথমবার অনুভব করতে পেল যে, সে বিপ্লবের পথে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী আগে বেড়ে গেছে।

যারা সাম্যবাদের ধ্বজাধারী সেই রাশিয়াতে কি সবাই মারসেডিজ কারে ঘুরতে পারছে? সবার কাছে কি কার রয়েছে? সবাই কি এয়ার কন্ডিশনওয়ালা রুমে বিশ্রাম করতে পারছে? সবাই কি সুস্বাদু ও উন্নত মানের খাবার খেতে পারছে? সবাই কি উন্নত মানের কাপড় পরিধান করতে পারছে? এখানে কি বাস্তবিক পক্ষে সাম্য ও ন্যায় ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে? তার একটাই জবাব হচ্ছে, আর তা হচ্ছে "না।" তার দেশের মত এখানেও সেই একই অবস্থা বিরাজ করছে। শাসক গোষ্ঠী ও বড় অফিসার কর্মকর্তারাই রাষ্ট্রের পুরোপুরি সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে। সাধারণ কর্মচারীরা সারাটা

দিন মজদুরি করেও এক টুকরো রুটি পাওয়ার আশায় লম্বা লম্বা লাইনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে তাদের অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে। এই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানা বলতে কোন জিনিস নেই। রাষ্ট্রই হচ্ছে সব কিছুর মালিক। কিন্তু সেই রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন আসবাবপত্রের ভোগ করছে কারা? তারা একচ্ছত্র ভাবে ভোগ বিলাস করছে। সাধারণ জনগণ আরাম আয়েশ থেকে বঞ্চিত থাকছে। তাহলে সাম্যবাদ রইল কোথায়? এখানেও তো গরীব ধনী, শাসক শোষিতের পার্থক্যটা স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়। তার কাছে এই প্রথম সাম্যবাদের শ্লোগানটা ভূয়া বলে মনে হল।

রাশিয়া এসে ইয়াসমীন আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করল, তাহলো এই, এখানে প্রতিটি লোকের পিছনে লাগা রয়েছে কে জি বির গোয়েন্দা। যারা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে কোন ধরনের টু শব্দ করে, তাদের মেরে ফেলা হয়, নতুবা সাইবেরিয়ার ভীষণ ঠান্ডা এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মোটকথা, এখানে বাক স্বাধীনতা বলতে কোন জিনিস নেই। যেটা মনুষের জন্ম গত অধিকার।

ইয়াসমীন এখন বুঝতে পারল যে, এই সমাজতন্ত্র আদর্শের জন্য তাকে এতটুকু সামনে বাড়া ঠিক হয়নি। সমাজতন্ত্র আদর্শের মধ্যে অনেক ত্রুটি রয়েছে। তার মধ্যে সব চেয়ে বড় ত্রুটি হচ্ছে যে, এই সিস্টেমের ভিতর নৈতিকতা বোধ, নারীর সতীত্ববোধ, সৃষ্টিকর্তা ও আখেরাতের প্রতি ঈমান, বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সবই হচ্ছে বেকার জিনিস। মানব জীবনে এগুলোর কোনই প্রয়োজন নেই বরং এসব হচ্ছে প্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা। নারীদের রাষ্ট্র যে ভাবে ইচ্ছে ব্যবহার করছে, তাদের ইজ্জত, আবরু নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। এখন সে বুঝতে পারল যে, এই নাস্তিক্য ও জড়বাদী আদর্শের জন্য তার পা বাড়ান ঠিক হয়নি। তাকে আবার পিছনে ফিরে যেতে হবে। সবচেয়ে প্রথম ও প্রধান কথা হচ্ছে যে, সে একজন মুসলমান, খোদা, রসূল ও তাঁর আদর্শে বিশ্বাসী, এরপর সে আফগানী, অতঃপর অন্য কিছু। মুসলমানী ও আফগানী বাদ দিয়ে অন্য কিছু সম্ভব নয়, কক্ষনো সম্ভব নয়। সে একটি দৃঢ় সংকল্প নিয়ে দাঁড়াল এবং বাথরুমের দিকে পা বাড়ালো।

অযু, গোসল করে পাক-পবিত্র হওয়ার পর ইয়াসমীন অনুভব করল যে, একটি ভারী বোঝা তার মাথা থেকে সরে পড়েছে। আজ সে নিজকে হালকা

অনুভব করছিল। ফয়জানকে হারিয়ে যদিও সে অনেক অনুতপ্ত ছিল। কিন্তু, এই ভেবে সে মনে তৃপ্তি পাচ্ছিল যে, সে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টের অন্ধকার থেকে হেদায়েতের উজ্জ্বল পথে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে। সে জন্য সে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার অশেষ শুকরিয়া আদায় করলো।

।। ১৯ ।।

ওই রাতে ইয়াসমীন কমিউনিস্ট পার্টির একটি মিটিংয়ে অংশ গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করল। ডিনারের পর একটি বিশেষ লেকচার শুনার জন্য তাকে আমন্ত্রন করা হয়েছিল। ইয়াসমীন তবিয়ত ভাল না বলে বাহানা করে শুয়ে রইল। একজন কমরেড, যে লেকচার শুনার জন্য অডিটোরিয়ামের দিকে যাচ্ছিল, সে মুক্ত মন নিয়ে ইয়াসমীনের কক্ষে ঢুকলো। উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইয়াসমীনকে সঙ্গে নিয়ে সে মিটিংয়ে যোগদান করবে। সে তাকে ধমক দিয়ে বললঃ "কমরেড! কোন মহিলার রুমে প্রবেশ করার পূর্বে কিছু আদব কায়দা রয়েছে। সেগুলো পালন করার দরকার রয়েছে।" কমরেড অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোরপূর্বক হেসে, "সরি" বললেও তার ভিতরে বড় ধরনের খট্‌কা লাগল। ইয়াসমীনের পক্ষ থেকে হঠাৎ করে তবিয়ত 'ভাল নয়' বাহানা এবং বিশেষ লেকচারে শামিল না হওয়ার সিদ্ধান্ত, আবার তার রুমে ঢুকাতে প্রতিক্রিয়াশীল নীতিকথা এসব কারণে সেই কমরেডের মনে যথেষ্ট সন্দেহের সৃষ্টি হল। সে তার বিপ্লববাদী কর্তব্য পালন করার জন্য ইয়াসমীনের সঙ্গে তার সাক্ষাতের পুরো অবস্থা এবং নিজের কিছু সংশয়ের কথা বিশেষ লেকচার ইনচার্জ প্রফেসরকে জানালো।

প্রফেসর খুব মনোযোগ সহকারে কমরেডের কথা শুনলেন এবং কোন ধরনের মন্তব্য না করে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন।

সকাল বেলায় ইয়াসমীন ইউনিভার্সিটিতে গেল। ক্লাশ শেষ হলে সেই প্রফেসরকে সে তার দিকে আসতে দেখল। ইয়াসমীন এমনিই ইউনিভার্সিটির গ্রাউন্ডে ছায়াদানকারী একটি বৃক্ষের নীচে রাখা বেঞ্চে এসে বসেছিল। সেই প্রফেসরটি খোলা মন নিয়ে তার কাছে এসে বসলেন। প্রফেসর তার হাবভাব দেখে স্পষ্ট ভাবেই বুঝে ফেললেন যে, ইয়াসমীনের মানসিক অবস্থার অনেক

পরিবর্তন ঘটেছে। তার চেহারার রং দেখে স্পষ্ট ভাবেই বুঝা যাচ্ছিল যে, সে প্রফেসরের ফ্রি মাইন্ডে তেমন সন্তুষ্ট হতে পারেনি, যদিও সে মুখ দিয়ে কিছু বলছে না। প্রফেসর ইয়াসমীনের সঙ্গে বিষয় বস্তু ছাড়া কিছু উদ্দেশ্য বিহীন কথা-বার্তা বললেন। তার মেইন উদ্দেশ্য ছিল ইয়াসমীনের বর্তমান ভাবনা সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা। তিনি জেনে শুনে কাল লেকচারে সে কেন যোগ দিল না, এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন না করে এদিক ওদিককার কথা বললেন। তিনি কথাবার্তার ভিতরেই অনুমান করতে সক্ষম হলেন যে, এই শিকারটিও তাদের হাত ছাড়া হয়ে গেছে। প্রফেসরের জিজ্ঞেস করা ছাড়াই ইয়াসমীন নিজের থেকে কালকের মিটিংয়ে শরীক না হওয়ার জন্য তার অসুস্থতার ওজর পেশ করল। প্রফেসর ও তার ওজরকে আপাতদৃষ্টিতে গ্রহণ করলেন। কিন্তু তিনি তো বুঝেই ফেলেছেন যে, এটা ইয়াসমীনের নিছক টালবাহানা বৈ অন্য কিছু নয়। তিনি ইয়াসমীনকে আর কিছু বললেন না। তাকে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে এবং তার শুভ কামনা করে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

প্রফেসর সন্ধ্যার পূর্বেই ইয়াসমীনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট ইনচার্জ মাষ্টারের কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন। অনেক রাত পর্যন্ত তারা ইয়াসমীনের ভাগ্যের ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হলেন। তারা এই খুবসুরত শিকারটিকে কোন মতেই নষ্ট করতে প্রস্তুত ছিলেন না। যদি এই শিকারটি তাদের হাত ছাড়া হয়ে যায়, তাহলে তাদের নতুন করে আবার পরিশ্রম করে তার স্থান পূরণ করার জন্য আরেকজনকে তালাশ করতে হবে।

কে জি বি'র কর্মকর্তারা তাকে ব্ল্যাকমেইল করে নিজেদের অনুগত রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। এখন তারা নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্ল্যাকমেইল স্টাফ তরতীব দিতে লাগলেন। নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কে জি বি কি কি করতে পারে, এ ব্যাপারে ইয়াসমীন কখনো ভেবে দেখেনি।

বিবেকের আহ্বান

অপ্রত্যাশিত ভাবে রাত দুপুরে ভিলেনতিনার ফোনটি বেজে ওঠল। ফোনের কিরিং কিরিং শব্দ শুনে ভিলেনতিনার বুকটা ধুক্ ধুক্ করে ওঠল। আজ তার মোটেও ঘুম আসছিল না।

পার্শ্ব পরিবর্তন করা ছাড়া তার করার কিছুই ছিল না। ফোন হঠাৎ বেজে ওঠায় তার ধমনীতে বিদ্যুত খেলে গেল। মস্তিস্কে প্রচন্ড ঝটকা খেল। সে কেঁপে ওঠল। এ ব্যাপারে তো সে নিশ্চিত ছিল যে, ফোন কে জি বি'র পক্ষ থেকেই এসে থাকবে, কিন্তু কেন? এই অসময়ে ফোন করার কি কারণ থাকতে পারে?

সে পরক্ষণেই ভাবতে লাগল, কাল ফয়জানের এখানে আসার পর থেকে তার মধ্যে যে পরিবর্তনের একটা হাওয়া বইতে শুরু করেছে, সে ব্যাপারে কি কে জি বি কিছু টের পেয়ে গেছে? কে জি বি'র পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। সে এমন অনেক ব্যাপারে শুনেছে এবং দেখেছে, যাদের অন্তরে কমিউনিজম আদর্শের ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয়েছে, সেই খবরটি কে জি বি'র হয়ে গেছে। পরবর্তীতে তাদের যেই পরিণতি হয়েছে, সে কথা কল্পনা করে ভিলেনতিনার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠল।

"হ্যালো কমরেড!" তার কন্ঠ কাঁপছিল।

"এখনো পর্যন্ত জেগে আছো?" অন্যদিক থেকে ভেসে আসা কন্ঠটি ভিলেনতিনা হাজারের মধ্যেও চিনতে পারতো। ভিলেনতিনার শরীর শিহরণ খেয়ে ওঠল। বাস্তবেও তো সে এখন পর্যন্ত জেগে আছে। ব্যাপারটি ছিল তার অভ্যাস থেকে ব্যতিক্রম। কে জি বি'র কাছে অভ্যাস বিপরীত কাজও অন্যায় ও অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং সে ব্যাপারে তাদের কাছে জবাবদিহিও করতে হয়।

"স্যার, আজ পেটটি খারাপ। রাতের খানা খাওয়ার পর হতেই পেটে ব্যথা করছে।" ভিলেনতিনা যথাসাধ্য চেষ্টা করে নিজের কণ্ঠ স্বাভাবিক রাখার জন্য।

"ঔষধ ব্যবহার করলে তো পারতে।" অন্যদিক থেকে কিছুটা সহানুভূতি প্রকাশ করা হল। কিন্তু তার কণ্ঠে বিস্বাদ ভাবও লক্ষ্য করা যাচ্ছিল।

"খানিক পূর্বে ঔষধ খেয়ে নিয়েছি, স্যার!"

"ঠিক আছে, তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও। কিছুক্ষণের মধ্যে একজন লোক আসবে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।" এই নির্দেশ দিয়ে অন্য দিক থেকে ফোন রেখে দেয়া হল।

রিসিভার রেখেই ভিলেনতিনা লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে নীচে নেমে এলো। এত শীতের ভিতরেও তার শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে গেল। সে নিজের অবস্থা নরম্যাল করার জন্য ভদকার একটি জাম প্রস্তুত করল এবং এক নিঃশ্বাসে গলার মধ্যে ঢেলে দিল। শরাব পান করে সে তার হারানো সাহসকে গুছিয়ে নিতে কিছুটা সক্ষম হল। যখন সে তার হাত মুখ ধুয়ে কাপড় পরির্তন করছিল, তৎক্ষণ পর্যন্ত সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে এলো। নিজ কামরায় রাখা একটি আরাম কেদারায় বসে সে একজন আগন্তকের অপেক্ষা করছিল। পনের-বিশ মিনিট অসহনীয় প্রতীক্ষার পর কলিংবেল বেজে ওঠল। ভিলেনতিনা নিজ স্থান থেকে এমন ভাবে ওঠে দাঁড়াল, যেন কোন শক্তিশালী স্প্রীং তাকে শূন্যে ছুড়ে মেরেছে।

বাসার বহির্ভাগ দরজাটি লক করে সে যখন বাইরে পা রাখল, তখন সে বাসার গেটের সামনে একটি গাড়ী দেখতে পেল। গাড়ীটির ভিতরে আলো জ্বলছিল এবং বাইরের সব লাইট নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ভিলেনতিনা আলোর মধ্যে সামনের আসনে একজন পাষাণ চেহারা এবং শক্ত পেশীওয়ালা ড্রাইভারকে দেখতে পেল।

।।২।।

ভিলেনতিনাকে নিয়ে গাড়ীটি এমন একটি দুর্ভেদ্য অট্টালিকার সামনে এসে থামল, যেখানে ইতোপূর্বে আরো কয়েকবার তাকে হাজির হতে

হয়েছে। রুম নং জিরো, জিরো ফাইভ-এর স্বয়ংক্রিয় দরজাটি কোন শব্দ করা ছাড়া একা একা খুলে গেল।

ভিলেনতিনা ভিতরে ঢুকল। কক্ষের ভিতর ক্যাপ্টেন দরজার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়েছিল। তার দৃষ্টি জানালার বাইরে তুষারপাতের উপর নিবদ্ধ ছিল। সে যদিও ভিলেনতিনার পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিল, তবুও সে নিজ পজিশনেই দাঁড়িয়ে রইল, ভিলেনতিনার দিকে ঘুরে তাকিয়ে দেখার কোনই চেষ্টা করল না।

"অনেক বিলম্ব করে ফেলছো, কমরেড!" হঠাৎ ভিলেনতিনার দিকে ঘুরে বলল। তার হিংস্র চোখ দুটো ভিলেনতিনার অন্তরে কাঁটার মত বিধেঁ যাচ্ছিল।

"আমি ....আমি সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি স্যাঁর।" ভিলেনতিনা শুষ্ক গলাটা মুখের লালা দিয়ে ভিজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলো।

"এখনো শুধু চেষ্টাই করে যাচ্ছ?" ক্যাপ্টেনের কণ্ঠে বিদ্রূপ ছাড়াও এমন একটা হুমকি লুকানো ছিল, যার কল্পনা করে ভিলেনতিনার শীরার রক্ত জমে যাচ্ছিল।

"যে প্রকারে হোক এখন এই কেস খতম করে দাও। কাল সন্ধ্যা নাগাদ পর্যন্ত, বুঝতে পারছো কমরেড?" কাপ্টেন হয়ত কম শব্দ বলতে অভ্যস্ত ছিল।

"ঠিক আছে , স্যার!" ভিলেনতিনা তার চোখের হিংস্র চাহনি থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু সফল হল না।

"তুমি ফ্লাটে পৌছার পূর্বেই সেখানে হয়ত সব ধরনের প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়ে থাকবে, বুঝলে তো!" ক্যাপ্টেন কথাগুলো বলে ভিলেনতিনার একেবারে কাছে এসে গেল।

"ইয়েস স্যার!" ভিলেনতিনা বুঝে ফেলেছিল যে, ক্যাপ্টেন কি বলতে চাচ্ছে। তার কাছে এ ধরনের খেলা কোন নতুন বস্তু ছিল না।

"কেবল শেষ কৌশলটি পরীক্ষা করবে আর অবকাশ দিতে প্রস্তুত নই – অকৃতকার্য হলে তাহলে ....।" সে মৃদু হেসে ভিলেনতিনার কাঁধে হাত রাখল । কিন্তু তার মনে হল যেন তার গলায় ছুরি চালানো হচ্ছে। যদি আরো কয়েক মিনিট এমন অবস্থা বহাল থাকতো তাহলে হয়ত সে ভারসাম্য হারিয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়তো। সে মনে মনে কামনা করল, যাতে যত শীঘ্র সম্ভব, এখান থেকে সে মুক্তি পায় ।

"ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পারো।" সে তার হাতখানা ভিলেনতিনার গলার কাছে এনে বড় আশ্চর্য উপায়ে তার পুরো শরীরটাকে কাঁপিয়ে তুললো।

ভিলেনতিনা সাহস সঞ্চার করে দরজার দিকে পা বাড়াল। স্বয়ংক্রিয় দরজাটি একা একা খুলে গেল, সে বাইরে বেরিয়ে এলো। বাইরের আঙ্গিনায় কেউ ছিল না। দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে সে তার বিক্ষিপ্ত শ্বাস-নিঃশ্বাসকে স্বাভাবিক করে নিল। অতঃপর ভারি পদে আঙ্গিনার শেষ মাথা পর্যন্ত পৌঁছল। সেখানে বহিরাগত মেহমানদের বসার জন্য সুন্দর সুন্দর আরামদায়ক সোফা এবং ফুলদানী বড় নিখুঁত রূপে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। সে একটি সোফার উপর বসে হাফাতে লাগল। সে এতই নার্ভাস হয়ে পড়েছিল যে, এখন তার পক্ষে চলাটা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। ক্যাপ্টেন তার উপর যে কাজ সোর্পদ করেছিল, সেটা তার জন্য যদিও নতুন ছিল না এবং তেমন কষ্টদায়কও না, তবুও তার মন সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, সে এই বার অকৃতকার্য হবে এবং তার মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। ব্যর্থতা আর অকৃতকার্যতার পরিণতি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড। সে মৃত্যুদন্ড শব্দটি কয়েকবার আস্তে আস্তে বিড়বিড় করে উচ্চারণও করল।

কে জি বি'র ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি যে, কোন ব্যর্থ ও অকৃতকার্য এজেন্টকে ক্ষমা করেছে!

ব্যর্থ শব্দটি সে মোটেও শুনতে প্রস্তুত নয়।

ফয়জানের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তার সাথে খোলা-মেলা আলাপ করার পর ভিলেনতিনার অনুভূতি অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল।

সে নিজের মধ্যে বিরাট পরির্বতন দেখতে পাচ্ছিল। কে জি বি তে যোগ দেয়ার পর তার নারীত্ববোধ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এখন ধীরে ধীরে তার মধ্যে সেই ছিনিয়ে নেওয়া নারীত্ববোধ ফিরে আসছিল।

ফয়জানের খানিক সান্নিধ্যে সে পুনরায় অনুভব করতে পারছিল যে, সে একজন নারী।

এই অনুভূতি তার থেকে অনেক দিন আগে বিদায় নিয়েছে! কারণ, সে নিজের দেহকে নিজের ভাবতে একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিল।

এমনিতেই রাশিয়াতে জন্ম গ্রহণকারী প্রতিটি কমরেডের জন্মলগ্ন থেকেই তার দেহ এবং আত্মা মহান বিপ্লবের জন্য ওয়াক্‌ফ হয়ে যায়। ভিলেনতিনা এই বাস্তব সত্যটিকে ঐ সময় উপলব্ধি করতে পারল, যখন তার বাবাকে কমিউনিজম বিপরীত মতার্দশ রাখার কারণে তার ব্রেনকে ওয়াশ করার জন্য সাইবেরিয়ার অতিশয় ঠান্ডা এলাকায় নির্বাসিন দেয়া হয়।

তার বাবা একজন বৃদ্ধ মানুষ। জীবনের অনেক কিছুই সে আস্বাদন করে নিয়েছিল। পক্ষান্তরে ভিলেনতিনাকে তো এখনো দীর্ঘ জীবন পাড়ি দিতে হবে, পাহাড় সম জীবন অতিক্রম করতে হবে। আত্মহত্যা করার মত সাহসিকতা তার মধ্যে ছিল না। কিন্তু জীবিত থাকতে চাইলে তার জন্য অপরিহার্য ছিল যে, সে রাষ্ট্রের জন্যই জীবিত থাকবে এবং রাষ্ট্রের জন্যই মরবে।

"কোন খেদমত করতে পারি, মাদাম?" ভিলেনতিনা মারাত্মক ভাবে চমকে ওঠল। তার মোহ ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল, যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি রুম থেকে একজন উর্দিপরা খেদমতগার তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল।

"না------------------ না-------------কিছু লাগবে না। তবে একটু পানি নিয়ে আসতে পারো------------।" ভিলেনতিনার পক্ষে তার বিমুঢ় ভাবটা লুকানো ছিল অসম্ভব ব্যাপার।

"ওকে, মাদাম।" খেদমতগার নত মস্তকে উত্তর দিয়ে যেদিক থেকে এসেছিল সে দিকে চলে গেল।

খেদমতগারটির ঐ সময় বিস্ময়ের সীমা রইল না যখন সে ট্রেতে গ্লাস ও পানির বোতল সাজিয়ে সেখানে এসে দেখল যে, সেখানে মাদামের কোন অস্তিত্ব নেই, সেতো সেখান থেকে উধাও হয়ে গেছে ।

।।৩।।

গাড়িটি অট্রালিকার মেইন গেটের সামনে পার্কিং স্থানেই দাঁড়ানো ছিল। সেই কর্কশ শক্ত পেশিওয়ালা ড্রাইভার স্বীয় আসনে প্রস্তুত হয়ে বসা ছিল। ভিলেনতিনাকে তার দিকে আসতে দেখে ড্রাইভারটি গাড়ীর ভিতরের লাইটগুলো জ্বালিয়ে দিল। অতঃপর সে নীচে এসে ভিলেনতিনার জন্য গাড়ীর

দরজা খুলে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে অর্ধচৈতন্যহীন অবস্থায় নিজের সিটে ধড়াশ করে পড়ে গেল। অতঃপর সে গভীর অচেতনে ডুবে গেল। বেশ সময় পর গাড়ীর হঠাৎ ব্রেক করার কারণে যখন প্রচন্ড ধাক্কা লাগলো, ফলে ভিলেনতিনা জেগে গেল। সে দেখতে পেল যে, গাড়ী তার বাসার গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে সাহস করে উঠে বসল। ড্রাইভার তার জন্য গাড়ীর দরজা খুলে দিল। সে বাইরে বেরিয়ে এলে ড্রাইভার তাকে স্যালুট মেরে সম্মান প্রদর্শন করল। ভিলেনতিনা লম্বা লম্বা পা ফেলে ফ্লাটের দিকে অগ্রসর হলো। সে ফ্লাটের ভিতর বাইরে থেকেই আলো দেখতে পেলো। তখনই সে বুঝে ফেললো যে এরা কারা এবং তারা কি করছে!

সে বাসার দরজা খুললে দু'জন লোককে তার অপেক্ষা রয়েছে বলে জানতে পারলো। তার হঠাৎ আগমনে সেই দুটি লোকের মধ্যে কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো না। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারা এই ঘরেরই সদস্য। তারা রুমের অবস্থাকে যথেষ্ট পরিবর্তন করে ফেলেছিল।

ভিলেনতিনার অভিজ্ঞতার দৃষ্টি অনুমান করে নিয়েছিল যে, তারা এখানে কি কি রদ-বদল করেছে।

"মাদাম!" তাদের মধ্যে হতে একজন বড় আদবের সাথে ভিলেনতিনাকে লক্ষ্য করে বলল ঃ "এদিকে একটু দেখুন।"

সে ভিলেনতিনাকে খিড়কীর সাথে লাগানো সুইচ বোর্ডের কাছে নিয়ে এলো এবং বলল ঃ "ইতোপূর্বে যে সুইচ বটম দিয়ে আপনি ঘরের দরোজার সাথের লাইটটি জ্বালাতেন, এখন তা দিয়ে জ্বালাবেন না। কারণ, আপনি সেই বটম অন্ করলে ক্যামেরা চলতে শুরু করবে। আর হ্যাঁ, মাদাম!" সে অন্য একটি সুইচের দিকে ইশারা করে বলল "আমরা ঘরের বাইরের লাইটটির কানেক্শন এদিকে করে দিয়েছি। আগামীতে আপনি বাইরের বাল্ব জ্বালাতে চাইলে এই বটমকে ব্যবহার করবেন। আমরা আপনার নিত্য ব্যবহারের জিনিসে কিছু রদ-বদল করেছি, এ জন্য দুঃখিত এবং ক্ষমা প্রার্থী, কিন্তু এছাড়া কোন উপায়ও ছিল না।"

"ঠিক আছে, আপনারা এখন যেতে পারেন।" সে ভীষণ ভাবে নিরিবিলি পরিবেশ চাচ্ছিল। এ জন্য তাদের চলে যেতে বলল।

"থ্যাংক ইউ, ম্যাদাম।" উভয়ে বানরের মত দাঁত বের করে নিজ নিজ ব্যাগ হাতে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। এই দুজন ছিল কেজিবি'র দক্ষ মেকানিক। তারা কামরাতে এমন বন্দোবস্ত করে গেল যে, ভিলেনতিনা যদি সেই পুশ বটমের উপর চাপ দেয়, তাহলে রুমের মধ্যে খুব সামান্য ও সুক্ষ ধরনের নড়াচড়া হলেও এখানে লুকানো ক্যামেরাটি সেগুলোর ছবি তুলে ফেলবে।

ভিলেনতিনার জিম্মায় নতুন ডিউটি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যেন সে ফয়জানের সঙ্গে যৌন ও নগ্ন কাজ সম্পাদন করে, সেই লুকানো ক্যামেরা দিয়ে তার ফিল্ম প্রস্তুত করে, যাতে এই অশ্লীল ও নগ্ন ছবি দিয়ে ফয়জানকে ব্ল্যাকমেইল করা যায়!

তাদের কাছে ফয়জানকে বশ্ করার জন্য এটাই সর্বশেষ ও সর্বোত্তম হাতিয়ার ছিল, এছাড়া বিকল্প কোন পন্থা তাদের কাছে ছিল না।

ভিলেনতিনা ইতোপূর্বে যদিও অনেকবার তার উচ্চপদস্থ অফিসারদের নির্দেশে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে অনেক বিদেশী স্টুডেন্ট ও যুবকদের সাথে এ ধরনের যৌন কর্ম সম্পাদন করে তার ভিডিও ফিল্ম তৈয়ার করেছিল, কিন্তু এখন সে সুস্পষ্ট ভাবে অনুভব করতে পারছিল যে, ফয়জানের সঙ্গে এ ধরনের বেহুদা কাজ সম্পাদন করা তার পক্ষে কস্মিনকালেও সম্ভব হবে না।

।। ৪ ।।

পুরো রাত সে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকল। বুড়ো বাবা, ছোট্ট বোন এবং তার মার চেহারা প্রতিবার জিজ্ঞাসা হয়ে তার সামনে ভেসে আসছিল। সে তার অসহায়ত্বের উপর ঝর্‌ঝর্‌ করে চোখের পানি ফেলে যাচ্ছিল।

কিন্তু, কিইবা করার আছে তার! ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তাকে সেই কাজটি করতেই হবে, যা করার জন্য সে দৃঢ় সংকল্প নিয়েছে এবং মানসিক ভাবেও সে পুরোপুরি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

ফয়জান সকাল বেলায় তখনও ইউনিভার্সিটিতে যায়নি। সে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল, তার কাছে ভিলেনতিনার কল এলো। ভিলেনতিনা তাকে লক্ষ্য করে বলল ঃ "ফয়জান! আজ সন্ধ্যায় তুমি আমার বাসায় এসো। অবশ্যই আসবে, ভুলে যেয়ো না আবার।"

ফয়জান কখনো ভিলেনতিনার পক্ষ থেকে এ ধরনের আমন্ত্রণ পায়নি, যদিও সে এ যাবত কয়েকবার তার বাসায় গিয়েছিল। কিন্তু আজ ভিলেনতিনা যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে কোন ভূমিকা ছাড়াই তাকে আসতে বলল এবং অন্য কোন কথা না বলেই ফোন রেখে দিল, তখন ফয়জান ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। তার মাথায় নানা ধরনের প্রশ্ন এসে জট পাকাতে লাগল যে, "আল্লাহ না করুক, ভিলেনতিনা কোন মুসীবতে পড়ল নাকি?" ফয়জান গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। কিন্তু ভেবে চিন্তে কোন কুল কিনার পেলো না। সে চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনেক সেচষ্টা করলো, কিন্তু সফল হল না।

ইউনিভার্সিটি যাওয়ার পথে সে আপ্রাণ চেস্টা করলো, যেন সে ইয়াসমীনের মুখোমুখী না হয়। সে তার প্রচেষ্টায় কামিয়াব হল। ছুটির পর সে কাছেই অবস্থিত একটি থিয়েটারে গিয়ে ঢুকলো। ফয়জান থিয়েটারে খুব কমই যেত। কারণ, এসব থিয়েটারে গঠনমূলক ছবি মোটেও দেখানো হত না। সেখানে দেখা যেতো একটি লাল পতাকা পত্পত্ করে উড়ছে। কামউনিজম বিপ্লবের উপর কিছু গদ বাধা বুলি আওড়ানো হ্ত। এছাড়া রুচি সম্মত তেমন কিছু সে দেখতেও পেতো না এবং শুনতেও পেতো না। একটা বিরুক্তিকর ভাব তার মধ্যে ফুটে ওঠতো।

।।৫।।

ফয়জান সময় মত ভিলেনতিনার বাসায় গিয়ে উপস্থিত হল। সে ভিলেনতিনার অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে গেল। আজকের ভিলেনতিনাকে পূর্বের ভিলেনতিনা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত মনে হচ্ছিল। সে তো ইতোপূর্বে তার সামনে কখনো এধরনের অশ্লীল ও নগ্ন পোশাক পরিধান করেনি, নিজেকে প্রকাশ করার জন্য এত নিকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করেনি। বাসার দরজার সামনে এসে ভিলেনতিনা ফয়জানকে অভ্যর্থনা জানালো মুচকি হাসি দিয়ে, কিন্তু তার এই মুচকি হাসির পশ্চাতে কোন্ ঝড় লুকানো রয়েছে, ফয়জান তা অনুভব করতে পরলো না।

সে তো বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে, বিস্ফারিত চোখে ভিলেনতিনাকে দেখেই যাচ্ছিল।

"কি দেখছো ফয়জান?" ভিলেনতিনা সামনে রাখা একটি কুরসীতে ধপাস করে বসে বলল।

"তোমাকে দেখছি! তোমার কি হয়েছে? তুমি তো.........।"

"হ্যাঁ, ফয়জান, আমি পূর্বে এমনটা ছিলাম না.......এটাই তো তুমি বলতে চাচ্ছো, ঠিক তাই না!" তার কণ্ঠটা ভারী হয়ে এলো।

ফয়জান পরিষ্কার ভাবেই অনুভব করতে পারছিল যে, তার গলাটা আটকে গেছে, কিন্তু তবুও খুবই হিম্মত করে আত্মসংবরণ করে বলল "আমার মোটেই বুঝে আসছে না যে, তোমাদের তথাকথিত উচ্চ আদর্শ এবং মহান বিপ্লবের স্বপ্ন অশ্লীল ও বেহুদা পরিকল্পনা ছাড়া কেন সফল হয় না? এটা কোন ধরনের বিপ্লব? তোমরা বিশ্ববাসীকে কি দিতে চাও? তোমাদের উপর এমন কি আপদ এসে পড়েছে যে, একটা উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য এ ধরনের নিকৃষ্ট ও মানবতা বিরোধী পন্থা অবলম্বন করতে পারো? এ ধরনের ইজম ও বিপ্লব কখনই মহান হতে পারে না, যার আদর্শ মহান নয়। যে আদর্শের ভিত্তি হীনষড়যন্ত্র, কুট কৌশল ও নগ্ন অশ্লীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত, তা কখনো মানব কল্যাণমূলক আদর্শ হতে পারে না। যে আদর্শ মানুষের অন্তরকে জয় করতে পারে না বরং তা বাস্তবায়িত করার জন্য শক্তি ও কুট কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়, সেই আদর্শ কখনো স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না, সেটা নিঃসন্দেহে বিপর্যস্ত হবেই।" ফয়জান উত্তেজনায় ফেটে পড়েছিল। ভিলেনতিনা কিছুই বলতে পারলো না, সে কেঁদে ফেলল। তাকে কাঁদতে দেখে ফয়জান খামোশ হয়ে গেলো। ফয়জান মনে মনে নিজেকে ভৎর্সনা করতে লাগল এবং অনুতপ্ত হলো। কেন তার সামনে এ ধরনের শক্ত কথা বলে ফেললো। সে ভাবল যে, তাকে এত কড়া কথা শুনানো ঠিক হয়নি। কিন্তু ফয়জান নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছিল না। পূর্বে যতবার ভিলেনতিনার সাথে তার দেখা সাক্ষাত হয়েছে, সে সব মুহূর্তে আলাপ কালে ফয়জান কখনো তার মধ্যে তথাকথিত বিপ্লবের গন্ধ পর্যন্ত অনুভব করেনি এবং ইয়াসমীনের মত সে কখনো তার সামনে সমাজতন্ত্রের দর্শন নিয়ে তুমুল যুক্তিতর্ক জুড়ে দেয়নি এবং তার প্রয়াসও চালায়নি। ভিলেনতিনাকে তো একজন সরল মনা মেয়ে মনে হয়েছিল। হঠাৎ তার মধ্যে কেন এই পরিবর্তন দেখা দিল।

ফয়জান তো ছিল পুরুষ । সে ভাল করেই বুঝতো যে, যখন কোন রমনী একজন পুরুষকে নিভৃতভাবে আমন্ত্রণ জানায়, তখন সেই রমনী কি চায় পুরুষটি থেকে। কিন্তু সে কখনো ভিলেনতিনার ব্যাপারে ভাবতে পারেনি যে, সে তাকে যৌন কর্মের দিকে আহ্বান করতে পারে। যা হোক ফয়জানের সামনে এখন সবচে বড় সমস্যা ছিল যে, কিভাবে ভিলেনতিনাকে সে সান্ত্বনা দিবে! ভিলেনতিনা কেঁদে কেঁদে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছিল । ফয়জান এই মনে করে উঠে দাঁড়ালো এবং তার হাতখানা ভিলেনতিনার কাঁধের উপর রাখল যে, হয়তো এভাবে সে কিছুটা সান্ত্বনা পাবে। এছাড়া অন্য কোন পন্থা তার তাৎক্ষণিক চিন্তায় এলো না।

"ফয়জান, তোমার যা মনে চায়, বলতে পার। বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে, তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাত কোন আকস্মিক ব্যাপার ছিল না বরং তা ছিল একটা পরিকল্পনারই অংশ। কিন্তু তোমার সঙ্গে মিশে ও কথা-বার্তা বলে আমি নিজের মধ্যে বেশ একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলাম। আমাকে যে উদ্দেশ্য সামনে রেখে তোমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে বলা হয়েছিল, আমি কেমন যেন আমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরতে শুরু করেছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমি কখনো পূর্বের ভিলেনতিনা হতে পারবো না, যে পূর্বে রাশিয়ার কুখ্যাত কেজিবি গোয়েন্দা ছিল, যার মিশন ছিল ছলে বলে কৌশলে যুবকদের বিপথগামী করা এবং কমিউনিজমের জালে আবদ্ধ করা। এসব এখন আমার কাছে অতীত ইতিহাস। আমি তোমার সান্নিধ্যের পর আমার কমিউনিজম জীবনকে হারিয়ে ফেলেছি। আমি আমার টার্গেটও হারিয়ে ফেলেছি। আমি আমার পূর্বের জীবনে ফিরে যেতে ইচ্ছুকও নই। তবে তার জন্য আমাকে চরম মাশুল দিতে হবে। নিঃসন্দেহে আমার জন্য একটা মর্মান্তিক মৃত্যু অপেক্ষা করছে। কারণ, কেজিবি কখনো তার বিপথগামী এজেন্টদের ক্ষমা করে না।" ভিলেনতিনা অকল্পনীয় সাহস প্রদর্শন করে বলল।

"ভিলেনতিনা! তুমি এসব কি বলছো!" ফয়জান বিস্ময়ে হতবাক। সে বিস্ফারিত নেত্রে ভিলেনতিনার দিকে তাকিয়ে রইল।

"হ্যাঁ,ফয়জান!" ভিলেনতিনা একটা গভীর নিঃশ্বাস ছেড়ে বলতে লাগল, "আমার ইচ্ছে করছে যে, আজ তোমাকে সবকিছুই বলেদিই। আমি চাইনা

যে, জীবনের কোন এক পর্যায়ে তুমি হয়ত ভাবতে পারো যে, আমি একজন সাধারণ মেয়ে ছিলাম। ফয়জান, হায়! যদি তোমাকে বলে দিতে পারতাম যে, আমি কত মারাত্মক রূপে কেজিবির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে রয়েছি।"

"তোমার কথা আমার বোধগম্য হচ্ছে না, ভিলেনতিনা! তুমি কি বলতে চাচ্ছো?" ফয়জান তার দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল।

"হ্যাঁ, ফয়জান! বাস্তবিক পক্ষেই তোমার জন্যে এসব ব্যাপার আশ্চর্যজনক। কেননা, তুমি ....।" ভিলেনতিনা হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। অতঃপর ওঠে দাঁড়িয়ে ত্রস্তপদে খিড়কী পর্যন্ত গেল। জানালা খুলে বাইরে উঁকি মেরে দেখল যে, কেজিবি'র কোন ধরনের নজরদারী চলছে কিনা। সে ধরনের কোন তৎপরতা দেখতে না পেয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়ে পুনরায় নিজ জায়গায় এসে বসল।

"কি ব্যাপার, তুমি এতো পেরেশান কেন হচ্ছো?" ফয়জান ভিলেনতিনার হাবভাব দেখে সত্যিই ঘাবড়ে গেল।

"কিছু না, কিছু না। আমার কিছুটা সন্দেহ হয়েছিল কেজিবি'র নজরদারির ব্যাপারে, সে ধরনের কোন লক্ষণ দেখতে পেলাম না। চিন্তার কোন কারণ নেই। আচ্ছা, তুমি একটু বসো, আমি তোমার জন্য চা বানিয়ে নিয়ে আসি।"

ফয়জান বারণ করা সত্ত্বেও ভিলেনতিনা রান্না ঘরের দিকে পা বাড়ালো আনুমানিক পাঁচ-ছয় মিনিট পর যখন সে কিচেন থেকে ফিরে এলো, তৎক্ষণাৎ সে অশ্লীল ও নগ্ন লেবাস পরিহার করে পূর্ণ ও রুচিসম্মত পোশাক পরিধান করে নিয়েছিল। সে পূর্বের ভিলেনতিনা হয়ে গিয়েছিল। এই পাঁচ-ছয় মিনিট তার জীবনের জন্য একটা মারাত্মক পরীক্ষার মুহূর্ত ছিল। এই ক'মিনিটের ভিতরই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছিল যে, সে কেজিবির নির্দেশ মত কাজ করে ফয়জানের সঙ্গে যৌন কর্ম সম্পাদন করে তার ভিডিও ফিল্ম তৈয়ার করবে, নাকি কেজিবির নির্দেশ উপেক্ষা করে ফয়জানের সঙ্গে সত্যিকার মহব্বতের পরিচয় দেবে। যার পরিণতি মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নয়? সে দ্বিতীয় পথটিই বেছে নেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল এবং পরিণতির কথা চিন্তা না করেই কিচেন থেকে বের হয়ে এলো। তার মধ্যে এখন চরম স্বস্তি বিরাজ করছিল।

তবে ফয়জান এখনো পর্যন্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিল। সে বুঝে কুলিয়ে উঠতে পারছিল না যে, ভিলেনতিনা সম্পর্কে কি ধরনের মনোভাব পোষণ করবে?

"ফয়জান! তুমি কি আমার একটা কথা মানবে?" ভিলেনতিনা এক কাপ চা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে তার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে বলল।

"সেটা আবার কি?"

"ফয়জান! যত শিগগীর সম্ভব তুমি রাশিয়া থেকে চলে যাও।"

"কি মতলব তোমার --- আমার পক্ষে তড়িঘড়ি করে রাশিয়া ছাড়া কি ভাবে সম্ভব?" ফয়জান পেরেশান হয়ে বলল। ভিলেনতিনা "মতলব" বুঝানোর জন্য ফয়জানের কাছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব ব্যাপারগুলো খুলে খুলে ব্যক্ত করলো। একথাটিও বুঝিয়ে বলল যে, আজ কি উদ্দেশ্যে তাকে এখানে ডাকা হয়েছে।

"এর মতলব এই যে, ইয়াসমীনকেও তারা ....।" ফয়জান হতভম্ব হয়ে বলল।

"হ্যাঁ, ফয়জান! তাকেও এই একই উদ্দেশ্য নিয়ে তোমার পিছনে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ইয়াসমীনের ব্যাপারে কেজিবি যথেষ্ট সন্দিহান ছিল যে, হয়ত কোন মুহূর্তে সে তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য থেকে সরে দাঁড়াতে পারে। তারা কোন আফগানী মেয়ের উপর সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। এজন্যই তারা বিশেষ ভাবে আমাকে তোমার পিছনে লাগিয়েছে।"

"এখন তারা তোমার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করবে?"

ফয়জানের এই প্রশ্নে ভিলেনতিনার শরীরে একটা মারাত্মক ধরনের শিহরণ খেয়ে ওঠল। কিন্তু সে তার চেহারায় সেই আতংকভাব প্রকাশ হতে দিল না।

"তুমি আমার ব্যাপারে কোনই চিন্তা করো না। আমি একটা উপায় খুঁজে বের করেই নেবো। কেজিবি কর্তৃপক্ষ আমাকে এতটুকু শাস্তি দিতে পারে যে, আমাকে এখান থেকে অন্য কোন জায়গায় বদলী করে দেবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে তারা যে কোন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি তারা তোমাকে নির্মমভাবে হত্যা করতেও পিছপা হবে না।"

"কিন্তু, আমি ------- ভিলেনতিনা! আমি তোমাকে এভাবে ছেড়ে যাওয়াকে কাপুরুষতা মনে করি। আর কাপুরুষতা পাঠানরা কস্মিনকালেও বরদাশত করতে পারে না। এটা তাদের প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত।"

"আবেগ প্রবণ হয়ো না ফয়জান, ------ আমাদের হাতে এমনিই সময় অনেক কম। অভিজ্ঞতার দিক থেকে বলতে গেলে তুমি এখনো বালকের মত। তুমি অনুমান করতে পারবে না যে, তোমাদের দেশের উপর কিছু দিনের ভিতরেই কত মারাত্মক ধরনের বিভীষিকা নেমে আসবে। তোমাদের দেশ কত মারাত্মক হুমকীর সম্মুখীন।

তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে ফিরে যাও। তোমার দেশের লোকদের সেই হুমকী থেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করো। তাদের সেই আযাব থেকে সর্তক কর, যা তাদের উপর পতিত হতে যাচ্ছে।" ভিলেনতিনা ফয়জানের চেহারার উপর গভীর দৃষ্টি গেড়ে বলল।

।।৬।।

আনুমানিক এক ঘন্টা পর্যন্ত তারা মন খুলে কথাবার্তা বলল। ভিলেনতিনা ফয়জানকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল ঃ

"আমি অতিসত্বর কাবুলে তোমার সঙ্গে সাক্ষাত করবো এবং তোমার সঙ্গে কোথাও চলে যাবো, কে জি বি'র নিয়ন্ত্রনের বাইরে।"

তারা দু'জন পরামর্শ করে একটা পরিকল্পনা তৈরী করে ফেললো যে, ভবিষ্যতে তারা কি করবে। ফয়জন তো নিশ্চিন্ত ছিল যে, এমনই হবে। কিন্তু সে বুঝতে পারেনি যে, ভিলেনতিনা তাকে মাত্র আশ্বস্ত করার জন্য এসব অবাস্তব পরিকল্পনার কথা বলে যাচ্ছে। ভিলেনতিনা আসলে কি করতে যাচ্ছে, যদি ফয়জান ঘুর্ণাক্ষরেও তা টের পেতো, তাহলে ....।

"আচ্ছা, তাহলে এখন যাও। কিন্তু, আমার কথামত অবশ্যই কাজ করবে, এতে বিন্দুমাত্র অবহেলা প্রদর্শন করবে না। বুঝতে পারছো ফয়জান!"

ভিলেনতিনা নিজেকে আত্মসংবরণ করা সত্বেও তার কণ্ঠটা ভারী ভারী মনে হল।

সে ফয়জানকে বিদায় দেওয়ার জন্য দরজা পর্যন্ত এলো। ভিলেনতিনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলল ঃ "কোন কারণবশত আজ আমি তোমাকে ইউনিভার্সিটির হোস্টেল পর্যন্ত ছেড়ে আসতে পারছি না বিধায় আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থী। তুমি উদারমনে আমাকে ক্ষমা করে দিও। তোমার সৃষ্টিকর্তা তোমার প্রতি সহায় হোন।"

ফয়জান দরজার বাইরে গিয়ে ভিলেনতিনার দিকে শেষ বারের মতো তাকালো।

ভিলেনতিনার চোখ দুটো পানিতে ছল ছল করছিল। মনে হচ্ছিল যেন এখনই চোখের আঁসূ প্রবল বেগে গড়িয়ে পড়বে।

"আল্লাহ হাফেজ, ভিলেনতিনা! আমি কখনো তোমায় ভুলবো না। আমি তোমার অপেক্ষায় থাকবো। কাবুল আসতে যেন মোটেও ভুল করো না।" ফয়জানের কথা শেষ হতেই ভিলেনতিনা দরজা বন্ধ করে দিল। এখন সে নিজেকে আর সংবরণ করে রাখতে পারলো না। সোফায় লুটিয়ে পড়ে ছোট্ট শিশুর মত হিচ্‌কী মেরে মেরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

এক সময় হঠাৎ ফোনের ঘন্টা বেজে ওঠলো। তৎক্ষণ পর্যন্ত তার অবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল।

সে তার ওষ্ঠের নিম্নদেশকে রাগের চোটে সজোরে চেপে ধরল। গোশ্বায় সে কড়মড় করছিল। তার মুষ্ঠি বন্ধ হয়ে এলো। ঘৃণার একটা প্রবল লাভা তার ভিতরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছিল। সেই বুযদিল, ভীরু ভিলেনতিনা, যে তার বৃদ্ধ বাবাকে সাইবেরিয়ার প্রচন্ড ঠান্ডা থেকে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে কেজিবি'র হাতের মোমের পুতুল বনে গিয়েছিল, আজ তার মধ্যে সিংহিনীর দৃঢ়তা প্রকাশ পাচ্ছিল। সে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ফোন ওঠালো।

"ইয়েস, আমি ভিলেনতিনাই বলছি।"

"কেমন হলো তোমার অপারেশন?" অন্যদিক থেকে যে কণ্ঠটি ভেসে এলো, সেটা ভিলেনতিনার কাছে কোন অপরিচিত ছিল না।

সে হচ্ছে সেই পাষান্ড জালেম যে তার সর্বনাশের মেইন কারণ। সে-ই তাকে সর্বপ্রথম ব্ল্যাকমইল করে কেজিবি'র জন্য গোয়েন্দাগিরী করতে বাধ্য করেছিল।

"অপারেশন সফল। সবকিছু ঠিক-ঠাক মত সম্পন্ন হয়েছে। আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।" ভিলেনতিনার সুরটা ঝাঁঝাঁলো হতে যাচ্ছিল । কিন্তু বহু কষ্টে সে নিজেকে কন্ট্রোল করে রাখল। একটু অসতর্ক হলে তার পরিকল্পনা গোল্লায় যাবে নিঃসন্দেহে।

"সাবাশ, সাবাশ, তুমি রাষ্ট্রের জন্য, মহান বিপ্লবের জন্য অনেক বড় কৃতীত্ব দেখিয়েছো। আমি হাই কমান্ডের কাছে তোমার জন্য সুপারিশ করবো। অতিসত্বর তোমার বাবাকে ফেরত পাবে। তাকে তোমাদের মাঝে দেখতে পাবে। "

অন্যদিক থেকে আনন্দ, উল্লাস প্রকাশ করা হচ্ছিল।

"স্যার!" ভিলেনতিনাকে আত্মসংবরণ করতে বেশ বেগ পেতে হলো। সে নিজের মধ্যে সাহস সঞ্চার করে কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু অন্যদিক থেকে ভেসে এলো

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ কি বলতে চাচ্ছো, যা মনে চায় অকপটে বলতে পারো, ভিলেনতিনা।"

"স্যার! আমার মনের বড় আশা হল যে, যেই ফিল্মটা প্রস্তুত করতে আমাকে এত কোরবানী ও ত্যাগ শিকার করতে হয়েছে, সেই ফিল্মটা আমি স্বয়ং নিজে গিয়ে "কাউন্সিলে" পেশ করবো,যাতে আমি তাদের কাছে আমার এই খেদমতের বদৌলতে আমার বাবার মুক্তির জন্য আপীল করতে পারি "

"অবশ্যই, অবশ্যই! তোমার মনের আশা অবশ্যই পূরণ করার সুযোগ দেওয়া হবে। তুমি আগামী কাল সকাল আটটায় ব্লক - F তে ফিল্ম সঙ্গে করে চলে এসো। সেখানে আমরা তোমার অপেক্ষা করবো।" অন্যদিক থেকে উত্তর এলো।

"বাহ, স্যার, এজন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। "

অতঃপর লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ।

।।৭।।

ভিলেনতিনা গুপ্ত ক্যামেরা হতে খালি ফিল্মটি বের করে নিজের আয়ত্বে নিয়ে নিয়েছিল।

যে মেকানিকের তত্ত্বাবধায়নে এই ক্যামেরাটি ফিট করা হয়েছিল, ভিলেনতিনা তাকে ফোন করে এসব মেশিনারী গুছিয়ে নিয়ে যেতে বলল। মেকানিকটি এসে চুপে চুপে ক্যামেরা এবং সে সম্পর্কীয় মেশিনারী গুলো গাড়ীতে উঠিয়ে চলে গেল।

সে ভিলেনতিনার কাছে একটি কথাও জিজ্ঞেস করলনা। জিজ্ঞেস করার মত সাহস তার মধ্যে ছিলনা।

মেকানিক সেখান থেকে কেটে পড়তেই সে বাসার ভিতরকার সবগুলো রুমে এক এক করে ডবল লক লাগিয়ে দিল।

সে আজ অনেকদিন পর নিজের একটি বিশেষ ট্রাংক থেকে বাইবেলের সেই নুসখাটি বের করল যেটা তার বাবা এখানে লুকিয়ে রেখেছিল। সে দু-তিন্ ঘন্টা উপাসনা আরাধনা করল। অতঃপর গভীর নিদ্রায় ডুবে গেল। সকাল বেলায় যখন সে ঘুম থেকে জাগ্রত হল, নিজের মধ্যে অনেকটা স্বস্তি বোধ করতে লাগল। সে সময় মত নাশ্‌তা করল। বাইবেল কে চুম্বন করে আদব ও সম্মানের সাথে পুনরায় ট্রাংকে রেখে দিল এবং সেই ট্রাংক থেকে একটি বিশেষ ধরনের বেল্ট বের করল।

ঐ বেল্টটি ব্যবহারে সে ছিল অনেক পারদর্শীনী। রিভালভার এবং বেল্ট ছাড়া আরো কয়েকটি জিনিস তাকে দেওয়া হয়েছিল হাতিয়ার স্বরূপ। এসব বস্তু কেজিবি'র প্রতিটি সদস্যের কাছে থাকা ছিল একান্ত জরুরী।

ভিলেনতিনা যখন তার বাসা থেকে সেই কাউন্সিল উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল, তখন তার মধ্যে কোন ধরনের ভয়,অনুতাপও অনুশোচনা ছিল না। সে যা করতে যাচ্ছিল, সেটা সে বুঝে শুনেই করতে যাচ্ছিল। সে ভাল করেই জানতো যে, কোন না কোনদিন তাকে অবশ্যই এধরনের চরম সিদ্ধান্ত নিতে হবে, দেরীতে হোক, কিংবা তাড়াতাড়ি। কারণ, কেজিবিও রুশ প্রশাসন তার ফ্যামিলীর সাথে এবং তার সাথে যে অন্যায় আচরণ, অবিচার করে যাচ্ছিল এবং নিরীহ লোকদের উপর রুশ সরকারের সীমাহীন নির্যাতন চলছিল তার পরিণতিতো ভয়াবহ হওয়ারই কথা। এজন্য সূচনা থেকেই একটা প্রচন্ড ক্ষোভ এবং ঘৃণা ভাব তার মধ্যে দানা বেঁধে উঠছিল।

নির্ধারিত সময়ের খানিক পূর্বে সে সেই বিশেষ বেল্টটি চেক করে নিল।

সে ঐ বেল্টের বন্ধনের মধ্য হতে একটি অত্যন্ত সূক্ষ তার বের করল এবং সেই তারটি আস্তিনের ভিতরদিয়ে হাত পর্যন্ত নিয়ে এলো। তারের মাথায় কাপড়ের বোতামের মত একটি বটম লাগানো ছিল।

সেটাকে সে তালুর এত কাছাকাছি এনে ফিট করল, যেন যে কোন মুহূর্তে মাঝের আংগুলটি সেটা ছুতে পারে।

সে গাড়ীতে বসার পূর্বে খানিক দাঁড়িয়ে মস্কোর বরফে-ঢাকা শহরটি এমন ভাবে দেখল, যেন সে নগরীর এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য নিজের স্মৃতির পর্দায় সংরক্ষিত করে রাখতে চচ্ছে। অতঃপর দু-চারটি গরম গরম দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করে সে গাড়ীতে উঠে বসল। এখন তার কারটি -F ব্লকের দিকে দৌড়চ্ছিল।

।।৮।।

মস্কো ইউনিভার্সিটির কাছে পৌছলে ভিলেনতিনা কারটিকে খানিকের জন্য থামালো। তার দৃষ্টি পার্কের সেই বেঞ্চটির গেল, যেখানে সে অনেক সময় ফয়জান উগ্লুর সঙ্গে বসে মজার মজার আলাপ করতো। তার চোখে অশ্রু আসবে আসবে,ঠিক তার পূর্বে সে গাড়িটি স্টার্ট দিল। কার দ্রুতগতিতে সামনের দিকে দৌড়াতে লাগল। -F ব্লকের সামনে এসে যখন তার কারটি থামল, তখন ঘড়ির কাটায় সকাল আটটা বাজতে মাত্র পাঁচমিনিট বাকী। ঠিক আটটায় সে কনফারেন্স রুমে ঢুকলো।

একটা লম্বা টেবিলের চারপাশে সামরিক উর্দীপরা চারজন রাশিয়ান কর্নেল বসা রয়েছে। ভিলেনতিনার বস ও তাদের মাঝে ছিল।

ভিলেনতিনা সম্মান প্রদর্শন করার পর স্বীয় ব্যাগ থেকে একটি ভিডিও ক্যাসেট বের করে টেবিলের উপর রাখল। অতঃপর সে একটি চেয়ারে বসে পড়ল। তার সুন্দর কপালে ঘামের বিন্দু বিন্দু ফোটা ফুটতে শুরু করে দিয়েছিল। সে নিজের হাতটি সুক্ষ তারের মাথায় লাগানো বটমের বরাবর নিয়ে নিল, যেন যে কোন মুহূর্তে বটম চাপ দেওয়ার মত অবকাশ তার থাকে।

ক্যাপ্টেন ওঠে ভিডিও ক্যাসেটটি প্রজেক্টরের ভিতর ঢুকালো, অতঃপর প্রজেক্টরটি চালিয়ে দিল। দু-তিন মিনিট প্রজেক্টর চলা সত্বও সামনে ফিট

করা স্ক্রীনে কোন ধরনের ছবি এলোনা। ক্যাপ্টেনের মনে হল যেন মেশিনের গর্ গর্ শব্দে তার মস্তকের ভিতর বিদীর্ণ হয়ে যাবে। তার মনে কিছুটা সংশয় দেখা দিল। একজন কর্নেল, যে ছিল সকলের লীডার, রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তার একটি হাত সজোরে টেবিলের উপর মেরে বলল ঃ

"এটা আবার কোন ধরনের ফাযলামী?"

ক্যাপ্টেন প্রজেক্টর বন্ধ করে দিল। সে ভয়ে কাঁপছিল। সে কম্পিত কণ্ঠে বললঃ "স্যার,, মনে হচ্ছে, ওই নগ্ন রুলটি ,যা আমরা দেখতে চাচ্ছি, কিছু পরে আসবে।"

"ওই অপদার্থ, ইতরপ্রাণী! যা তোরা দেখছিস, এটাই তোদের কাঙ্খিত রুল, এটাই তোদের মনোপযোগী ছবি।" ভিলেনতিনা রাগে ফেটে পড়ছিল।

"তুমি কি প্রলাপ বকছো, এটাতো তুমি অমার্জনীয় অপরাধ করছো ভিলেনতিনা !"

"শাট্আপ নিকৃষ্ট প্রাণী ! আসল ফিল্ম তো তখন দেখতে পাবে যখন কিছুক্ষণের মধ্যেই তোদের শরীরের অপবিত্র মাংশ গুলো বোমার আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে শূন্যে উড়তে থাকবে।" ভিলেনতিনা গোশ্বায় কাঁপতে লাগল।

"কি, কি মতলব তোমার, তুমি পাগল হয়ে যাওনিতো ?" অন্যএকজন কর্নেল কিছুটা ঘাবড়িয়ে গিয়ে বলল।

"কর্নেল ! যদি তোমাদের মধ্যহতে কেউ পিস্তল বের করার ব্যর্থ অপ প্রয়াস চালায় তাহলে মনে রাখবে, আমার বেল্টে ফিটকরা বোমার বটমের উপর আমার আঙ্গুল রাখা রয়েছে, সেটার উপর চাপ দিলে কি অবস্থার সৃষ্টি হবে তার ভয়াবহতা সম্পর্কে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছো।"

ভিলেনতিনার কণ্ঠে না জানি কি লুকানো ছিল যে, তারা সবাই নিজ নিজ জায়গায় নির্জীব ও অবশ হয়ে বসে রইল। তাদের ভিতর দুরু দুরু শুরু হয়ে গিয়েছিল। মনে হয় তাদের পা গুলো জমিনের সাথে আটকে গেছে যে, সে গুলো চলার শক্তি একদম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল।

"দেখো ভিলেনতিনা তুমি পাগলামী করোনা। আমরা তোমার বাবাকে ছেড়ে দেওয়ার নিদের্শ জারি করে দিয়েছি। এই সু সংবাদটি আমরা তোমাকে দিতেই যাচ্ছিলাম।" আরেকজন কর্নেল প্রতারণার জাল বিছানের ব্যর্থ চেষ্টা চালালো।

"যখন তুমি ঘরে পৌঁছবে, তখন তোমার বাবাকে তুমি তোমার অপেক্ষা করতে পাবে।" অন্য একজন কথা কেটে বলল।

"আমরা তোমার পূর্বেকার মহান সেবার প্রতিদান স্বরূপ তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। তুমি আমাদের সাথে এখন যে পাগলামী করছো এসব কথা ঘূর্ণাক্ষরেও কেউ জানবেনা।" তৃতীয় জন বলল।

ভিলেনতিনা হো হো করে জোরদার অট্রহাসিতে ফেটে পড়ল। অতঃপর বলল ঃ " আমার ধারণা তোমরা মরণের ভয়ে পাগল হয়ে গেছো। ঠিক আছে, এভাবে হয়ত তোমাদের আসন্ন মৃত্যু যাতনা কিছুটা হ্রাস পাবে।"

কিন্তু দলপতি কর্নেল ভিলেনতিনার সঙ্গে কথা বলার সময়ে নিজের একটি পা টেবিলের নীচে ফিট করা লাল রঙের বটমের উপর রেখে দিয়েছিল। এই বটমটি ছিল ইমারজেন্সী ওয়র্নিংয়ের জন্য। ভিলেনতিনা মোটেও ব্যাপারটি আঁচ করতে পারেনি।

ভিলেনতিনার কথা এখনো শেষ হয়ে সারেনি যে, আচমকা কক্ষের ডান দিকের জানালাটা উম্মুক্ত হয়ে গেল। তখন সে একজন কমান্ডো আক্রমণ কারী কে দেখতে পেল। তার আক্রমণ করার গতি ছিল খুবই তড়িৎ। সে তার অটোমেটিক মেশিনগান দিয়ে ভিলেনতিনাকে লক্ষ্য করে অনেক গুলি ছুড়ে মারল। কিন্তু হামলাকারী কমান্ডোর ট্রিগারের উপর আঙ্গুলের চাপ এবং ভিলেনতিনার বটমের উপর আঙ্গুলের চাপ একই সময় ঘটল।

ভিলেনতিনার বেল্টে ফিট করা শক্তিশালী বোমাটি মুহুর্তের মধ্যে প্রচন্ড শব্দের সাথে বিস্ফোরিত হয়ে গেল। ভিলেনতিনার কোমল শরীর খানা ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে গেল। সাথে সাথে পুরো কক্ষটি আগ্নেয়গিরীর ন্যায় ফেটে পড়ল। কয়েকমিনিটের মধ্যেই সেই সাজানো গোছানো কাম্‌রাটি ধবংস স্তুপে পরিণত হল এবং সেখানে যারা ছিল, তাদের টুকরো টুকরো দেহগুলো ধবংস স্তুপের চাপায় পড়ে ছটফট করছিল।

বিস্ফোরণ এতই জোরদার ছিল যে, সেই দালানটির অনেক দেয়ালে ফাটল সৃষ্টি হল। বেশ কয়েকটি রুমের জানালার গ্লাস ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

।।৯।।

ফয়জান সকালে ঘুম থেকে ওঠে প্রথমে এই কাজটি করল যে, সে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার পরিবর্তে নিজের দেশের দুতাবাসে গিয়ে উপস্থিত হল। সে দুতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে বুঝিয়ে বলল যে, "স্যার, আমি এখানে একাগ্রতার সাথে অধ্যয়ন করতে পারছিনা। কারণ, আমার ব্রেন এতটা উন্নতমানের নয়, ফলে এখানকার কোর্স আমার পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।"

ফয়জান দুতের সঙ্গে কথা বলার সময় এদিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখছিল যেন সে ঘূর্ণাক্ষরেও বুঝতে না পারে যে, তার বিপ্লবী চিন্তাধারা পাল্টে গেছে এবং মোল্লাতন্ত্র তার মধ্যে আবার ফিরে এসেছে।

আফগান দুত ফয়জানের কথা শুনার পর তাকে পুনরায় দু-তিন দিন বাদ আসতে বলল এবং তাকে সান্ত্বনা দিল যে, সে তার ব্যাপারটি নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলাপ করবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরকারের নির্দেশ অনুসারে কোন একটা সিদ্ধান্ত নেবে।

নয়া জিন্দেগী

ভোর হতেই ফয়জানকে কেমন জানি একটা অজানা নৈরাশ্য আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তার মনটা ছিল অস্থির। সেই নৈরাশ্য থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে রুম থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। আজ দিনটি ছিল ছুটির। এই দিনটি সব সময় তার জন্য কোন না কোন দুর্ঘটনা বয়ে নিয়ে আসতো।

সে ইউনিভার্সিটি সংলগ্ন পার্কে পায়চারী করতে লাগল। কিন্তু কেন জানি, তার মনটা বার বার ভিলেনতিনার মধ্যে গিয়ে আটকে যাচ্ছিল। ভিলেনতিনার ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করাটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সে ভাবতে লাগল যে, আমার কি হয়ে গেল? পাঠান হয়ে ভালবাসার ব্যাপারে এত দুর্বল হয়ে পড়বে সে কখনো কল্পনাও করেনি। পার্কে শান্তি না পেয়ে সে নদীর কিনারায় চলে এলো। নদীর পারে বানানো সড়ক দিয়ে সে অনেকদুর পর্যন্ত হেটে চলল। নদী তার প্রকৃতি অনুযায়ী অত্যন্ত নীরবতা রক্ষা করে ফয়জানের সাথে সাথে বয়ে যাচ্ছিল।

কখনো কখনো ফয়জান নদীর এই রহস্যময় নিস্তব্ধতায় অস্থির হয়ে উঠছিল। তার মনে প্রচন্ড ভাবে এই খায়েশটি ঘুরপাক খাচ্ছিল যে, হায়, যদি নদীর এই প্রবহমান পানি বাকশক্তি পেয়ে যেত এবং সে চিৎকার করে জোরে জোরে সে সব কথা ফয়জান কে বলে দিত যা আজ পর্যন্ত তার বক্ষে পানির আবর্তের ন্যায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

সূর্য ভয়ে ভয়ে মস্কোর ঘন কুয়াশার পর্দাকে ভেদ করে উকি মারতে শুরু করছিল। তার কম্পমান আলো শীতল জমাট পরিবেশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নদীর উত্তাল তরঙ্গ মালার ন্যায় উদগ্রীব ছিল। ধীরে ধীরে সূর্যের কিরণে সোনালী আভা মিশ্রিত হচ্ছিল।

এই সোনালী রোদ ফয়জানের অনুভূতিতে প্রাণ সঞ্চারক সজীবতা এনে দিচ্ছিল। ভিলেনতিনার কল্পনা আবার হঠাৎ কোথাও অজানা গভীরতা থেকে

ওঠে এসে তার পুরো মন কে আচ্ছন্ন করে ফেলল। একটি ফুলের কলি যেন তার হৃদয়ের পুষ্প কাননে গজিয়ে ওঠল, কিন্তু পরক্ষণেই সেটা ঝরে পড়ল।

আমি এত দুর্বল কেন হয়ে পড়লাম? ফয়জান নিজেকে প্রশ্ন করল।

তার উত্তর না পেয়ে সে নিজের দৃষ্টি আবার নদীর প্রবহমান জলরাশির উপর নৃত্যকারী সূর্যের কিরণের উপর নিবদ্ধ করল। দূর দূর পর্যন্ত কোন জন-প্রাণীর নাম নিশানা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। পরিবেশের উপর ছেয়ে যাওয়া এই নিস্তব্ধতায় এখন সে অনেকটা অতীষ্ট হয়ে উঠছিল। সে প্রচন্ড ভাবে অনুভব করল যে, রাশিয়ার লোকদের মত এখানকার পরিবেশটিও বড়ই মোনাফেক প্রকৃতির ও নীরব।

আরো কিছুদুর অগ্রসর হলে সে নদীর পারে দু-তিন জন বৃদ্ধকে ওয়াক করতে দেখল। সে মুহূর্তে না জানি কেন তার মনটা প্রচন্ড ভাবে খায়েশ করছিল যে, হায় যদি নদীর এই খুবসুরত তরঙ্গমালা থেকে প্রাণ প্রিয় ভিলেনতিনা বেরিয়ে আসতো এবং সে তাকে তার বাহুর বন্ধনে আবদ্ধ করে নিতো!

সে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত নিথর নিস্তব্ধ ঢেউয়ের পানে তাকিয়ে সেই ধ্যানে মগ্ন রইল। কিন্তু পানি তো তার নিজ গতিতে বয়ে চলে, সে তো আর তার ভাবনার অনুসারী হতে পারেনা। নৈরাশ্যের অনুভুতি বেড়েই চলল। হতাশা তাকে গ্রাস করে ফেলছিল। কিন্তু কি ভেবে হঠাৎ তার চেহারা খানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং তার পা দুটো অনিচ্ছাসত্বেও ভিলেনতিনার বাসার দিকে চলতে শুরু করে দিল।

সে আজ মনে মনে একটি রোমান্স প্ল্যান করল যে, আচমকা ভিলেনতিনার দরজায় কাষাঘাত করে সে তাকে হতভম্ব করে দেবে। আজ সে মনকে উজাড় করে ভিলেনতিনার কাছে অনেক কথা বলবে। সে তার অন্তরটা খুলে তার সামনে হাজির করবে এবং তাকে এ কথাটি পরিস্কার ভাবে জানিয়ে দেবে যে, সে তার প্রেমের জালে মারাত্মক ভাবে আবদ্ধ হয়ে গেছে।

এইসব কল্পনার জোড়া তালির মধ্যদিয়ে সে তিন-চার মাইল পথ অতিক্রম করে ফেলল। এরিমধ্যে বেশ কিছু লোকের মুখোমুখী হল সে। কিন্তু রাশিয়ার থমথমে পরিবেশ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে

ফেলেছিল। পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে তাদের মধ্যে দেখা যেত চরম ইতস্ততাভাব। সে জন্য কারো সঙ্গে কথা না বলেই তারা সামনের দিকে অগসর হয়ে যাচ্ছিল। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ফয়জান ভিলেনতিনার বাসায় গিয়ে উপস্থিত হল। স্পন্দিত হৃদয়ও দোদল্যমান আশা নিয়ে সে ভিলেনতিনার দরজায় করাঘাত করল। প্রথম,দ্বিতীয়, অতঃপর তৃতীয় বার করাঘাত করার পর কার যেন পদধ্বনি শুনা গেল। ফয়জানের হৃদয়ের স্পন্দনটা অস্বাভাবিক ভাবে ওঠানামা করছিল।

একজন স্মার্ট চেহারাওয়ালা মধ্যবয়সী মহিলা দরজা খুললেন। তার যৌবন কাল যদিও যুগের করাল গ্রাসে শেষ হতে চলছিল। তবুও ফয়জানের অন্তরটা স্বাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, ইনি অবশ্যই ভিলেনতিনার মা হবেন।

“তুমি কি ফয়জান?” সংবেদনশীল মুখখানা ফয়জানের কিছু বলে ওঠার পূর্বেই তাকে জিজ্ঞেস করলেন।

“জি, আমিই ফয়জান। ভিলেনতিনা কোথায়?” এই প্রশ্ন শুনে মহিলার চেহারায় বিষন্নতার ছাপ ফুটে ওঠল।

“তোমার জন্য ভিলেনতিনার একটি পয়গাম রয়েছে।” কথা বলার সময় মনে হল যেন তিনি শব্দ নির্বাচন করতে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করছেন। ফয়জানের অন্তরটা ধক্ করে ওঠল!

“ভিলেনতিনা কোথায়? ফয়জান ব্যাকুলহয়ে পুনরায় জিজ্ঞেস করল।

“বেটা! সবকথাই হবে ভিতরে এসো” ! মহিলাটি যেন ফয়জানের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর প্রদান না করার কসম খেয়েছেন।

মহিলার পিছনে পিছনে সে ঘরে ঢুকলো। ভিলেনতিনার আম্মা স্বীয় আবেগের উপর আবরণ ঢেকে যেই সাহসিকতা প্রদর্শন করে যাচ্ছিলো, তাতে ফয়জান হতবাক না হয়ে পারল না।

“এখানে বসো!” দুঃখিনী মা এবার যখন ফয়জানের দিকে তাকালেন, ফয়জান তার চোখে বেদনার অশ্রু দেখে অস্থির হয়ে পড়ল।

কামিজের আস্তিন দিয়ে চোখ মুছে তিনি অন্য রুমে চলে গেলেন। তিনি যখন অন্য রুম থেকে ফিরে এলেন, তখন তার হাতে চিঠির একটি খাম ছিল।

"ভিলেনতিনা এই চিঠিখানা তোমার জন্য রেখে গেছে।" তিনি কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বললেন। তার গাল বেয়ে দর দর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। ফয়জানের মনে হল, কেউ যেন তার অন্তরটা হাতের মুঠোর ভিতর নিয়ে পিষে ফেলছে। নৈরাশ্যোর কালো মেঘ তার হৃদয়ের গভীরকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সে খুব কষ্টে সেই চিঠিটা গ্রহণ করলো।

"বেটা!" এই চিঠিটি নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে প্রস্থান করো। দ্বিতীয় বার কখনো এদিকে এসোনা"। শেষ কথাটি বলার সময় তিনি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

ফয়জানের ভিতরটা খান খান হয়ে যাচ্ছিল। তার বুঝে এলোনা যে, সে কি করবে। সম্মোহিত ব্যক্তির ন্যায় সে ওঠে দাঁড়াল। তার মন চাইল, এই সম্মানিত মহিলাকে দু-চারটি সহানুভূতিমুলক কথা বলবে। কিন্তু কথা তার গলায় এসে আটকে গেল। মহিলাটি পরিস্থিতির নাযুকতা পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিলেন। তিনি কামিজের আস্তিন দিয়ে চোখ দুটো মুছে ফয়জান কে পথ দেখিয়ে দরজা পর্যন্ত এলেন। দরজার কাছে এসে তিনি ফয়জানের মুখের দিকে তাকালেন। ফয়জানের মনে হল যেন এই সম্মানিত মহিলার চোখ দিয়ে ভিলেনতিনাই তাকে দেখছে। মহিলাটি তার হাত দুটো ফয়জানের কাঁধের উপর রাখলেন এবং তার মাথা উত্তোলন করে তাতে তিনি চুমু দিলেন এবং বললেন ঃ বেটা ! তুমি আমাকে ক্ষমা করবে। পরিস্থিতি এত নাযুক পর্যায় এসে দাঁড়িয়েছ যে, আমি তোমাকে বসতেও বলতে পারিছি না।

ফয়জানের বাকশক্তি রহিত হয়ে পড়েছিল। সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলনা যে, কি উত্তর দেবে তাকে। মহিলাটি সামনে অগ্রসর হয়ে দরজার হ্যান্ডেল ঘুরালেন এবং ফয়জানকে বিদায় জানালেন। ফয়জান ঘর থেকে বাইরে পা রাখতেই তিনি বেশী কিছু না বলে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

।।২।।

গভীর দুশ্চিন্তায় বেহাল হওয়া সত্বেও ফয়জান অনুধাবন করতে সক্ষম হল যে, সে মারাত্মক সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। তার সামনে বিপদের সংকেত বেজে ওঠেছে। এটা তার সৌভাগ্যই বলতে হবে

যে, কেজিবি তাকে এখানে আসতে দেখেনি। নতুবা ভিলেনতিনার চিঠিটা ও তার হাত পর্যন্ত পৌঁছত না। ইউনিভার্সিটি যাওয়ার খেয়াল তার অন্তর থেকে মুছে গিয়েছিল। সে লম্বা লম্বা কদম ফেলে পুনরায় নদীর পারে এসে পৌঁছল। এবার সে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করলো , যেন কেউ তাকে দেখতে নাপায়। একটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে পৌছে সে একটি পাথরের উপর বসে পড়ল। সে খামটা থেকে চিটি বের করলো। তখন তার অন্তরটা প্রচন্ড ভাবে ওঠানামা করছিল। তার হাত দুখানা কাঁপছিল। সাদা কাগজে ছড়ানো ছিটানো শব্দগুলোর আড়াল থেকে ভিলেনতিনার প্রতিকৃতি উকি মেরে যেন তার সঙ্গে কথা বলছিল।

"ফয়জান!

তোমার নিকট আমার এই পত্রখানা ওই সময় পৌঁছবে যখন আমি এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকব না। আমি এমন জগতে চলে যাবো যা মানুষের ধরা ছোয়ার বাইরে। আমি এসব কথা লিপিবদ্ধকরার মুহূর্তে কত মারাত্মক মানসিক কষ্টে ভুগছিলাম তা তুমি অনুমান করতে পারবে না।

আমি জানি, তুমি ব্যথা পাবে। কিন্তু আমি যা করতে যাচ্ছি, সে ব্যাপারে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ নিরুপায়। আমার জন্য অন্য কোন বিকল্প পথ খোলা ছিলনা।

ফয়জান !

সত্যকথা এই যে, জ্ঞান চক্ষু খোলার পর থেকে আমি কখনো নিজেকে নারীই মনে করিনি। আমি যৌবনের কোঠায় পা রাখতেই আমার হতভাগা পিতা নরখাদক কেজিবি'র জুলুম ও নৃসংশতার শিকার হন। বাবা একেবারেই সোজা সরল মানুষ ছিলেন। তিনি স্বীয় কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে তিনি কোন সময়ই জড়িত ছিলেন না। না জানি কেন সেই অশুভ মুহূর্ত এসে গেল যে, একদিন বাবা কোন এক ব্যক্তির সামনে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছুটা কটুক্তি করলেন। এটা বাবার পক্ষে কাল হয়ে দাঁড়াল।

সে দিন অর্ধরাত হয়ে গেলে আমাদের ঘরের দরজায় জোরে জোরে করাঘাত হল। তখনই আমি বুঝে ফেললাম যে, কোন বড় ধরনের আপদ আমাদের দ্বার প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে। আমার মা উঠে দরজা খুললেন।

সঙ্গে সঙ্গে সাদা কাপড় পরা কে জি বি'র নরখাদকরা আমাদের ঘরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। প্রথমে তারা আমার বাবাকে খুবই নির্দয় ভাবে পিটাতে আরম্ভ করলো। অতঃপর আধমরা করে তারা তাকে টেনে হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে গেলে আমার হতভাগা মা কাঁদতে কাঁদতে যখন নিজের অসহায় স্বামীর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে চাইলেন, তখন সেই পাষন্ডরা তার উপরও ববর্র আচরণ করলো। তারা আমাদের দু-বোনের মুখেও চড় থাপ্পড় বসিয়ে দিল। তখন থেকেই সূচনা হল আমাদের দুর্ভাগ্য প্রহরের।

পর দিন তারা এসে আমাকে নিয়ে গেল, বাবার সঙ্গে দেখা করানোর জন্য। তখন বাবা আমাকে বললেন" বেটী ভিলেনতিনা !

আমার জীবন এক অবস্থাতেই রক্ষা পেতে পারে, আর তাহল, তুমি এসব লোকদের কথা এবং ইংগিত অনুসারে চলবে। তারা যা ফরমায়েশ করবে। যে ভাবে করতে বলবে, তা নির্দ্বিধায় মেনে নেবে। কোন উচ্যবাচ্য করবেনা। অন্যথায় তারা নিঃসন্দেহে আমাকে গাদ্দার আখ্যায়িত করে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করবে। আর এটা তাদের জন্য কোন ব্যাপারও নয়।

আমি আর্টের ছাত্রী ছিলাম। আমি আমার ভবিষ্যত জীবন নিয়ে কত রঙীন ও সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখতাম। কৈশোর থেকেই আমার মাতা যিনি নিজেও হৃদয়গ্রাহী সুললিত কন্ঠে সঙ্গীত গাইতে পারতেন, আমাকে গান শুনিয়ে শুনিয়ে আমার আত্মার ভিতর সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন সঙ্গীত ঝংকার। আমি আমার জীবনের এই বিভৎস চেহারা তো কোন সময় কল্পনাও করিনি।

আমি আমার মাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করতে এবং হাজার হাজার মানুষ থেকে বাহবা, ধন্যবাদ কুড়াতে দেখেছি। আমারও ইচ্ছা ছিল যে, আমি ও একদিন একজন নামকরা গায়িকা হবো। নিজের সঙ্গীত দিয়ে পরিবেশকে করে তুলবো সুশোভিত। আমার সুমধুর কণ্ঠ দিয়ে মানুষের হৃদয়কে করে তুলবো পাগল পারা। এত সব সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখতাম আমি। কিন্তু হঠাৎ কেউ যেন আমাকে আসমানের চূড়া হতে পাতালের অতল গহবরে নিক্ষেপ করে ফেলে দিল। এসব নর পিশাচরা নিজেদের হীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সর্ব প্রথম তারা আমার ইজ্জত লুণ্ঠন করলো। এই নরপশুরা জানতো যে, আমার মধ্যে নারীত্ব ভরপুর রয়েছে। সবচেয়ে

প্রথমে তারা আমার নারীত্বকে দলিত মথিত করলো। তারা আমাকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিল যে, আমি না কখনো নারী ছিলাম, না আছি, না ভবিষ্যতে তার চিন্তা করতে পারি।

আমি শুধু আর শুধু একজন সোশ্যালিস্ট রাশিয়ান যুবতী, যাকে একমাত্র সমাজতন্ত্র আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য জন্ম দেওয়া হয়েছে, যার আত্মা এবং দেহের উপর তার কোন কর্তৃত্ব নেই বরং দেহ ও আত্মার মালিক একমাত্র স্টেট বা রাষ্ট্র। একমাত্র তারই অধিকার রয়েছে ভোগ করার। তারা আমার সতীত্বকে খান খান করে দিল। আমার রমনীয় লজ্জাকে তাদের রক্ত খেকো নখর দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করে ফেললো। এত নির্দয় ভাবে তারা আমার আত্মা ও সতীত্বের পোস্টমার্টম করল যে, সমস্ত পবিত্রতাকে ছেঁচে ছেঁচে আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। আমি এরপর আর নারী রইনি বরং হয়ে গেলাম বেশ্যা, পাপিষ্ঠাও দুশ্চরিত্রা !!

আমার আত্মা তো বহু পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে। আর দেহের মালিক হয়ে গেছে তারা। পাঁচ বছর পর্যন্ত আমার দেহকে এসব মানবরূপী পাষন্ডরা লাল বিপ্লবের নামে ভোগ করতে থাকে। আমাকে বিমান বালা বানিয়ে তারা আমার উপর এই ডিউটি সোপর্দ করলো, যেন আমি ফুঁসলিয়ে তোমাদের মত সরল সোজা যুবকদের সমাজতান্ত্রীক আদর্শের ভক্ত বানাই। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হল, যেন যুবকদের মনকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজন হলে তাদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করি।

এভাবেই আমি পুতুলের ন্যায় তাদের কথায়, তাদের ইশারায় নাচতে থাকি। আমি জানি না যে, কত নিরপরাধ এবং সরল সোজা লোকদের খুন করেছি। কত যুবককে মানবের পর্যায় থেকে নামিয়ে তথাকথিত "বিপ্লবী হায়েনা" বানিয়েছি। নিজেতো লাঞ্চনা ও জিল্লতীর গভীর গহবরে দাফন ছিলাম, সাথে সাথে এসব নিরপরাধ লোকদেরও দাফন করে যাচ্ছিলাম।

যে দিন তোমার ওপর আমার ডিউটি লাগানো হল এবং আমাকে বলা হল ঃ এই যুবককে কাবু করে কাবুলে আমাদের নীল নকশা বাস্তবায়নের জন্য তল্পীবাহক হিসাবে প্রস্তুত করো। সেই দিন আমি ঘূর্ণাক্ষরেও উপলব্ধি করতে পারিনি যে, আমার মধ্যে মৃত্যুবরণকারী নারী ভিলেনতিনা আবার জীবন্ত হয়ে

ওঠবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তেই আমি অনুধাবন করতে পারলাম, যেন আমার সত্বার উপর প্রলেপ মারা লৌহ আবরণ টুটে চুরমার হয়ে যাবে। আমি পাপিষ্ঠা বদকার কেজিবি'র স্পাই থেকে পুনরায় নিজেকে সত্যিকার ভাবে নারী রূপে ভাবতে লাগলাম। আমার মধ্যে পুনরায় রমনীয় সতীত্ব বোধ ফিরে আসতে শুরু করল।

ফয়জান, জানি না, সেই দুর্বল মুহূর্ত কোনটি ছিল। যখন তুমি চুপিসারে আমার অন্তরের মরিচা পড়া বাতায়ন খুলে সেখানে এসে আস্তানা গাড়লে। তখন থেকেই সূচনা হয়ে গেল আমার জীবন অবসানের ক্রিয়াকান্ড। তুমি নিজের সরলতা ও পাপ পংকিলবিহীন কথাবার্তা ও ব্যবহার দ্বারা আমাকে একজন নারী বানাতে শুরু করে দিলে। আর আমি অসহায় ভাবে আমার অতীত জীবনের সতীত্ব লুণ্ঠনের সেই বেদনা ভরা বিস্মৃত অধ্যায় দেখছিলাম। জানিনা যে, কতবার আমার ইচ্ছে করেছিল তোমার সঙ্গেও যৌন সম্পর্ক গড়ে তুলতে, তোমাকে ও অন্যান্য যুবকের মত আমার বেড়াজালে আবদ্ধ করে নিতে, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। কারণ, তুমি আমার হৃদয়ের গভীরে ঢুকে পড়েছিলে। তুমি আমার ওপর মহববতের কোন্ ধরনের ফুঁক মেরেছিলে, তা একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই জানেন। তোমাকে আমি আমার কাছে পেয়ে আমার পশুত্ব বোধ জাগ্রত হওয়ার পরিবর্তে আমার মধ্যে সতী সাধবী নারীত্ববোধ জীবন্ত হয়ে ওঠতে থাকে।

ফয়জান ! আমি কতবার চাইলাম তোমার ভালবাসার গভীরতা থেকে বেরিয়ে এসে পুনরায় নিজের প্রথম অবস্থার দিকে ফিরে যেতে। কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভবই হলনা। আমি তো তোমার প্রেমের সমুদ্রে ডুবে যেতে লাগলাম। আমার মধ্যে এমন আত্ম-বিস্মৃতির অবস্থা সৃষ্টি হল যে, আমার স্বকীয়তা সত্বা বলতে কোন জিনিস রইল না। আমার মধ্যে একটি বস্তুই রয়ে গেল। সেটা হচ্ছে , তুমি আর তুমি। তোমার মধ্যে আমি একাকার হয়ে গেলাম।

গতকাল কেজিবি কর্তৃপক্ষ, আমাকে কড়াভাবে নির্দেশ দিল, যেন তোমার সঙ্গে উলঙ্গ হয়ে যৌন কর্ম সম্পাদন করি এবং তার ভিডিও ফিল্ম প্রস্তুত করে তাদের হাতে পৌঁছিয়ে দেই, যাতে ঐ ফিল্ম কে বুনিয়াদ বানিয়ে তারা তোমাকে ব্ল্যাকমেইল করে নিজেদের হীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যবহার করতে পারে।

ফয়জান !

তাদের নির্দেশ মত কাজ করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব ব্যাপার। আমি এ সকল নরঘাতকদের কিভাবে বুঝাতে সক্ষম হবো যে, আমি শত চেষ্টা করলেও আর সেই পাপিষ্ঠা ভিলেনতিনা হতে পারবোনা। আমি যে আর আগের কামুক রমনী রইনি।

এখন আমার সামনে দুটি পথ খোলা ছিল ঃ হয় সারা জীবন সাইবেরিয়ার ঠান্ডা জাহান্নামে নির্বাসিত হয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করা, নতুবা সরাসরি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। আমি দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিলাম। কিন্তু আমি একা মরবনা। কমপক্ষে দু-চারজন পাষন্ডকে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে তবেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবো। আমি মরনের পথে রওয়ানা হয়ে যাচ্ছি।

ফয়জান! সৃষ্টিকর্তার কাছে এই প্রার্থনা জানিয়ে, যেন আমার দৃঢ়তার মধ্যে কোন ধরনের ফাটল না ধরে।

হায়, তুমি যদি ঐ সময় আমাকে দেখতে যে, ঐ চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আমাকে কত নিশ্চিন্ত দেখা যাচ্ছিল।

আমার কোন আফসোস নেই। আমি অত্যন্ত প্রশান্তি বোধ করছি। তবে আমার দুঃখ একটাই, তাহল তোমাকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলার বেদনা। কিন্তু আমি নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিচ্ছি যে, জীবনে সব চাওয়াই যে পেতে হবে এমন তো কোন কথা নয়। প্রতিটি পুষ্প একই ধরনের ভাগ্য নিয়ে দুনিয়াতে আসেনা, কখনো সেটা সময়ের পূর্বেও ঝরে যায়।

ফয়জান !

তুমি আমার ভালবাসার সুগন্ধি। আমি তোমাকে অনুভব করেছি, কিন্তু তোমাকে পাইনি। তবে তুমি আমার হৃদয়ের মাঝে চিরদিন বিরাজ করবে। তোমাকে আমার অন্তর থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

আমি জানি, তুমি যখন আমার মৃত্যুর সংবাদ শুনবে, তখন তুমি দুঃখ পাবে। কিন্তু এটাকে তুমি ব্যাধি বানিয়ে নিওনা। নইলে আমার আত্মা শান্তি পাবে না। আমি তোমার জন্য শুধু একটি পয়গাম রেখে যাচ্ছি। এই বার্তাটি তোমার মাতৃভুমির আনাচে কানাচে পৌঁছিয়ে দেবে। তোমার দেশের প্রতিটি বাচ্চা বাচ্চাকে জানিয়ে দাও যে, বিপ্লবের আঁড়ালে, উন্নতি ও প্রগতির নামে

আফগানীদের স্বাধীন চেতনা, তাদের মান-সম্মান, ইজ্জত আবরুকে রুশ ভল্লুকের কাছে বিক্রি করে দেয়ার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। এ ষড়যন্ত্রের কালো থাবাকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য তোমাদের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। লাল ফৌজদের স্বপ্নের প্রাচীরকে ধুলির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

আল্লাহ না করুন, যদি এই সমাজতান্ত্রীক বিপ্লব তথা নাস্তিক্যবাদ ধর্ম আফগানিস্তানের মাটিতে পা জমাতে সক্ষম হয়, তাহলে তাদের পরিণতিও সেইরূপ হবে, যেমন মধ্যএশিয়ার মুসলিম সম্প্রদায়ের হয়েছিল।

গোলামীও দাসত্বের এমন বেড়ী তোমাদের গালায় ফেঁসে পড়বে, যাকে কখনই তোমাদের পক্ষে নামানো সম্ভব হবে না।

ফয়জান !

আমার জন্য কখনো কাঁদবে না। কোন মানসিক দুর্বলতা এবং দুঃখ তোমার ধারে কাছেও যেন ভিড়তে না পায়।

যদি তুমি আমার পয়গামটি তোমার জাতির কাছে যথাযথ ভাবে পৌছিয়ে দিতে পারো। তবেই আমি মনে করবো যে, তুমি মহববতের হক ও দাবী পূরণ করেছো।

আমি তো মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে এই ঋণ পরিশোধ করছি। সৃষ্টিকতার্র দোহাই দিয়ে বলছি, যত শীঘ্র সম্ভব, মস্কো ছেড়ে চলে যাও।

ইতি- তোমারই ভিলেনতিনা।

।।৩।।

ফয়জান চিঠিখানা পড়ছিল, আর তার বুকটা চোখের পানিতে ভিজে যাচ্ছিল। চিঠিপড়া শেষ হলে সে ছোট শিশুর মত ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

আল্লাহ মালুম, কতক্ষণ পর্যন্ত তার চক্ষু বেদনার আঁসূ ঝরাতে থাকল।

আচমকা তার অস্থির চিত্তটা যেন হুঁশ ফিরে পেলো। সে তড়িৎ গতিতে ওঠে দাঁড়ালো। পত্রটি পবিত্র দস্তাবেজের মত ভাজকরে সে নিজের জামার কোন গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখল। এই চিঠিটি তার জীবনের জন্য ছিল

একটি মহা সম্বল। অকস্মাৎ একটা ক্রোধ তার ভিতরে জাগ্রত হয়ে ওঠল।

সে নিজের রক্ত দৃষ্টি মস্কোর লাল নদের উপর গেড়ে দিল।

"ভিলেনতিনা আমার প্রিয় ভিলেনতিনা !" সে মনে মনে স্বীয় প্রেমিকার কোরবানী ও আত্মত্যাগকে গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বলতে লাগল ঃ

" মহান অসীম, চিরশক্তিমান আল্লাহরাববুল আলামীনের কসম খেয়ে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ধমনীতে এক ফোটা রক্ত প্রবাহিত থাকবে, আমি রুশ ভল্লুকদের অপবিত্র কদমকে এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের পবিত্র ভূমিতে জমে থাকতে দেবোনা। তোমার রক্তের এক এক বিন্দু আমার উপর ঋণ স্বরূপ। আল্লাহ করুন, এই ঋণ পরিশোধ করার পূর্বে কখনো যেন আমার মৃত্যু না আসে।

একটি নয়া চেতনা

একটি দৃপ্ত শপথ

একটি জেহাদী জযবা তার তনুমনে আগুন ধরিয়ে দিল। সে লম্বা পা ফেলে ইউনিভার্সিটির দিকে হাটা দিল। তার দৃপ্ত পদে মস্কোর মাটি যেন থর থর করে কেঁপে উঠছিল। তারমনে হচ্ছিল, যেন ভিলেনতিনার ইষৎ হাসিতে উদ্ভাসিত চোখ দুটো রোডের উভয় পার্শের ফুটন্ত পুস্পের মাঝখান দিয়ে উকি মেরে তাকে দেখছে।

বিস্মৃত অধ্যায়

মস্কো নদীর ঢেউয়ের দিকে কতক্ষন তাকিয়ে আছে ফয়জান, তা আল্লাহই ভাল জানেন। নদীর মধ্যে যৌবনের উন্মাদনা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। উত্তাল তরংগমালা সুর ঝংকার সৃষ্টি করে উপকূলের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছিল।

ফয়জানের মনে হল যেন, এসব প্রচন্ড তরঙ্গমালা তার ভিতরেও তোল পাড় খাচ্ছে। তার শিরা উপশিরায় রক্ত এমন ভাবে টগবগ করছিল যে, নদীর উন্মাদনা তার সামনে কিছুই নয়। ভিলেনতিনার সে সব কথা তার মনে পড়ছিল, যা সে তাকে আফগানিস্তানের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে বলেছিল।

সে ভাবতে লাগল, যখন তার পূর্বপুরুষরা মস্কোর উদ্ধত ক্রুসেডধারী খৃষ্টবাদীদের শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে রাশিয়া জয় করেছিল, তখনও কি মস্কো নদীর এমন উন্মাদনা ছিল?

তার স্মৃতির পর্দায় পাঁচশত বছর পূর্বের দৃশ্যাবলী উদ্ভাসিত হয়ে ওঠল, সে রেড স্কোয়ারে সেই রাজকীয় ভবনের সামনে বিজয়ী তাতার মুসলমানদের ঘোড়ার খুর ধ্বনি শুনতে পেল, যেখানে বসে রাশিয়ার জার এবং বর্তমানে নাস্তিক, বেদ্বীন বলশেভিকরা নিজেদের বর্বর চেহারার উপর শান্তি ও বন্ধুত্বের মুখোশ লাগিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল রাষ্ট্র সমুহের জনসাধারণের রক্ত দিয়ে হোলি খেলতে মেতে উঠেছে।

ফয়জানের জনৈক উস্তাদ কয়েক বছর পূর্বে কাবুলের একটি স্কুলে ইতিহাসের সবক পড়াতে গিয়ে তাদের বলেছিলেনঃ

"ওসমানী তুর্কী বীর মুজাহিদীনের অশ্বগুলো পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশ পদদলিত করেছিল। মুজাহিদদের খুরের ধবনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল খৃষ্টানদের দুর্ভেদ্য দুর্গ ও অট্রালিকা সমূহ। তৈমুরলং যখন রাশিয়া অভিমুখে অশ্ব চালিয়ে দিলেন, তখন রাশিয়ার গ্রামকে গ্রাম, শহরকে শহর তার ভয়ে জন শূন্য হয়ে পড়েছিল।"

সেই বৃদ্ধ শিক্ষক আরো বলেছিলেন। "ছেলেরা আমার ! তোমরা এখান থেকে পড়া লেখা সমাপ্ত করে যখন কলেজে যাবে উচ্চ শিক্ষার জন্য, তখন তোমরা অন্য এক ধরনের ইতিহাসের বই দেখতে পাবে, যে গুলো মনগড়া ও জাল ঘটনা দিয়ে বিকৃত করা হয়েছে। সে সব হিস্ট্রী তোমাদের পড়তে দেওয়া হবে। কিন্তু তোমাদের উচিৎ হবে সঠিক ও নির্ভেজাল ইতিহাস অনুসন্ধান করা এবং সে গুলো গভীর ভাবে অধ্যয়ন করা। তোমাদের উচিৎ সে সব ইতিহাসের বই পড়া, যে গুলো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তার দোসরদের মনগড়া লেখনী থেকে মুক্ত রয়েছে। সঠিক ইতিহাস পড়লে তোমরা বুঝতে সক্ষম হবে যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা তাদের আগ্রাসী নীতি বাস্তবায়ন এবং তাদের বর্বর কালো থাবা বিস্তারের জন্য কি কি পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে এবং তাদের হাতে বিজিত অঞ্চলের নিষ্পেষিত মজলুম মানুষের হাহাকার এবং তাদের শরীর ও কলিজায় লাগা জখমও তোমরা দেখতে পাবে।

মস্কো নদী তীরে দাঁড়িয়ে ফয়জান উগ্‌লুর আজ প্রচন্ড ভাবে সেই বৃদ্ধ শিক্ষকের কথা বার বার মনে পড়ছিল। তার বুকে ধক করে একটি বেদনা জেগে ওঠলো যে, হায়, আমার সেই মান্যবর উস্তাদ কি এখনো জীবিত আছেন? নাকি বিপ্লববাদীরা তাদের নাস্তিক্যবাদ আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা করেছে? তাকে লেলিনবাদের নামে বলি দিয়েছে?

সেই মুহতারাম উস্তাদ আরো বলেছিলেন ঃ

"আমার স্নেহের ছাত্ররা !

সাম্রাজ্যবাদী শোষণের যাঁতাকল এত মারাত্মক হয়ে থাকে যে, অধীনস্ত ও বিজিত জাতিরা তাদের হাতে হয় ক্ষত-বিক্ষত, আর তাদের সেই ক্ষত গুলো রূপ নেয় ক্যান্সারে। পরাধীন জাতির শরীর এবং আত্মার পচন ধরে। তাদের স্বকীয় চিন্তাধারা,মন মানসিকতা, কৃষ্টি, রীতি নীতি সবকিছুকেই পরিবর্তন করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা চালায় জোর যার মুল্লুক তার নীতি। আধিপত্যবাদীরা যদি কোন এক সময় সেখান থেকে চলেও যায়, তাহলেও তাদের পিছনে তারা রেখে যায় বিবেকবান মুনুষের পরিবর্তে এমন কিছু গোলাম, চামচার পাল ও দোসর, যারা তাদের অনুপস্থিতিতেও নিজ মুনীবদের চিন্তাধারা ও আদর্শের গুণগান গাইতে থকে।"

ফয়জানের ভিতর থেকে একটা গভীর নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। মনে হয়, আমার দেশেও এ সব হতে যাচ্ছে। কিন্তু এটা সম্ভব নয়। কি করে সম্ভব? সে কি ঐ জাতির সন্তান নয়, যারা খায়বর গিরীপথের চূড়াকে পদানত করে পাঞ্জাবের সবুজ শষ্য শ্যামল ভুমিকে করেছিলেন করতলগত। সিন্ধের উত্তপ্ত মরুভুমিকে অধিকার করে হিন্দু ব্রাম্মণ্যদের সোমনাথের দম্ভকে গুড়িয়ে দিয়েছিলেন স্বীয় পদতলে। তাদের বাপ-দাদারা উপমহাদেশের ওপর কত শতাব্দী ধরে প্রচন্ড প্রতাপে রাজত্ব করে গেছেন। তারাই ইসলামের মহান শাশ্বত পয়গামকে রাজকুমারী থেকে নিয়ে কন্যাকুমারী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। তারা ঐ জাতি, যার মাত্র সতের জন যুবক তৎকালীন বাংলার হিন্দুরাজা লক্ষণ সেনের রাজধানী দখল করে নিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মুসলিম শাসন। ইতিহাস বিস্ময়ভাবে তাদের দিকে তাকিয়েছিল।"

ফয়জানের মানসপটে ভেসে ওঠল বোখারাও সমরকন্দের ইতিহাস। তার মনে পড়লঃ

"এটা তেমন পুরাতন কথা নয়। অক্টোবর ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ার বেশীরভাগ জন বসতিই ছিল পরিপূর্ণভাবে মুসলমান। রাশিয়ার জারশাহীর জুলুম ও নিষ্পেষণ সত্বেও সেখানকার মুসলমানদের দেওয়া হয়েছিল অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা। তারা স্বাধীন ভাবে স্বীয় ধর্ম কর্ম পালন করতে পারতো। তাদের ওপর কোন রকম বাধা বিপত্তি ছিলনা।

রাশিয়ার ষোলটি প্রজাতন্ত্রের মধ্যে আটটিতেই পরিপূর্ণ মুসলমান জন বসতি। আর বাকী আটটির ভিতরেও রয়েছে অনেক মুসলমান। রুশ ফেডারেশনের ভিতর উত্তর কোকাজ, দ্বীপ সদৃশ কোরাম এবং ঈদাল ও রালে (ভলগা নদীর আশপাশের অঞ্চল) তার পূর্ব পুরুষ তাতার ও বাশ্‌কাররা আবাদ রয়েছে। উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কিরগিজিস্তান, কাজাখিস্তান, উত্তর আজার বাইজান ও উত্তর ককেশাস অঞ্চলে তাদের জাতি ভাইরাই বসবাস করে। রুশী তুর্কিস্তান, যাকে "মাওয়ারা উন্নাহার" এবং মধ্য এশীয় প্রজাতন্ত্রও বলা হয়, আজও মুসলমানদের ইতিহাসও ঐতিহ্য বহন করে যাচ্ছে। এই সেই বোখারা সমরকন্দ,খিভা (খারজম) ও খোকন্দ, যার বিস্ময়কর কৃতিত্ব জগতকে করেছিল এক সময় উদ্ভাসিত। এ সব অঞ্চল তার

অতীত স্মৃতি বক্ষে ধারণ করে জগতের সামনে শিক্ষণীয় বস্তুরূপে আজও বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম বুখারী, ইমাম তিরমিযী, আল্লামা যমখশরী, ইমাম ছারাখ্ছী, দার্শনিক ফারাবী, দার্শনিক ইবনে সীনা প্রমুখ সকলে এই অঞ্চলেই চির নিদ্রায় শায়িত আছেন।

ইবনে কাফফাল, আবু আব্দির রহমান আছ্ছালামী, হাফেজ ইবনে মান্দাহ্, ইবনে নছর, ওমর বিন কাতাফাহ্, হাফেজে হাদীস আবু ছায়ীদ, হাইছাম বিন কুলাইব, ইমাম শাশী প্রমুখ কত বড় বড় মনীষী ছিলেন, যারা এই মাটিতে জন্মলাভ করে ইসলামী বিশ্বকে করেছিলেন উদ্ভাসিত। ফয়জানের এক একটি বিস্মৃত কাহিনী মনে পড়ছিল।

বিশ্বের মহান মুসলিম বিজেতা ছাহেব কেরান আমীর তৈমুরলং এর রাজধানী ছিল সমরকন্দ। এই সমরকন্দকে "রুয়ে জমী আছ্ত্" অর্থাৎ বিশ্বের চেহারা বলা হত। মসজিদে টিলা, মসজিদে বিবি খানম এবং তৈমুর বংশের শেষ শাসনকর্তা উলুগ বেগ গোরগানীর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় "মাদ্রাসায়ে উলুগ-বেগ গোরগানা" সহ সমরকন্দের আরো কত বড় বড় ঐতিহ্য বাহী মসজিদ মাদ্রাসার কথা ফয়জানের স্মৃতি পাতায় একে একে ভেসে আসছিল।

সোনালী অতীত কাহিনীর মধ্যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। মস্কো নদীর উম্মত্ত তরঙ্গ মালা থেকে ও বেশী প্রচন্ড ভাবে এসব ঘটনাবলী তার হৃদয়কে নাড়া দিচ্ছিল।

তৈমুরের প্রিয় নাতি যুবরাজ সুলতান মুহাম্মদ গোরামীর কবরের কারুকার্য খচিত ইমারত এশিয়া মাইনরে যার তুলনা পাওয়া সম্ভব নয়।

সমরকন্দের উর্বর মৃত্তিকা হতেই ইমামুল হুদা, আল ফকীহ্, আবুল লায়েস নছর বিন মুহাম্মাদ আছসমরকন্দী, নৈতিক বিজ্ঞানের উদ্ভাবক আবু যায়েদ দাবুসী সমরকন্দী, হাফেজে হাদীস রজা, ইমাম আবু দাউদ, মহান ফকীহ আলাউদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ সমরকন্দী এবং ইলমে কালাম তথা আকায়েদ শাস্ত্রের তুখোড় শাহ সওয়ার ইমাম আবু মানসর মাতুরীদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম) প্রমুখ জন্ম লাভ করেন।

বুখারার মাদ্রাসায়ে মীরআরব, মাদ্রাসায়ে আব্দুল আযীয, মাদ্রাসায়ে কালতাশ এসব ছিল এমন বৃহৎ ইসলামী বিদ্যালয় যেখান থেকে লক্ষ লক্ষ

জ্ঞান পিপাসুরা নিজেদের জ্ঞান তৃষ্ণা মিটিয়েছেন। এসব ইসলামী প্রতিষ্ঠান গুলোকে রাশিয়ার জারশাহী ও পরবর্তী বেদ্বীন কমিউনিস্ট শাসকরা বিরান ও ধবংস স্তুপে পরিণত করে দিয়েছে।

মসজিদে কেলাঁর মিনার হচ্ছে মধ্য এশিয়ার সবচেয়ে উঁচু মিনার। এখানেই রয়েছে মসজিদে মুগান্নি আতা, মসজিদে মুফলিহ এবং সিলসিলায়ে নকশে বন্দীয়ার ইমাম খাজা বাহাউদ্দীন নকশ্বন্দী (রঃ)এর কবর। সমরকন্দেরই উপকণ্ঠে রয়েছে মহান হাদীস বিশারদ "আলজামে 'আছ ছহীহ্" (বুখারী শরীফ) এর প্রণেতা হযরত ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইছমাঈল আল বুখারীর (রঃ) কবর। প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন আব্দিল্লাহ হিন্দুওয়ানী, যাকে বলখের ওলামাগন ইসলামী ফিকাহ্তে (ইসলামিক আইন বিষয়ে) অসাধারণ ব্যুৎপত্তির কারণে ছোট ইমাম আবু হানিফা বলে আখ্যায়িত করতেন, তিনিও ছিলেন এই বুখারারই সন্তান। মাওয়ারা উন্নাহার (বিশাল আমু দরিয়ার পার্শবর্তী অঞ্চলসমূহ) এর প্রখ্যাত ইমাম আবুবকর খাহার জাদা মাখদুম বিন হুছাইন, শামছুল আয়েম্মা আব্দুল আযীয বিন আহমাদ আল হালওয়ানী, ক্বাফী খানের উস্তাদ আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন ইছমাঈল প্রমুখ সকলেই বুখারার মৃত্তিকা থেকেই জন্ম গ্রহণ করেছেন।

খারেজমের বিখ্যাত আলেম ও জ্ঞান তাপস আবুবকর খারেজমী, মুহাদ্দেস মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ খারেজমী। ইনিই সর্ব প্রথম আকায়েদ শাস্ত্র, ডাক্তারী বিদ্যা, অংক ও সৌর বিজ্ঞানের সমন্বয়ে একটি ইনসাইক্লোপিডিয়া (বিশ্বকোষ) প্রণয়ন করেন।

অনুরূপভাবে তুর্কমেনিস্তানের মারভ শহরেও হাজার হাজার আলেম জন্মগ্রহণ করেন।

কিরগিজিস্তানের "উশ" শহরে জন্ম গ্রহণ করেন জগত বিখ্যাত আলেম ইমামুল হেরমাইন। কাজাকিস্তানের উবর্র ভুমিতে জন্ম গ্রহণ করেন বিখ্যাত বিখ্যাত বীর মুজাহীদ ও ওলামায়ে দ্বীন। "এসব বিস্মৃত ঘটনাবলী একে একে তার মানস পটে ভেসে ওঠছিল।"

ইতিহাস জীবন্ত হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। ইতিহাস হাত প্রসারিত করে তার বিবেককে নাড়া দিয়ে তাকে প্রশ্ন করছিল যে, তারা

সকলেই তো ছিলেন তোমাদের পূর্ব পুরুষ, যাদের কৃতিত্ব দেখে জগত ছিল হতবাক! এখন তোমরা বলো যে, তোমরা কি? বর্তমান ও ভবিষ্যত ইতিহাসে তোমাদের কি ভুমিকা থাকবে?

।।২।।

এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর খুঁজে না পেয়ে ফয়জান উগ্‌লু গোর্কী পার্কে চলে এলো। এখান থেকে ইউনিভার্সিটি বেশী দূরে ছিল না। কিছুক্ষণ পর সে ইউনিভার্সিটির উদ্দেশ্যে হাটা দিল।

ইউনিভাসির্টিতে ঢুকতেই সর্ব প্রথম তার দৃষ্টি পড়ল প্রাচ্য বিভাগের উপর। তার রক্ত টগবগ করে ওঠল।

সে ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল যে, ১৯৫৩ সালে ইউনিভার্সিটির এই বিভাগটি এজন্যই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, যেন এই বিভাগের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের সরল, সোজা, আবেগপ্রবণ ও হতাশাগ্রস্থ নওজোয়ানদের একত্রিত করে তাদের ব্রেনের ভিতর বিষাক্ত মতবাদ ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। এখানে স্টুডেন্টদের জ্ঞান অর্জনের নাম দিয়ে সমাজতান্ত্রিক ও নাস্তিক্যবাদ আদর্শ শিক্ষা দেওয়া হত, যাতে বিশ্বের সব জায়গায় কমিউনিজম বিপ্লব রফতানী করা যায়। তাদের উত্তেজনা ও উস্কানীমুলক শ্লোগান ও শিক্ষা দেওয়া হত যেন, তারা তাদের দেশে গিয়ে কমিউনিজম পরিপন্থী যে কোন শাসন ব্যবস্থাকে মুলোৎপাটন করতে পারে।

ফয়জান দেখতে পেল, ঐ প্রাচ্য বিভাগের ইমারত থেকে এমন কয়েকটি দেশের হতভাগ্য ছাত্র-ছাত্রী বেরিয়ে আসছে যাদের আকৃতি, প্রকৃতি রীতি-নীতি এবং ধর্ম সবকিছুই হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু এই ডিপার্টমেন্টে এদের সবাইকে কমিউনিজম মতবাদের একই ধরনের থিওরী কণ্ঠস্থ করানো হচ্ছে। একই ধরনের বিষ তাদের সকলের রন্ধে রন্ধ্রে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের সে সব বদকিসমত অপরিণামদর্শী এবং বদনসীব যুবক যুবতী যারা তথাকথিত প্রগতিশীল কসাইখানায় খুবই সন্তুষ্টচিত্তে স্বীয় শরীর, জান এবং আত্মাকে বলিদান দিয়ে যাচ্ছে।

এসব ছেলে মেয়েদের সরকার যারা একচ্ছত্র ভাবে তাদের অন্তর ও মস্তিষ্কের ওপরও হুকুম চালানোর অধিকার রাখার দাবী করে থাকে, তারা এ

সকল নিরপরাধ যুবক যুবতীদের মাত্র কয়েকটি ট্যাংক, সামরিক ও বেসামরিক বিমান, সড়ক, সেতু ও খাদ্যের বিনিময়ে এক ভিন জাতির কাছে বন্ধক রেখে দিয়েছে।

মানব ইতিহাসে মানুষ ও তার বিবেক বেচাকেনার এমন ভয়ানক চিত্র ইতিপূর্বে কেউ কি দেখতে পেয়েছে?

এসব যুবক-যুবতীদের অভিভাবকদের উপর ফয়জানের চরম ঘৃণা সৃষ্টি হল। তার দৃষ্টি ইউনিভার্সিটির বিশাল অট্টালিকার বিভিন্ন ব্লক পর্যবেক্ষণ করে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল।

সবশেষে সায়েন্স তথা বিজ্ঞান ব্লকের সামনে এসে তার চোখ স্থির হয়ে এলো। একটি বিষমাখা ঈষৎ হাসি তার ঠোঁটের ওপর আপনা আপনি ছড়িয়ে পড়ল।

সে জানতো, এই উন্নত ইমারতটিতে শিক্ষার আঁড়ালে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যবাদের সবক পড়ানো হয়। এখানে যুবক ও যুবতীদের স্বয়ং তাদের আপন দেশ ও জাতিকে ধ্বংস ও বরবাদ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এখানে সেতু এবং সড়ক তৈরীর প্রশিক্ষণের পরিবর্তে সেগুলো কিভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায়, সে সব পদ্ধতি শেখানো হয়। তাদের নির্মাণ ও গঠনের পরিবর্তে ধ্বংসের সবক পড়ানো হয়। এই নামে মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের একটি শাখাও রয়েছে, যেখানে বিকৃত ইতিহাস পড়িয়ে বিকৃত মন মানসিকতা তৈরী করা হয়, যেখানে বিশ্ব ইতিহাসের মহামনীষীদের একমাত্র এই অপরাধে মহান ভাবা হয় না, যেহেতু তারা কমিউনিস্ট ও নাস্তিক ছিলেন না। যেখানে ধর্মকে এই বলে বিদ্রূপ করা হয়ে থাকে যে, এটা হচ্ছে শাসক শ্রেণীদের শোষণ করার একমাত্র হাতিয়ার। এটা হচ্ছে এমন ধরনের আফিম যা দরিদ্র ও সরল লোকদের ভক্ষণ করিয়ে তাদের চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে দেওয়া হয়।

।।৩।।

ফয়জানের মন চাইলো না আজ ক্লাশ রুমে যেতে। সে সোজা লাইব্রেরীতে ঢুকল। আজ তার মুখ লাইব্রেরীর সেই প্রান্তের দিকে ছিল যে দিকে ভুলক্রমেও কেউ যেতে হিম্মত করতো না। কারণ, সেটা ছিল সংরক্ষিত

প্রান্ত। ওখানে আলমারীতে বইগুলো শুধু এজন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছিল যে, এগুলো একমাত্র বিদেশী অতিথিরা দেখবে, অন্য কেউ নয়।

ফয়জানের পা দুটো অনিচ্ছাসত্বেও সে দিকে ওঠছিল। তার দৃষ্টি মানব দেহসম উচুঁ আলমারীগুলোতে সাজানো বইসমূহের উপর ধীরে ধীরে পড়ছিল। অবশেষে একটি বইয়ের উপর এসে নজরটা থেমে গেল। এই বইটি হচ্ছে তুরস্কের ও সামানী খেলাফত যুগের বিস্ময়কর ইতিহাস সম্পর্কে। ফয়জান বইটি হাতে নিয়ে যখন ইস্যু করানোর উদ্দেশ্যে লাইব্রেরীয়ানের কাছে গেল। তখন লাইব্রেরীয়ান মাত্র এক বার তার দৃষ্টিটা উপর উঠিয়ে ফয়জানের দিকে গভীর ভাবে তাকালো। অতঃপর বইটি তার নামে ইস্যু করে দিল। ফয়জান যখন লাইব্রেরীর দরজা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিল, ঠিক সে মুহূর্তে লাইব্রেরীয়ান ফয়জানের তদারককারী দায়িত্বশীল মাষ্টারকে তার বিপথগামী হওয়ার দুঃসংবাদ শুনাচ্ছিল।

।।৪।।

ফয়জান বইটি হাতে নিয়ে বুঝতে পারলো যে, শুধু আলমারীর সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য বইটি এখানে রাখা হয়েছে। নতুবা আজ পর্যন্ত কেউ বইটি পড়া তো দূরের কথা, স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। স্বীয় কক্ষে এসে ফয়জান ধীরে ধীরে বইটির বক্ষ বিদীর্ণ করতে লাগল। তার মনের পদার্য় একটি বিস্ময়কর দৃশ্য ফুটে ওঠল।

ওসমানী তুর্কী বীর মুজাহিদীনের অশ্বগুলো পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপকে পদানত করার পর রাশিয়ার দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছে।

তাদের অশ্বের হ্রেষা রবে রাশিয়ার কুফরিস্তানকে প্রকম্পিত করে তুলছিল। তার কর্ণ কুহরে বেজে ওঠল মুজাহিদীনের তলোয়ারের ঝংকার। এটা ছিল তার পূর্ব পুরুষদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। এমন দীপ্তিমান অধ্যায় যা বর্তমানে ধূলো বালিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তার চমকটা ঢাকা পড়েছে কালো মেঘের আবরণে।

রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত সে ইতিহাসের পাতা উল্টাচ্ছিল। এক একটি পৃষ্ঠা পড়ার সময় তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। তার মন চাচ্ছিল

যে, সে চিৎকার করে তৃতীয় বিশ্বের যে সব বদনসীব ছাত্র-ছাত্রী এখানে পড়তে এসেছে তাদের বলে দেয় যে, সেই জাতিই দুনিয়ার বুকে জীবিত থাকার অধিকার রাখে যারা নিজেদের বিবেক ও অন্তরকে কখনো বিক্রয় করে না, যারা ইমিটেশনের চমক ও উজ্জ্বলতাকে স্বর্ণ ভেবে প্রতারিত হয় না, যারা নিজেদের বাহু শক্তির বলে জীবিত থাকার গুরুত্বকে অনুধাবন করে।

পক্ষান্তরে যারা মানসিক গোলামীকে গ্রহণ করে নিয়েছে, যারা নিজেদের স্বকীয় তাহ্জীব তমদ্দুনকে ছেড়ে দিয়ে বিজাতীয় রীতি-নীতির পদাঙ্কঅনুসরণ করে, তারাই হচ্ছে এমন নরাধম জাতি যারা নিজেদের মর্জি মাফিক জীবন যাপন করার অধিকারকে অন্যের হাতে বিক্রি করে দেয়।

।।৫।।

বইটি একদিকে রেখে সে খাটের উপর শুয়ে পড়লো। তখন তার মনটা চলে গেল স্বীয় মাতৃভূমি আফগানিস্তানে। হিন্দুকোশ ও বাইয়ানের বিশাল পর্বতশ্রেণী, সেই আমুদরিয়া কাবুলেও যার প্রবাহ রয়েছে। সবুজ শ্যামল পাহাড় বন বনানী উপত্যকা, ফল-মূল দিয়ে ভরপুর বৃক্ষের সীমাহীন ধারা এবং প্রতিটি অলিগলিতে বিদ্যমান স্বাধীন ও ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ আফগানীদের মহান ঐতিহ্য যা তাদের প্রতিটি অনুপরমাণু থেকে বহিঃপ্রকাশ ঘটছে।

"না.............আল্লাহর কসম, না.........।"

কে যেন তার ভিতর থেকে চিৎকার দিয়ে বলে ওঠল "আমি নিজের ইতিহাস ঐতিহ্যকে কখনই লজ্জিত হতে দেবো না। আমি নিজের তাহজীব তমদ্দুনকে ভিন্নজাতি ও বেদ্বীনদের পদতলে কখনই নিষ্পেষিত হতে দেখতে পারবো না। আমি সত্য ও ন্যায়ের জন্য নিজের শেষ রক্তটুকু বিলিয়ে দিতে কখনো কার্পণ্য করবো না।"

তার চিত্ত অস্থির হয়ে উঠছিল। তার ভিতর দিয়ে ঝড় বয়ে যেতে লাগলঃ

"অভিশাপ, শত ধিক্কার এমন প্রগতির উপর, আমি চাইনা এমন উন্নতি যা আমার ধর্ম আমার ইতিহাস ঐতিহ্য মান সম্মান বিকিয়ে দেওয়ার পর অর্জিত হয়। আমি শুধু চাই ঈমান নিজের জন্য নিজের জাতির জন্য। চাই

এমন ঈমানী শক্তি, যে আমাদের একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করার প্রেরণা জোগায়, যে আমাদের দান করে হিম্মত এবং সঞ্চার করে শক্তি।

তার মন স্বাক্ষ্য দিল ঃ

"ফয়জান! প্রকৃত অর্থে আজ তুমি স্বাধীন হলে।"

"স্বাধীন? কেমন স্বাধীন? তোমার হাত পা তো এখনো জিঞ্জিরে আবদ্ধ রয়েছে, তাহলে তুমি স্বাধীন কিভাবে হলে?"

সে নিজে নিজকে প্রশ্ন করলো।

"হ্যা, আমি স্বাধীন, আমার হাত-পা জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকা সত্বেও আমি স্বাধীন। কারণ, আমি কারোর গোলামী মেনে নেবো না, কারো কাছে নতি স্বীকার করবো না। আমার আত্মাকে বিকিয়ে দেবো না। আমি স্বাধীন, প্রকৃত অর্থেই আমি স্বাধীন। ফয়জান সাধারণ মানুষ থেকে একজন মুজাহিদ, আল্লাহর পথের সৈনিক হয়ে গেল। তার মধ্যে উন্মেষ ঘটল ঈমানী চেতনার। যার ঐতিহ্য হচ্ছে গাজী রূপে জিন্দা থাকা, সে হচ্ছে সেই পাঠান সন্তান। যার কানে আবার বেজে ওঠছিল কুফর ও ধর্মহীনতার আধাঁরকে দূরীভুত করে ঈমান ও ইসলামের জ্যোতিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যুদ্ধরত ঘোড়ার খুরের ধ্বনি। সেই গাজীদের অশ্বের হ্রেষারব ও তাদের তরবারির ঝনঝনানী শুনতে শুনতে সে গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়ল।

।।৬।।

মস্কোর প্রভাতকে আজ পুনরায় গভীর কুয়াশা এবং প্রচন্ড শীত গ্রাস করে নিয়েছিল। ফয়জান সকালে ঘুম থেকে ওঠে ইউনিভার্সিটি যাওয়ার পরিবর্তে সোজা আফগান দুতাবাসে গেল। সে দুতকে পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে বলল যে, "আমার পক্ষে এখানে একাগ্রচিত্তে পড়া-লেখা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ আমার ব্রেন এত উন্নত মানের নয়। আর দ্বিতীয়তঃ খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করার জন্য আমাকে কাবুলে জরুরী ভিত্তিতে যেতে হবে।"

"সেই কাজটি কি? যা সম্পাদন করার জন্য তোমাকে কাবুলেই যেতে হবে, মস্কোতে কি সেই কাজটি পূরণ করা সম্ভব নয়?" দূত ফয়জানের বক্তব্য শুনার পর তাকে জিজ্ঞেস করলো।

"জি, না! কাজের ধরনই এমন যে, সেটা কাবুলেই সম্ভব, মস্কোতে নয়। ঐ কাজটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সেটা আমাকেই করতে হবে। অন্যের দ্বারা সম্ভব নয় এবং তাও অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে। বিলম্ব হলে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবো।"

ফয়জান কথা বলার সময় খুবই সতর্কতা অবলম্বন করছিল। যেন দূত তার ওপর কোন ধরনের সন্দেহ করতে না পারে এবং ঘুর্ণাক্ষরেও বুঝতে না পারে যে, তার বৈপ্লবিক চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটেছে এবং তার মধ্যে পুনরায় মোল্লাতন্ত্রের বীজ ঢুকেছে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত আলাপের পর অবশেষে ফয়জান দূতকে বুঝাতে সক্ষম হল। ঠিক তিন দিন পর ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ ফয়জানকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দিল।

।।৭।।

মস্কো এয়ারপোর্টে উড়োজাহাজে চড়তেই সে তার অতীত ও বর্তমান নিয়ে কিছুটা ভাবতে লাগল। তার মনে পড়ল ঐদিনটির কথা, যখন ভিলেনতিনা এয়ার হোস্টেজ হিসেবে তার এবং ইয়াসমীনের সেবা ও খাতিরদারী করেছিল। কিন্তু ভিলেনতিনা এখন কোথায়?

ফয়জান বিমানের জানালা দিয়ে মস্কো এয়ারপোর্টের চতুর্দিকে তার নজরটা একবার বুলিয়ে নিল। এয়ারপোর্টে মৃত্যুপুরীর ন্যায় নিরবতা বিরাজ করছিল। প্রচন্ড শীতে কম্পমান একজন সশস্ত্র প্রহরীকে রানওয়ের উপর বেশ খানিক দূরে সে দন্ডায়মান দেখল।

এর আগে সে আর কিছুই দেখতে পেলো না। তার দৃষ্টিটা বস্তু জগত থেকে কল্পনা জগতে চলে গেল। তার মনের পর্দায় একটি ছবি ভেসে ওঠল। সেই ছবিটি হচ্ছে ভিলেনতিনার।

"ভিলেনতিনা, প্রিয় ভিলেনতিনা! দেখো, আমি তোমারই মিশন পূরণ করার জন্য আমার মাতৃভূমির দিকে পাড়ি জমাচ্ছি।"

তার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপছিল।

না জানি কতক্ষণ পর্যন্ত সে এভাবে বিড়বিড় করছিল। তার প্রত্যুত্তরে একটি নরম, মসৃণ, স্নিগ্ধ কোমল হাত শূন্যে আন্দোলিত হচ্ছিল যে, যেন সে ফয়জান কে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বলছে ঃ

"যাও ফয়জান, যাও তুমি তোমার জাতিকে রুশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সর্তক করো। তাদের জাগিয়ে তুলো। নাস্তিক ও বেদ্বীন আধিপত্যবাদীদের কালো ছোবল থেকে তুমি তোমার জাতিকে রক্ষা করো। সৃষ্টিকর্তা তোমার সহায় হোন। আল্লাহ হাফেজ।"

"আল্লাহ হাফেজ।" ফয়জানও ক্ষীণসুরে তার উত্তর দিল।

বিমানের ইঞ্জিন গর্জে ওঠল।

"আল্লাহ হাফেজ ভিলেনতিনা! আমি তো আসলে আমার অতীত ও বিস্মৃত অধ্যায়কে তালাশ করতে যাচ্ছি। ভিলেনতিনা তুমি সাক্ষী থেকো।" ফয়জান শব্দগুলো পুনরায় আওড়ালো।

জাহাজটি দ্রুতগতিতে রানওয়ের উপর দিয়ে দৌড়াতে লাগল। অতঃপর একটা মৃদু ঝটকা দিয়ে শূন্যের উপরে উঠে গেল। সে দ্রুত গতিতে মস্কো হতে দূর এবং কাবুলের কাছাকাছি হতে লাগল।

চিত্র ও চিত্রকর

যতক্ষণ পর্যন্ত বিমানটি আকাশে উড়ছিল, ফয়জান নিজের মনোদৃষ্টিকে অন্য কোন দিকে নিবদ্ধ করতে পারল না। তার ভাবনার লক্ষ্যবস্তু ছিল ভিলেনতিনা ও তার শেষ পয়গাম। উড়ো জাহাজটি যেই মাত্র শূন্য হতে নীচে নেমে কাবুল এয়ারপোর্টের রানওয়ে স্পর্শ করল, ফয়জানের ভাবনার মধ্যেও পরিবর্তন এসে গেল। সে তড়িৎ গতিতে নিজের সুটকেসটি হাতে নিল এবং অন্যান্য যাত্রীদের মত সেও জাহাজের দরজার দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

রাজধানী কাবুল প্রচন্ড ঠান্ডায় কাঁপছিল। বিমানটি এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করতেই মনে হল, যেন শীতের প্রকোপটা বেড়ে গেছে। যদিও জাহাজের দরজা এখনো খোলা হয়নি। কিন্তু না জানি কোথা থেকে হাঁড় কাঁপানো বরফের হাওয়া জাহাজের ভিতরে এসে ঢুকে পড়েছে।

অতঃপর বিমানের দরজা খুলে গেল। ফয়জানের দৃষ্টি এয়ারপোর্টের উঁচু উঁচু আধুনিক দালান ও অট্টালিকার ওপারে অবস্থিত গ্রাম ও বস্তির সে সব মানুষের ছবির উপর নিবদ্ধ হয়ে গেল যারা ধীরে ধীরে তার চোখের পথ দিয়ে অন্তরের গভীরে ঢুকে পড়ছিল।

তার মনটা খানিকের জন্য উদাস ও বিষন্ন হয়ে পড়ল। কিন্তু পরক্ষণেই কে যেন তার কানে কানে বলে দিচ্ছিল ঃ

"ফয়জান ! তুমি কি এসব ছবির মধ্যে রং ভরার জন্য মস্কো থেকে এখানে এসেছো, কালের আবর্ত যাদের এতই অস্পষ্ট ও কুয়াশাচ্ছন্ন করে রেখেছে?"

"হ্যাঁ", আমি আজ ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল ঘটনাগুলোকে পুনরাবৃত্তি করার জন্যই এখানে এসেছি। এ মুহূর্তে আমি হচ্ছি সে সব মুজাহিদীন ও মহামনীষীদের সত্যিকারের উত্তরসূরী, যারা জগতে ইতিহাস সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। কুদরত যদি আমাকে আমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার অবকাশ না দেয়, বরং তার পূর্বেই আমার জীবনের অবসান ঘটে, তাহলে

আমার পরবর্তী বংশধররা সেই ছবিগুলোর মধ্যে রং ভরবে এবং বংশ পরম্পরা তারা তাদের দায়িত্ব পালন করে যাবে, ইনশাআল্লাহ।" ফয়জান দীপ্ত শপথের সাথে তার মনকে উদ্দেশ্য করে জবাব দিল।

"বলা তো খুবই সহজ; কিন্তু বৎস! তোমার শপথ বাস্তবায়িত করার জন্য তোমার কাছে কি কোন হাতিয়ার রয়েছে?" কে যেন কানে কানে তাকে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ, আমার কাছে দু'টি হাতিয়ার রয়েছে।" ফয়জানের ওষ্ঠদ্বয়ে ইষৎ হাসি ছড়িয়ে পড়লো।

"একটি হাতিয়ার তো হচ্ছে আমার ঈমানী জযবা ও ঈমানী চেতনা এবং আরেকটি হাতিয়ার হচ্ছে আমার বাহুবল।" সে শূন্যের মাঝে নিজের ডান হাত খানা মুষ্ঠিবদ্ধ করে আন্দোলিত করে বললঃ

"আমার শরীরের টাটকা ও জোয়ান রক্ত ঐ সকল অস্পষ্ট ও অধঃপতন গামী ছবিগুলোকে আবার পুনরুজ্জীবিত করে তুলবে। তাদের চমক ও জ্যোতি আবার ফিরিয়ে আনবে। আমার বাহু আমার স্বপ্নকে লজ্জিত হতে দেবে না।"

ফয়জানের অন্তরের আওয়াজগুলো মনে হয় বাতাসের ঝাঁপটাও শুনে ফেলেছিল, যে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ছিল উদ্গ্রীব। প্লেনের দরজা খুলতেই একঝাক বাতাস ভিতরে ঢুকে পড়ল। কাবুলের আকাশ বাতাস যেন নিজ বাহাদুর সন্তানের জন্য প্রার্থনায় মগ্ন ছিল।

জাহাজের সিঁড়ি লেগে গেল। সেই সিঁড়ি বেয়ে ফয়জানও অন্যান্য প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে নীচে নামছিল। তার পা দুটো কাবুলের মাটি স্পর্শ করতে যাচ্ছে, ঠিক সে মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটে গেল। একটা মজবুত ও শক্তিশালী হাত ঝাপটা মেরে তার হাত থেকে তার স্যুটকেসটা ছিনিয়ে নিল। তার শরীরে আগুন ধরিয়ে দিল। ঘাড় ফিরিয়ে সে সেই সন্ত্রাসীর অনুসন্ধান করতে যাচ্ছিল যে, অন্যদিক থেকে চারটি শক্তিশালী হাত তারদিকে অগ্রসর হতে সে দেখল। কিছু বুঝে ওঠার পূর্বেই চারজন হাট্টা কাট্টা ফৌজী তার উভয় বাহুকে শক্তকরে ধারন করে জনতার ভীড় থেকে তাকে পৃথক করে ফেলল। আফগান গোয়েন্দা 'খাদ'-এর জোয়ানরা ভোর হতেই এয়ারপোর্ট থেকে ফয়জানকে গ্রেফতার করার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তার আসার

সময়সূচীও তারা জেনে নিয়েছিল। তার বিদ্রোহী মনোভাব সম্পর্কে তারা রাশিয়ান গোয়েন্দা সূত্রে সংবাদ পেয়েছিল। এয়ারপোর্টি এরিয়ার ভিতরেই খাদের একটি বিশেষ সেল ছিল। ফয়জানকে তারা সেখানে নিয়ে গেল। সেখানে নিয়ে তারা তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পূর্বেই তার ওপর আক্রমণ শুরু করে দিল। তারা তাকে হিংস্র পশুরমত পিটাতে লাগলো। ফয়জান কিছুই বুঝে ওঠতে পারছিল না যে, তারা কেন তাকে পিটাচ্ছে। প্রথম প্রথম সে অনেক চিল্লালো। তাদের জিজ্ঞেস করতে লাগল যে, কি অপরাধে তার উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে? কিন্তু তাদের জুলুমের অট্টহাসির সামনে তার কোন কাকুতি কাজে এলো না। ধীরে ধীরে তার প্রতিরোধ শক্তি লোপ পেতে লাগল। হঠাৎ একটি শক্তিশালী লাথি তার তলপেটে আঘাত হানলো। ফলে সে নেতিয়ে পড়লো। তার অনুভব হল যেন কোন একটি জিনিস খুব দ্রুতিগতিতে তার পাকস্থলি থেকে গলার দিকে ধেয়ে আসছে। সে আত্মসংবরণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালালো। কিন্তু আঘাত এত মারাত্মক ছিল যে, মাটিতে লুটিয়ে পড়তে বেশী দেরী হলো না।

ধপাস করে সে ভূমিশায়ী হল। এরপর সে গভীর অচেতনে ডুবে গেল।

।।২।।

ফয়জানের যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন সে নিজেকে একটি সংকীর্ণ ও অন্ধকার কুঠুরীতে আবদ্ধ পেলো। তার মাথা হতে অনেক উপরে এক কোণে একটি বাল্ব মিটমিট করে জ্বলছিল।

হুঁশ ফিরে আসার সাথে সাথে তার মনে হল যেন তার শরীরের সমস্ত হাঁড়-গোড় ভেঙ্গে চুর মার হয়ে গেছে। তার মাথায় এখনো ভীষণ ব্যথা করছিল। ধীরে ধীরে সে পরিপূর্ণ রূপে সম্বিৎ ফিরে পেলো। তার জ্ঞান ফিরে এসেছে দেখে একজন আসকারী (আর্মি) তার দিকে ধাবিত হল এবং সেই অন্ধকার কুঠুরীর সামনে এসে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেই আসকারীটি নীরবে ফয়জানকে দেখতে লাগল। ফয়জানও মাথা উঁচু করে তার দিকে তাকালো। কিন্তু ফয়জান তাকে কিছু বললো না। সে ভাবলো যে, কিছু বলাটা একেবারে অনর্থ হবে। কারণ, একজন সিপাহীর কোন দাম নেই। তার কাছে কিছু

বলাটা বৃথাই হবে। ফয়জানকে খামোশ দেখে আসকারীটি কিছুটা সাহস সঞ্চার করে বলল ঃ "ঘাবড়াবে না। নওজোয়ান! আল্লাহ মঙ্গল করবেন। ধৈর্য্য ধারণ করো।"

আসকারীর মুখে আল্লাহ্র নাম শুনে ফয়জান প্রথম তো তার সেই আশীর্বাদমূলক বাক্যগুলো মুখে কয়েক বার আঁওড়ালো। সে কিছুটা অবাকও হল এবং তার মধ্যে ক্রোধও সৃষ্টি হল যে, এ ধরনের হিংস্র জালেম বে-দ্বীন সৈন্যরা আল্লাহ্র পবিত্র নাম মুখে কেন লয়? এদের মুখেতো আল্লাহ্র নাম শোভা পায় না!

কিন্তু ফয়জান ঐ লোকটির পজিশন চিন্তা করে তার জন্য নিজের মধ্যে কিছুটা শ্রদ্ধা বোধ সৃষ্টি হল। সে জানতো যে, এই বেচারা অবশ্যই কোন উপায় না পেয়ে এখানে চাকুরী করছে। নতুবা কোন আফগানীর ঈমানী চেতনা তাকে এধরনের অনৈসলামিক বেদ্বীন এবং নাস্তিক সরকারের কাছে মাথা নত করতে মোটেও অনুমতি দেবে না। বেচারা হয়ত! পেটের দায়ে মনের উপর পাথরের বোঝা চেপে জীবন সংগ্রামের গাড়ী টেনে যাচ্ছে।

"আমাকে কি কিছুটা পানি পান করাতে পারবেন? আমার ভীষণ তৃষ্ণা পেয়েছে।" ফয়জান আসকারীটিকে লক্ষ্য করে বলল। সে বুঝতে পেরেছিল যে, তার প্রতি সৈনিকটির হামদর্দী ও সহমর্মিতা বোধ রয়েছে।

"অবশ্যই অবশ্যই। এক্ষুনি তোমার জন্য পানি নিয়ে আসছি, একটু সবুর করো।" এই বলে সৈনিকটি পানি আনতে চলে গেল। তার ফিরে আসতে পাঁচ মিনিট সময় ব্যয় হল। সৈনিকটি ফয়জানের জন্য ব্যথা উপশমের কিছু ট্যাবলেটও নিয়ে এলো গোপনে। ফয়জানকে দেখে সৈনিকটির অন্তরে তার জন্য মায়া সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও তার কছে এসব কোন নতুন ব্যাপার ছিল না। এধরনের অনেক বিপথগামী নওজোয়ানদের অহরহ খাদের কমিউনিষ্ট সদস্যরা এই টর্চার সেলে তাদের মেজাজ ঠিক করার জন্য নিয়ে আসতো। অতঃপর এক-দু মাস পর তাদের এখান থেকে কোন অজানা স্থানে নিয়ে যেতো। তখন তাদের জীবনের উপর কোন ধরনের তুফান বয়ে যেতো, তার খোঁজ কেউ পেতো না।

"নওজোয়ান! জলদি করে পানি পান করে নাও। তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি যে, তুমি কাউকে বলো না যে, আমি তোমাকে পানি দিয়েছি।" সৈনিকটি ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে ফয়জানের কাছে আবদার করলো।

"শুকরিয়া, ধন্যবাদ, আমার মুহসিন! আপনি এব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।" বলে ফয়জান সৈনিকটিকে একটু গভীর দৃষ্টিতে দেখল।

এরপর মুখখানা সে অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিল। সে নিজেও চাচ্ছিল না যে, তার কোন কাজ অন্যের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হোক। ট্যাবলেট খাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে ফয়জান কিছুটা আরাম বোধ করতে লাগল।

।।৩।।

সিপাহীটি সেই কুঠুরীর সামনেই দাঁড়িয়ে রইল। ফয়জান ভাবতে লাগল যে, সৈনিকটি পাঠান হওয়া সত্ত্বেও কেন এতো ভীত ও সন্ত্রস্ত? এটাতো পাঠানদের প্রকৃতির সাথে মোটেও খাপ খায় না। সে সৈনিকটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল ঃ "বাবা! আপনাদের ইসলামী চেতনা, মান-মর্যাদাবোধ কি মরে গেছে? আপনি তো একজন বৃদ্ধ মানুষ, প্রথম কথা হচ্ছে আপনি একজন মুসলমান। আপনি কি আপনার মহান ইতিহাস, ঐতিহ্যকে ভুলে গেছেন?" ফয়জান নিজের অদম্য আবেগকে আর লুকিয়ে রাখতে পারলো না।

"বেটা! আমি এখানে চাকুরী করি না, আমি তো একজন চিত্রকর। এখানেও চিত্র অংকন করছি। এখানে আমার মেইন উদ্দেশ্য চাকুরী করা নয়।"

"আপনি চিত্রকর, কার চিত্র অংকন করছেন?" ফয়জান চমকে ওঠল। বৃদ্ধ আসকারীর কথায় সে আঁচ করতে পারল যে, বৃদ্ধ কোন সাধারণ লোক নন, বরং কোন কুশলী ও দার্শনিক হবেন।

"হ্যাঁ, আমি শুধু ছবিই অংকন করি না বরং ছবি খোঁজ করেও বেড়াই বটে। আর কিছু চিত্রতো আমার কাছে একা একাই চলে আসে। সেই চিত্রগুলোর মধ্যে থাকে অস্পষ্টতা, তার নকশার মধ্যে প্রয়োজন হয় রং ভরার; যাতে সেই ছবিগুলো ইতিহাসের পাতায় চিরভাস্বর হয়ে যায়।"

সে খানিকক্ষণ থামল। অতঃপর ক্ষীণ সুরে বললঃ "তুমিও আমার পছন্দসই একটি ছবি, তবে তোমার রং ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তোমার মধ্যে আমার কলিজার রক্তের রক্তিম আভা ভরে দেবো।"

ফয়জান তার কথার সারমর্ম বুঝে ফেলেছিল। এই বৃদ্ধ দার্শনিক চিত্রকর তার ভিতর উঁকি মেরে তার অন্তরের জগতকে অনুসন্ধান করে নিয়েছিলেন। মনে হয় তিনি এ ধরনের ছবিরই তালাশে থাকেন।

"আমার বুজুর্গ! আপনি কিঞ্চিৎ আভাস তো দিন যে, আপনি এসব ছবি দিয়ে কি কি কাজ নেন?" ফয়জান জিজ্ঞেস করলো।

"এমন ধরনের কাজ নিয়ে থাকি, যার সফলতা করার জন্য তুমি মস্কো ইউনিভার্সিটিকে বিদায় জানিয়েছো এবং আজ এই বৃদ্ধ সিপাহীর চিত্রাংকনের পরীক্ষা নিচ্ছো।" বৃদ্ধ সৈনিকটি বললেন, তিনি কিছুক্ষণ ফয়জানের চোখে উঁকি মারলেন। অতঃপর ধীরে ধীরে বলতে লাগলেনঃ "আমার চিত্রগুলো যুদ্ধের ময়দানের দিকে দৌড় দেয়। স্নেহের বেটা! তারা ইতিহাসের সে সব চিরভাস্বর পৃষ্ঠাগুলোকে উদ্ভাসিত করার ভাবনায় ব্যাকুল থাকে, যেগুলো কালের আবর্ত এবং প্রলয়ংকারী তুফান জ্যোতিহীন করে দিয়েছিল। তারা নিজেদের গরম ও টাটকা খুন প্রবাহিত করে ইতিহাসের সেই অধ্যায়কে আবার রঙিন করার জন্য থাকে উদগ্রীব ও সচেষ্ট।"

ফয়জান বৃদ্ধের কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। সে যেই বৃদ্ধকে একজন মামুলী ও সাধারণ সিপাহী ভেবেছিল। তিনিতো একজন অসাধারণ ব্যক্তি এবং মহান চিত্রকর; যিনি ঐ সব ছবির পুনরুত্থানে আবার রং ভরতে চাচ্ছেন, যার জন্য স্বয়ং সেও মস্কো ইউনিভার্সিটি পরিত্যাগ করে এখানে এসেছে।

ফয়জান তাকে কিছু বলতে চাচ্ছিল, কিন্ত সিপাহীটি তার ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে খামোশ থাকার ইংগিত করলেন।

।।৪।।

খানেক পরেই ফয়জান একজন লেফটেন্যাট ও তিনজন সিপাহীকে তার দিকে আসতে দেখল। তখন তার বুঝে এলো যে, বৃদ্ধ সৈনিকটি কেন তাকে চুপ থাকার জন্য ইশারা করেছেন। লেফটেন্যান্ট ও সিপাহীরা তার কুঠুরীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। লেফটেন্যান্ট দেওয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসা ফয়জান উগলুর দিকে একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। সে নিজের ঠোঁট দুটো ভ্যাকা চ্যাখা করে ফয়জানকে লক্ষ্য করে ঘৃণা ভরে বলতে লাগলঃ "হ্যাঁ, হ্যাঁ, মোল্লা হতে চাইছো মিষ্টার উগলু!" সে দাঁত কড়মড় করে ফয়জানকে গালি-গালাজ শুরু করে দিল। ফয়জান এ ধরনের কটু বাক্য কখনো সহ্য করতে পারেনি। তার মনে হচ্ছিল, যেন কেউ গরম গলিত সীসা তার কানের মধ্যে ঢেলে দিয়েছে!

প্রত্যুত্তরে ফয়জানও লেফটেন্যান্টকে লক্ষ করে গালি বর্ষণ শুরু করলো।

"বের করে নিয়ে আসো ওকে এখান থেকে।" লেফটেন্যান্ট ক্রোধম্বিত হয়ে চিৎকার দিয়ে সাথী সৈনিকদের নির্দেশ দিল এবং নিজের পকেটের সাথে ঝুলানো বাঁশিটিও বাজিয়ে দিল। ফলে দেখতে দেখতে কুঠুরীর সামনে সৈনিক দিয়ে ভরে গেল। লেফটেন্যান্টের একজন সহচর প্রকোষ্ঠের দরজা খুললো। সাথে সাথে পাঁচ ছয়জন সৈনিক ডান্ডা ঘুরাতে ঘুরাতে ভিতরে ঢুকে পড়লো এবং শপাৎ শপাৎ করে ফয়জানের উপর লাঠি বর্ষণ করতে লাগল। একবার পুনরায় সে এয়ারপোর্টের মত সেই কষ্টদায়ক পরিস্থিতির সম্মুখীন হল। এবার সে খুব তাড়াতাড়ি সম্বিৎ হারিয়ে ফেলল। এরপর তার খবরই রইল না যে, কোন ধরনের আযাব তার উপর পতিত হচ্ছে।

।।৫।।

জ্ঞান ফিরে এলে সর্ব প্রথম তার দৃষ্টি পড়ল সেই বৃদ্ধ সৈনিকের উপর, যিনি মানুষের আত্মার উপর চিত্র অংকন করেন। তিনি ফয়জানের কুঠুরীর লোহার সিকের সঙ্গে মাথা লাগিয়ে অপেক্ষা করছিলেন যে, কোন্ সময় ফয়জানের নিথর নিস্তব্দ শরীরের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার সৃষ্টি হয়। উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হল। অতঃপর তিনি ফয়জানকে লক্ষ্য করে বললেনঃ "বেটা! আমি তোমার স্বাধীন চেতনা ও ঈমানী জযবাকে জানাই হাজার সালাম । আমি মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করি যেন তিনি তোমাকে আরো শক্তিশালী ঈমান দান করেন। আমি হাজার বার স্বীকার করতে বাধ্য যে, আমাদের মাতৃভূমিকে কদাচিৎই তোমার মত সন্তান নসীব হয়। তবে তোমাকে একথাটিও বুঝিয়ে দেয়া আবশ্যক মনে করি যে, তোমার শরীর ইস্পাতের হলেও অবশেষে কতদিন পর্যন্ত এ সব পাষন্ড জালেমদের আঘাত ও নির্যাতন সহ্য করতে সক্ষম থাকবে? এমন অবস্থা চলতে থাকলে একদিন তো এমন আসবে যখন তোমার মৃত বা অর্ধমৃত শরীর রাতের অন্ধকারে কাবুল নদীতে ছুঁড়ে ফেলা হবে। নদীর সেই পানির গর্ভে তোমাকে নিক্ষেপ করা হবে, যার তরঙ্গরাজি তোমার মত কত স্বাধীন চেতনাসম্পন্ন আফগান নওজোয়ানদের রক্ত দিয়ে রক্তিম আকার ধারন করেছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে অপেক্ষা করছে এমন মর্দে মুজাহিদ, যে সামনে অগ্রসর হয়ে এসব তরঙ্গমালাকে পয়গাম শুনিয়ে দেবে যে, অতীতের সেই ইতিহাস যার রূপের মধ্যে পড়েছিল কুয়াশা ও কালিমা, আজ সে পুনরায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে, আবার সেই রূপটি হয়ে উঠছে যৌবন ও দিপ্তীময়।"

বৃদ্ধ সৈনিকটি কিছুক্ষণের জন্য থামল। এর পর আবার বলতে শুরু করলঃ "বেটা! তোমার যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে তার পরিণতি কি দাঁড়াবে, তা কি তুমি ভেবে দেখেছো?"

"পরিণতি কি দাঁড়াবে, সেটাতো আমি ভেবে দেখিনি। তবে আমি যে আমার প্রতিপালকের কাছে লজ্জিত হবো না এতে তো সন্দেহের অবকাশ নেই।" ফয়জান মুচকি হেসে জবাব দিল।

"কিন্তু, যেই মিশনের জন্য তুমি এত কষ্ট, মুসিবত বরদাশ্‌ত্ করছো, সেই মিশন কিভাবে সফলকাম হবে?" সৈনিকটি জিজ্ঞেস করলো।

"আমার মিশন?" ফয়জান হতবাক হয়ে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে এই আধ্যাত্মিক চিত্রকরকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

"বেটা তুমি কি মনে করো! এক চিত্রকর কি তার মেহনতের চিত্রকে বিনষ্ট হতে দেখতে পারে? সে কি তার কারুকার্যকে আগুনে ভষ্মিভূত হতে দেখতে পারে? সে কি তার মাতৃভূমির একটি অমূল্য সন্তানকে অসহায় ভাবে মরনমুখী হতে দেখতে পারে?"

"না.........কখনো না........!" বৃদ্ধ সিপাহীটি নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিল।

সে বলে যাচ্ছিল, আর ফয়জানের মনেও এ জিজ্ঞাসাগুলো দানা বেঁধে ওঠছিল ঃ

"এরকম অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করলে আমার মিশনের কি মানহানি হবে না? শুধু আবেগ প্রবণ হয়ে যদি আমি আজ স্বীয় লক্ষ্য, উদ্দেশ্যে পৌঁছতে না পারি, তাহলেকি এটা আমার স্বপ্ন, আমার আশা, আকাঙ্খার চরম পরাজয় বলে গণ্য হবে না?"

ফয়জান চমকে ওঠল । তার অন্তর জোরালো ভাবে স্বাক্ষ্য দিল যে, বৃদ্ধ বাবা বাস্তব কথাই বলছে।

"বাবা! তাহলে আমি কি করতে পারি? আমার জন্য বিকল্প কোন্ পথ খোলা রয়েছে?" সে বৃদ্ধ সৈনিকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো। সৈনিকটি ফয়জানের চেহারায় ওঠা-নামা করা পরিবর্তনকে ভালভাবে বুঝতে পারছিলেন। ফয়জানকে তারদিকে তাকাতে দেখে তার ওষ্ঠদ্বয়ে ইষৎ হাসি ছড়িয়ে পড়লো। তাকে হাসতে দেখে ফয়জানের মধ্যে যথেষ্ট মনোবল ও সাহসের সঞ্চার হল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার বুজুর্গ, আমার মুরুব্বী!" সে ব্যাকুল হয়ে ওঠল। "বাস্তবেই যদি আমার মিশন অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাহলে আমার আত্মা কখনো শান্তি পাবে না।"

"তাহলে বেটা কৌশল অবলম্বন করো। আল্লাহ পাক তোমাকে সাহায্য করবেন ইনশাআল্লাহ। তুমি তোমার চাল-চলনকে সম্পূর্ণ রূপে পাল্টে দাও। তাদের কাছে এ জিনিসটি স্পষ্ট করে দাও যে, বাস্তবেই তোমার ব্রেন সাময়িকের জন্য বিপথগামী হয়ে গিয়েছিল, এখন তুমি ঠিক হয়ে গেছো। তুমি ভান ধরো যে, মোল্লারা তোমাকে গলদ পথে নিয়ে গিয়েছিল, তখন তুমি বুঝতে পারোনি, এখন তোমার ভুলটি বুঝে এসেছে।" এই বলে বৃদ্ধ সৈনিকটি একটি গভীর নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

ফয়জান প্রকোষ্ঠের লোহার শিকের সঙ্গে কান লাগিয়ে তার কথাগুলো শুনছিল। সৈনিকটি কথা বলার মুহূর্তে সতর্কতা হিসেবে অবশ্যই এদিক ওদিক লক্ষ্য রাখছিল।

"তুমি যদি অভিনয় যথাযথ করতে পারো তাহলে এরা সঙ্গে সঙ্গে তোমার কথা বিশ্বাস করবে। এ ধরনের বেশ কয়েকটা নজির এখানে রয়েছে। তোমার মত অনেক নওজোয়ান এই পন্থা অবলম্বন করে প্রাণ বাঁচিয়েছে। বেটা! আমার কথাগুলো গভীর মন দিয়ে শুনো!" ফয়জানের কান খাড়া হয়ে গেল।

"তোমাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষ মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পাঠাবে। এটাতো বাস্তব কথা যে, রাশিয়ার সেনা উপদেষ্টারা কড়াভাবে তোমার উপর নজরদারী করবে। কিন্তু তুমি সুযোগ বুঝে তাদের ধোঁকা দিয়ে কেটে পড়বে। যে কোন সীমান্তবর্তী অঞ্চল দিয়ে পালাতে তোমার পক্ষে মোটেও অসুবিধা হবে না। খুব ভেবে চিন্তে এবং মস্তিষ্ক সজাগ রেখে কাজ করবে। আচ্ছা, বেটা! আমি এখন চললাম, আল্লাহ হফেজ।"

।।৬।।

ফয়জানের পক্ষে এই বৃদ্ধ সিপাহীটি একজন গায়েবী সাহায্যকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার সেই বুজর্গ রাহবর যেভাবে পথ প্রদর্শন করেছিলেন, ফয়জান সেই মোতাবেক কাজ করল। পরের দিনই তার চাল-ভঙ্গির মধ্যে আমুল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। সাথে সাথে তদন্তকারী টীমের ব্যবহারেও পরিবর্তন আসতে লাগল। দুমাস পর্যন্ত খাদ ও কেজিবির গোয়েন্দা সদস্যরা কড়াভাবে ফয়জানের অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। কিন্তু ফয়জান তার কোন আচরণ দ্বারা তাদের সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ দিল না। দু মাস পর কুখ্যাত "পুল চারখী জেল" থেকে যেখানে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, "খাদ" এর হেড কোয়াটারে সংবাদ পৌঁছিয়ে দেওয়া হল যে, ফয়জান উগ্‌লু ঠিক পথে এসে গেছে!

এই বার্তার দ্বিতীয় দিনেই জেলখানার একটি বিচ্ছিন্ন কামরায় মেজর উরখানের সঙ্গে তার সাক্ষাত হল। মেজর উরখান ফয়জানকে প্রস্তাব দিলেন যে, "সে যদি সেনা বাহিনীতে ভর্তি হয়ে মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, তাহলে তার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া আনন্দ তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অন্যথায় এই জেল থেকে রাতের আঁধারে তার মুর্দা লাশ বের হবে এবং কাবুল নদের গভীর পানিতে তাকে ছুঁড়ে মারা হবে।"

ফয়জান জানত যে, মেজর উরখান যা বলছেন, সেটা খালি খালি ধমকি নয়, বরং বাস্তবেও তা কার্যকর হবে। সত্যি বলতে কি, রাশিয়ান সামরিক উপদেষ্টাদের আগমনের পর থেকে আফগান কমিউনিস্ট সরকারের তথাকথিত কম্যুনিজম বিপ্লব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাদের আচরণ খুবই বর্বরতার রূপ ধারন করছিল। দিন দিন তাদের ব্যবহারে আসছিল কঠোরতা। আফগানিস্তানের অলি-গলি, গ্রামে-গঞ্জে এ কথাটি প্রসিদ্ধ হয়ে পড়েছিল যে, কেউ একবার "পুল চারখী" জেলে গেলে, তার পক্ষে জীবন নিয়ে আসাটা অলৌকিক ঘটনার চেয়ে কম নয়। কাবুলের অধিকাংশ বাসিন্দা রাতের অন্ধকারে কার্ফ্যুর সময় ঐ জেল থেকে রহস্যঘেরা ট্রাক বের হতে দেখতো, যেগুলোর রুখ থাকতো কাবুল নদের দিকে। সেখানে এসব ট্রাক ভারী ভারী জিনিস নদীর বক্ষে ছূড়ে মারতো। জনগণ ভাল করেই জানতো

যে, এ সব ট্রাকে ঐ সকল অসহায়, নিপরাধ, মজলুম, ঈমানী চেতনায় ভরপুর আফগান মুসলমানদের লাশ বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যারা কমিউনিস্ট বর্বরদের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে স্বীয় জান স্বীয় মালিকের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছেন। তারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নিয়েছেন, কিন্তু তবুও তারা তাদের ঈমানী চেতনা ও স্বাধীন মানসকে বেদ্বীন শাসক গোষ্ঠী ও রাশিয়ানদের হাতে বিক্রয় করেননি। তারা তাদের সাথে আপোষ করেননি কোন ধরনের।

ফয়জান উগলু গোলামী মনমানসিকতারও ছিল না, না সে নির্লজ্জ ছিল, এমন ও না যে, তার মধ্যে ঈমানী ও জেহাদী চেতনা নেই। কিন্তু রুশ সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য বিস্তার রোধ এবং নাস্তিক ও বে-দ্বীন কাবুল প্রশাসনের নাস্তিক্যবাদ আদর্শকে উৎখাত করতে চাইলে প্রয়োজন জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া। যে জন্য সে মস্কো ইউনিভার্সিটি পরিত্যাগ করেছে। পুল চারখী জেল থেকে বের হতে না পারলে তার লক্ষ উদ্দেশ্য অর্জন হচ্ছে না বিধায় সে জেল থেকে বের হওয়ার তদবীর করতে লাগল। জেল থেকে বের হওয়ার জন্য আবেগের পরিবর্তে বুদ্ধি খাটানো ছাড়া অন্য কোন উপায় তার কাছে ছিল না। তাই সে কৌশলের পথ অবলম্বন করলো।

ফয়জান উগলু "খাদ"-এর মেজর উরখানের কথা স্বতস্ফুর্ত ভাবে মেনে নিল এবং সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলো।

কমিউনিস্ট কর্তৃপক্ষ ফয়জান উগ্‌লুকে "পুল চারখী" জেল থেকে মুক্তি দিয়ে কাবুলে নিয়ে এলো। এখানে এসে তাকে আরেকবার ইনকোয়ারী বোর্ডের সামনে হাজির হতে হল। সেই বৃদ্ধ বুযুর্গ সৈনিক রাহবরের উপদেশ তার স্মরণ ছিল। ভিনদেশী লাল ভল্লুকরা তার জাতিকে বিপথগামী ও ধ্বংস করার জন্য যেই জাল বিস্তার করেছিল, রাজধানী কাবুলের আধুনিকতা প্রিয় ও ধর্ম বিমুখ বাসিন্দারা ধীরে ধীরে সেই জালে ফেঁসে যাচ্ছিল। ফয়জান তার জাতিকে বে-দ্বীনদের করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করার জন্য গ্রহণ করল দৃপ্ত শপথ। সেই লক্ষ্য অর্জনে তার যত ত্যাগ ও মূল্য দিতে হোক না কেন! সে তাতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।

ফয়জান তদন্ত কমিটির সামনে উপস্থিত হয়ে, তাদের কাছে ওযর পেশ করলো যে, অতীতে তার থেকে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছে, এগুলো না

বুঝার কারণে হয়েছে। এখন সে তার বিগত জীবনের কর্মকান্ডের উপর ভীষণ লজ্জিত। আগামীতে কখনো বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারা তার ধারে কাছেও ভিড়তে পারবে না। ফয়জান উগ্‌লু তার বক্তব্য এমন চমকপ্রদ ভাবে ব্যক্ত করলো যে, ইনকোয়ারী বোর্ড তাতে আশ্বস্ত হল।

কর্তৃপক্ষ ফয়জানকে কাবুল সেনা ছাউনিতে পাঠিয়ে দিল। কাবুল সেনা ছাউনির "ট্রেনিং একাডেমীতে" মাত্র ছয় মাস ট্রেনিং নেওয়ার পর সে "লেফটেন্যান্ট হয়ে গেল।" ফয়জান ফৌজি একাডেমীতে এসে বুঝতে পেল যে, এখানে এমন ক্যাডেটদের সংখ্যা খুবই নগণ্য যারা নিজেদের মর্জিতে সেনা বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। অধিকাংশ যুবকদেরই জোর পূর্বক সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হয়েছে। কখনো কখনো ফয়জান যখন বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতো, তখনই তার সেই রহস্যময় উপকারী মুরুব্বী রাহবরের প্রতিকৃতি অভয় বাণী শুনানোর জন্য তার সামনে এসে উপস্থিত হতেন।

যখনই কোন সময় ফয়জানের অন্তরে বিদ্রোহের ধাবানল জ্বলে ওঠার উপক্রম হতো ঠিক তখন সঙ্গে সঙ্গে তার সেই বৃদ্ধ মুহসিন চিত্রকর অজ্ঞাত স্থান থেকে উদয় হয়ে তার সেই বিদ্রোহের দাবানলকে যুক্তির শীতল হাওয়া দিয়ে ঠান্ডা করতেন। সেই বুযুর্গ এক মুহূর্তের জন্যও বরদাশত করতে প্রস্তুত ছিলেন না যে, তার বানানো কোন চিত্রের রং ফ্যাকাশে হয়ে পড়ুক। তিনি মনে করতেন যে, এই "মহান ডিউটির" মধ্যে কোন ধরনের শৈথিল্য প্রদর্শন করলে তাকে অবশ্যই রাব্বুল আলামীনের কাছে জবাবদিহী করতে হবে।

ট্রেনিং সমাপ্তির পর অবশেষে ফয়জানের "পাস আউট" এর দিনটিও এসে গেল। কাবুলের সামরিক ছাউনীতে একটি বর্ণাঢ্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। প্রেসিডেন্ট বারবাক কারমাল, শহরের রঈস ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, তথাকথিত প্রগতিশীল চিন্তাধারার নেতৃবৃন্দ, কমিউনিস্ট ব্লকের রাষ্ট্রদূতগণ এবং বড় বড় সরকারী কর্মকর্তাগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন। নতুন ট্রেনিং প্রাপ্ত লেফটন্যান্টরা সারিবদ্ধ হয়ে দন্ডায়মান ছিল। অতঃপর নিয়ম অনুসারে সালামী দেওয়া হল। ক্যাডেটরা "মার্চ পাস্ট" করল এবং সকলেই জুনিয়র লেফটেন্যান্টি পদে উন্নীত হয়ে রণক্ষেত্রের দিকে রওয়ানা

হতে যাচ্ছিল। এই অনুষ্ঠানের এক কোণে সেই বৃদ্ধ সৈনিকটিও উপস্থিত ছিলেন। তার বৃদ্ধ চমকদার চোখ দুটো খুবই অস্থিরতার সাথে নিজের প্রস্তুতকৃত ছবিকে যাচাই করে যাচ্ছিলেন যে, কোন জায়গায় রঙের ভিতর ফ্যাকাশে পড়েনি তো আবার? তিনি বারবার নিজের কাছে এই প্রশ্নটিই করে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন ফয়জান উগ্‌লুকে সামরিক উর্দি পরে স্টেজের কাছ দিয়ে সালামী দিয়ে যেতে দেখলেন, তখন একটা ফ্যাকাশে ঈষৎ হাসি তার ওষ্ঠদ্বয়ের সাথে মিলে গেল।

"হে রাব্বুল আলামীন! হে রাহমানুর রাহীম! তোমার এই বান্দাকে এতটুকু শক্তি দান করো যেন সে স্বীয় মহান মিশনকে পুরো করতে সক্ষম হয়।" ফয়জানের জন্য একটি দোয়া তার অন্তরের অন্তরস্থল থেকে বেরিয়ে এলো। যখন প্যারেড সমাপ্ত হল, তখন সেই বৃদ্ধ চিত্রকর নিরবে বেরিয়ে পড়ল।

"জীবন্ত পাহাড়ের সন্তান" বইটির প্রথম খন্ড শেষ হল।

জীবন্ত পাহাড়ের সন্তান

মূল ঃ তারেক ইসমাঈল

ভাষান্তর ঃ শেখ নাঈম রেজওয়ান

প্রকাশক

শেখ আবু খালেদ

আল-খালেদ প্রকাশন

ফোন ঃ ৬০০১৭৩

পরিবেশনায়

১। দারুল মাআরিফ

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা

২। তাসনিয়া বই বিতান

১৯১, ওয়ারলেস, রেলগেইট

বড় মগবাজার, ঢাকা

৩। প্রফেসর বুক সেন্টার

১৯১, ওয়ারলেস, রেলগেইট

বড় মগবাজার, ঢাকা

৪। আহসান পাবলিকেশন

মগবাজার/কাঁটাবন, ঢাকা

প্রকাশকাল

এপ্রিল ২০০২
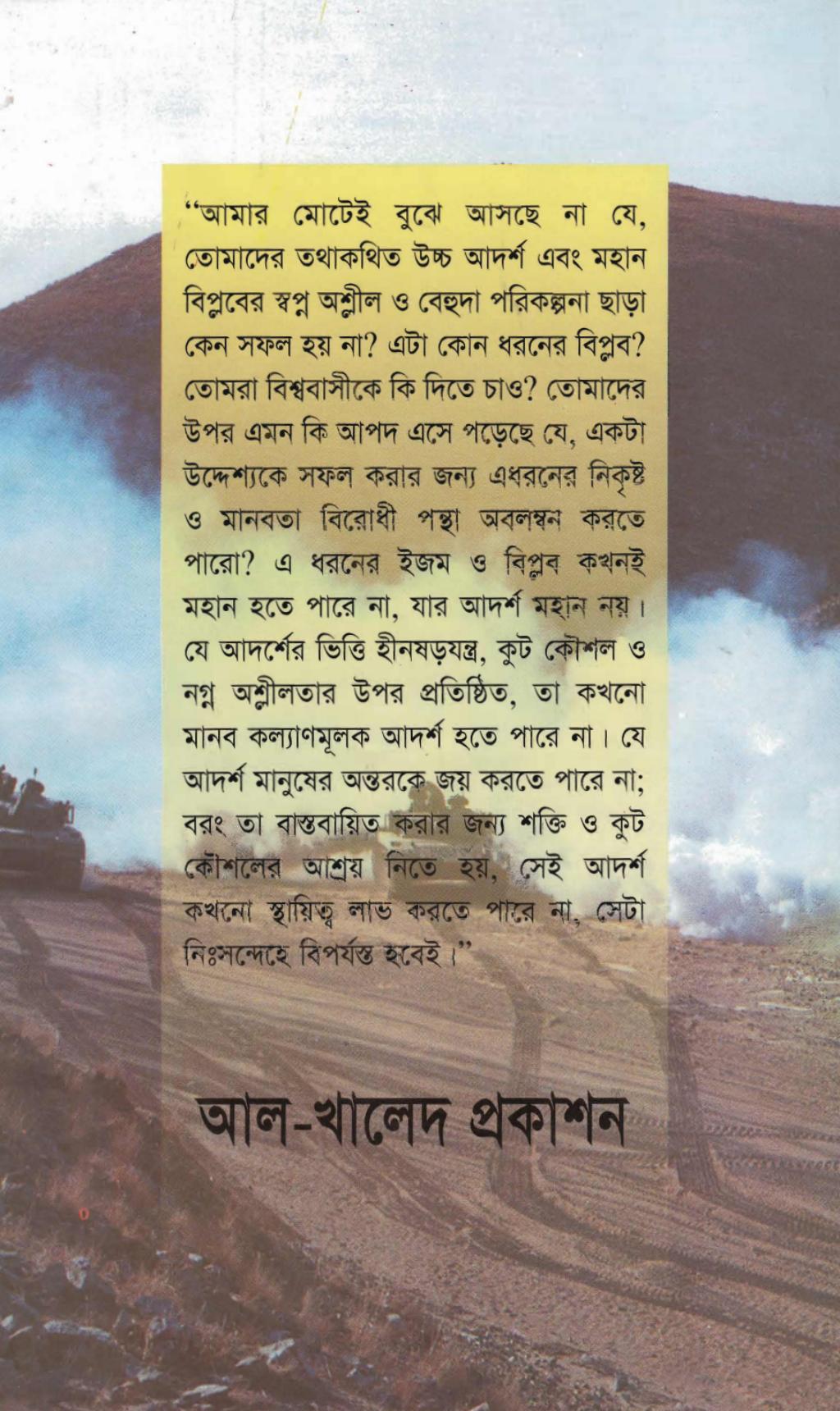
মূল্য ঃ একশত টাকা মাত্র

"আমার মোটেই বুঝে আসছে না যে, তোমাদের তথাকথিত উচ্চ আদর্শ এবং মহান বিপ্লবের স্বপ্ন অশ্লীল ও বেহুদা পরিকল্পনা ছাড়া কেন সফল হয় না? এটা কোন ধরনের বিপ্লব? তোমরা বিশ্ববাসীকে কি দিতে চাও? তোমাদের উপর এমন কি আপদ এসে পড়েছে যে, একটা উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য এধরনের নিকৃষ্ট ও মানবতা বিরোধী পন্থা অবলম্বন করতে পারো? এ ধরনের ইজম ও বিপ্লব কখনই মহান হতে পারে না, যার আদর্শ মহান নয়। যে আদর্শের ভিত্তি হীনষড়যন্ত্র, কুট কৌশল ও নগ্ন অশ্লীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত, তা কখনো মানব কল্যাণমূলক আদর্শ হতে পারে না। যে আদর্শ মানুষের অন্তরকে জয় করতে পারে না; বরং তা বাস্তবায়িত করার জন্য শক্তি ও কুট কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়, সেই আদর্শ কখনো স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না, সেটা নিঃসন্দেহে বিপর্যস্ত হবেই।"

আল-খালেদ প্রকাশন